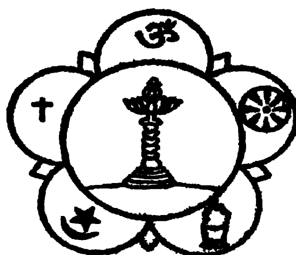
সাই অবতার

ভগবান শ্রীসত্যসাই বাবার
দিব্যলীলার জীবন আলেখ্য



ইংরাজী মূল গ্রন্থকার
শ্রী এন. কস্তুরী, এম. এ., বি. এল.
সহযোগে চার্লস পেন, জুডিথ এম. টাইবার্গ, পি-এইচ. ডি. এবং
কেথ টেলার কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত
আমেরিকান সংস্করণের বাংলা অনুবাদ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত

শ্রী সত্য সাই শিক্ষা ও প্রকাশনা সংস্থা
পোষ্ট : প্রশান্তি-নিলয়ম
জেলা : অনন্তপুর, ৫১৫১৩৪
Sri Sathya Sai Education & Publication Foundation
P.O. Prasanthi Nilayan
Dist. Anantapur, 515134

প্রকাশনা :
শ্রী সত্য সাই শিক্ষা ও প্রকাশনা সংস্থা, প্রশান্তি-নিলয়ম কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিক্রমে প্রকাশনা কমিটি, ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান :
সনাতন সারথি কার্যালয়
১৬৩, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৭০০০১৪

দ্বিতীয় সংস্করণ : মে, ১৩৬৭

মুদ্রণ :
ফাইন প্রিণ্ট, ১১৪/২/২এ, হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ পক্ষে নিশীথরঞ্জন নন্দী।

সূচীপত্র

বিস্ময়কর নরলীলা

এই কাহিনী, মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানের দিব্যলীলার অমৃতগাথা, যিনি দক্ষিণ ভারতের পুট্টাপর্তী নামে এক ছোট্ট প্রশান্তিময় গ্রামে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বরের শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের নামকরণের পেছনে জনপ্রিয় একটি কিংবদন্তী পুট্টাপর্তীর স্মৃতিকে পবিত্র করে তুলেছে। আর তাই, এখানকার অধিবাসীদের অন্তরে পুট্টাপর্তী নামটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে। তেলেগু ভাষায় 'পুট্টা' শব্দের অর্থ হোল এমন এক বল্মীক অর্থাৎ উইঢিবি, যার ভেতরে সাপ থাকে এবং 'পর্তী' শব্দের অর্থ হোল 'যা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়'। এই দুটি শব্দের পেছনে এমন এক অত্যাশ্চর্য জনশ্রুতি আছে, যার থেকে পুট্টাপর্তী নামের অতীত ইতিহাস জানা যায়।

অতি প্রাচীনকালে এই গ্রামটির নাম ছিল 'গোল্লাপল্লী' অর্থাৎ রাখালদের গ্রাম। নামটি তাৎপর্যপূর্ণ—রাখালরাজ, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরের কথা যেন মনে করিয়ে দেয়। মধুর মুরলীধ্বনি এবং গোপিনীদের হাস্যালাপের শব্দও যেন গ্রামটির বাতাসে কান রাখলে শোনা যায়। এই এলাকার গবাদি পশু খুব হৃষ্টপুষ্ট বলে গোয়ালাদের অবস্থাও খুব ভাল ছিল। সব গরুই প্রচুর পরিমাণে সুমিষ্ট দুধ দিত। আর তাই, প্রতি গৃহে ঘি মাখনের প্রাচুর্য ছিল। একদিন এক গোয়ালা আশ্চর্য হয়ে দেখলো যে পাহাড়ের মাঠ থেকে ফিরে আসার পর তার গরুর বাঁটে এক ফোঁটাও দুধ নেই। এই রহস্যের কিনারা করবার জন্য সে গরুটির গতিবিধির ওপর গোপনে নজর রাখতে গিয়ে এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করলো। ঐ গরুটি তার বাছুরকে অন্য গরুদের কাছে ফেলে রেখে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গ্রামের শেষে এক উইঢিবির দিকে এগিয়ে চললো। গোয়ালাও গরুকে অনুসরণ করতে করতে সেখানে এসে অতি বিচিত্র এক দৃশ্য দেখলো। ঢিবি থেকে একটি গোক্ষুর সাপ বেরিয়ে এসে

লেজে ভর দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর গরুটির বাঁটে অতি সন্তর্পণে মুখ লাগিয়ে সবটুকু দুধ চুষে পান করে ফেললো। তার মারাত্মক ক্ষতির কথা চিন্তা করে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সেই গোয়ালা বিরাট একটি পাথর ছুঁড়ে সাপটিকে মেরে ফেললো। তীব্র মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট্ করতে করতে, ক্রুদ্ধ সাপটি অভিশাপ দিলো যে ঐ স্থান উইঢিবিতে ছেয়ে যাবে, এই ঢিবিগুলি সংখ্যায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এর ভেতরে সাপের বাসা হবে।

বাস্তবে হোলও তাই। আগের মত সাফল্যের সঙ্গে আর গোপালন সম্ভব হোল না। গরুগুলি সব কিরকম শীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের সংখ্যাও দ্রুত হ্রাস পেল। উইঢিবি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এর ফলে গ্রামটির নামও কিছুদিনের মধ্যে বদলে গেল। নতুন নাম হোল 'বল্মীকিপুর' অর্থাৎ 'উই-ঢিবিময় শহর'। এই নব নামকরণে গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন, কারণ মহাকাব্য রামায়ণের স্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্য স্মৃতি এই নামের সাথে মিশে আছে। 'বল্মীকিপুর' নামটিকে চলতি ভাষায় 'পুট্টাপর্ত্তী' বলা হয়। এই করুণ ঘটনার প্রমাণস্বরূপ গ্রামবাসীরা এখনও ঐ বিশেষ পাথরটি দেখায় যা দিয়ে সেই গোয়ালা সাপটিকে নিহত করেছিল। পাথরটি পুরু এবং গোলাকৃতি—একদিক মাটিতে প্রবিষ্ট—গায়ে লম্বালম্বি একটি লাল চিহ্ন আছে—যাকে গোক্ষুর সাপের রক্তের দাগ বলা হয়। রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক মনে করে এই পাথরটিকে সবাই পূজো দেওয়া সুরু করলো, সম্ভবত এই অভিপ্রায়ে যে, এর ফলে শাপমুক্ত হয়ে গোজাতি আবার সমৃদ্ধ হবে। গ্রামের মোড়লরা এই জায়গায় একটি মন্দির নির্মাণ করালেন। অগণিত জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে ভক্তিভরে এখানে প্রণাম করে আসছে।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবা কয়েক বছর পূর্বে এই পাথরটির একটি অসাধারণত্বের কথা প্রকাশ করেন। পাথরটির যে অংশ মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট ছিল, জল দিয়ে ধুয়ে শুদ্ধ করে সেই অংশে চন্দন লেপন করতে তিনি নির্দেশ দিলেন। এর পর দেখা গেল পাথরটির ওপর গরুর-গায়ে-হেলান-দিয়ে-দাঁড়ানো অবস্থায় মোহনমুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের খোদাইকরা মূর্তির রূপরেখা ফুটে উঠেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা হলফ করে বলে যে কান পাতলে তারা ওর ভেতর থেকে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মিষ্টি আওয়াজ শুনতে পায়। সেইদিন থেকেই

পুট্টাপর্তী অভিশাপমুক্ত হয় এবং গরুদের হৃত স্বাস্থ্য ফিরে আসে ও সংখ্যার উন্নতি হয়। পুট্টাপর্তী গ্রামটি যে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে প্রভুত্ব করতো এবং স্থানীয় মোড়লরা প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন এর সাক্ষ্য বহন করে, গ্রামটির পূর্ব প্রান্তে, আজও পরমশ্রদ্ধেয় পক্ককেশ বৃদ্ধের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাচীন দুর্গের গম্বুজ।

অজ্ঞাতনামা এক প্রাচীন কবি তাঁর কবিতায় পুট্টাপর্তীকে এইভাবে বন্দনা করেছেন—'হে পুট্টাপর্তী! চারদিকের গিরিবলয়ের মাঝে তুমি এক শ্যামল রত্ন—চিরচপলা চিত্রাবতী নদী অদূরের গিরিখাত থেকে নেমে এসে তোমার অঙ্গনের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দূরে মিলিয়ে গেছে—তোমায় ঘিরে গিরিশিখরসমূহের দেবালয়ের মধুর ঘণ্টাধ্বনি সদা সঙ্গীতময়—মহারাজ চিক্কারায়া নির্মিত সরোবর আজও তোমার শোভাবর্ধন করছে—বিজয়নগরের যশস্বী নৃপতি বুক্কা নামাঙ্কিত নগরী তোমার প্রতিবেশী—তোমার এখানেই সদা বিরাজমানা সৌভাগ্য-প্রদায়িনী দেবী লক্ষ্মী এবং বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী।' শুধু কবি এবং পণ্ডিত নয়, বহু বীর ও মানবপ্রেমিকও পুট্টাপর্তীর কোলে মানুষ হয়েছেন।

যে রাজুবংশে ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবা জন্মগ্রহণ করেছেন, ভগবদ্ভক্ত হিসেবে তাঁদের সুনাম বিখ্যাত তপস্বী ভেঙ্কা অবধূতের সময় থেকেই চলে আসছে। এঁরা শুধু গোপালস্বামী মন্দির নির্মাণ এবং দান করেই ক্ষান্ত থাকেননি, সত্য সাই বাবার পিতামহ ধর্মপ্রাণ শ্রীরত্নাকরম্ কোণ্ডাম্মা রাজু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নী দেবী সত্যভামার নামেও একটি মন্দির নির্মাণ করান। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও দেবী সত্যভামার নামে এইরকম মন্দির স্থাপনের কথা শোনা যায়নি। এই অসাধারণ আচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোণ্ডাম্মা রাজু বলতেন যে তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করান। ঐ অপূর্ব স্বপ্নের কথা যখনই স্মরণ হোত শতায়ু বৃদ্ধের কুঞ্চিত দুই কপোল বেয়ে নেমে আসতো আনন্দাশ্রুধারা।

কোণ্ডাম্মা রাজু স্বপ্ন দেখেছিলেন 'দেবী সত্যভামা—একাকিনী, সহায়হীনা—উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষমানা—কখন তাঁর স্বামী স্বর্গ থেকে তাঁর জন্য বহু ঈপ্সিত পারিজাত পুষ্প আহরণ করে আনবেন। দিন যায়, ক্ষণ যায়—তবু শ্রীকৃষ্ণের দেখা নেই। সত্যভামা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এদিকে আকাশে

ভীষণ ঝড় উঠেছে, বজ্রবিদ্যুৎসহ মুষলধারে বৃষ্টিপাত সুরু হয়ে গেছে। সত্যভামা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশ দিয়েই কোণ্ডাম্মা রাজু ঐ সময় কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সত্যভামার দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ায় তিনি কোণ্ডাম্মা রাজুর কাছে দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।' এই স্বপ্ন দেখার পর থেকেই কোণ্ডাম্মা রাজু প্রতিজ্ঞা করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীর জন্য তিনি একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।

কোণ্ডাম্মা রাজুর ১১০ বছরের পার্থিব জীবন ঈশ্বরচিন্তাতেই অতিবাহিত হয়। সঙ্গীত এবং অভিনয় বিদ্যায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। লেপাক্ষী শহরের এক কবি মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বনে অনেকগুলি গীতিকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে, রামায়ণের ঘটনাবলীর বর্ণনায়, গভীর নাটকীয় কল্পনা এবং অপরূপ লালিত্যময় রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমগ্র রামায়ণ কোণ্ডাম্মা রাজুর কণ্ঠস্থ ছিল। পুট্টাপর্তী বা অন্যান্য গ্রামে যতবার রামায়ণপালা হোত প্রতিবারই তিনি লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। দূরদূরান্ত থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসতো লক্ষ্মণের ভূমিকা গ্রহণের জন্য। লক্ষ্মণের একনিষ্ঠ ভক্তি এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের ভাব তিনি, তাঁর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে এমন সুন্দরভাবে ফোটাতেন যে তা অতি সহজেই দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করত। বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে না পড়া পর্যন্ত তিনি অসংখ্যবার এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তিনি কঠোর নিরামিষাশী ছিলেন এবং হিন্দুর সব ব্রত নিষ্ঠা-সহকারে পালন করতেন। পুত্রপৌত্রদের বাসস্থান থেকে কিছু দূরে অবস্থিত তাঁর কুটিরটি সত্যই পবিত্র ঈশ্বরভক্তির শান্তিনিকেতন ছিল। শয্যার চারপাশে নাতিনাতনিদের কাছে টেনে নিয়ে ঈশ্বর এবং অবতারদের পুণ্যকাহিনী শোনাতে তিনি খুব ভালবাসতেন। গান গেয়ে, অভিনয় করে কাহিনীগুলি বর্ণনা করতেন বলে প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা শিশুদের উৎসুক চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতো। শিশুরা তাই, কিছুতেই তাঁর কাছ থেকে নড়তে চাইতো না।

ঐ শিশুমেলায় তাঁর সবচেয়ে আদরের পাত্র যে তাঁর নাতি সত্যনারায়ণ (শ্রী সত্য সাই বাবার পারিবারিক নাম) ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, ছোট্ট বালকটি কেবল যে সুরেলা গলায় মিষ্টি করে গান গাইতে পারতেন, তাই

নয়, এমনকি পিতামহের মতো পূজ্য ব্যক্তিকে নাট্যবিদ্যায় দুই একটি তালিমও দিতে পারতেন।

শ্রীকোণ্ডাম্মা রাজুর এই নাতির প্রতি বিশেষ স্নেহপ্রদর্শনের অন্য একটি কারণও ছিল। শিশুটি আমিষ খাদ্য একেবারেই পছন্দ করতেন না এবং এই সব খাদ্য যেখানে রান্না হোত সেই জায়গার ধারেকাছে থাকতে চাইতেন না। মাত্র ৭ বছর বয়সের কচি বালক হলে কি হবে, তিনি ঐ বয়সেই চমৎকার রান্না করতে পারতেন। পিতামহের ভাঁড়ার ঘরে সামান্য যা কিছু উপকরণ থাকতো, তাই দিয়েই প্রখর বুদ্ধিমান বালকটি তাঁর মাথা খাটিয়ে অতি সুস্বাদু নানারকম খাবার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এবং নিমেষের মধ্যে রান্না করতেন! (সাই বাবা বলেন যে মেয়েদের সাহায্য নিয়ে তাঁর মায়ের নিজের রান্নাঘরে বসে রান্না করতে যে সময় লাগতো, তার চাইতে অনেক কম সময়ে তিনি পিতামহের রান্নাঘরে একলা বসে ভাত, তরকারি, চাটনি ইত্যাদি রান্না শেষ করে ফেলতেন!)

শ্রী সত্য সাই বাবার আশীর্বাদ নিতে যেসব ভক্তবৃন্দ পুট্টাপর্তী আসতেন, তাঁরা সবাই শ্রীকোণ্ডাম্মা রাজুর শেষ বয়সে তাঁকেও দর্শন করতে যেতেন এবং যখন এই পূজ্যপাদ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এঁদের শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেন, তখন ভগবান স্বয়ং তাঁর বংশে নেমে এসেছেন এই কথা স্মরণ করে তাঁর দুচোখ এক আনন্দময় কৃতজ্ঞতায় ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। এই পুণ্যাত্মা ১৯৫০ সালে রামনাম জপ করতে করতে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহাত্মাদের জীবনীগ্রন্থে তাঁর কথা অবশ্যই স্থান পাবার যোগ্য।

শ্রীকোণ্ডাম্মা রাজুর ধর্মপত্নী লক্ষাম্মা প্রায় বিশ বছর পূর্বে পরলোকগমন করেন। তাঁর জীবনও উপবাস, ব্রত উদযাপন এবং নিশিপালনের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। উদ্বেগ, অর্থব্যয় এবং অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত যথাযথভাবে এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল এইসব নিয়ম কঠোরভাবে পালনের মাধ্যমে, নিজেকে অধিকারী করে তোলা—যাতে ধর্মগ্রন্থের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃপালাভ করা যায়।

শ্রীকোণ্ডাম্মা রাজুর দুই পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল ঋষি ভেঙ্কা অবধূতের নামানুসারে—পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজু এবং চিন্না ভেঙ্কাপ্পা রাজু। পিতার সঙ্গে থেকে তাঁরা সঙ্গীত, সাহিত্য এবং অভিনয় গুণাবলীর সাথে সাথে ঈশ্বরানুরাগ এবং সারল্যও অর্জন করেন। দুইজনের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানাপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সুসাহিত্যিক ছিলেন এবং দেশীয় প্রক্রিয়ায় ওষুধ, মাদুলি ইত্যাদি তৈরী করতে পারতেন।

কুর্নুল জেলার কলিমিগুণ্ডলা গ্রামে এঁদের কিছু জমি দীর্ঘদিনের জন্য ইজারা দেওয়া ছিল। একবার পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুকে তাঁর পিতামাতা সেখানে নিয়ে যান। পথে যখন তাঁরা পার্লেপাল্লী জঙ্গলে প্রবেশ করতে যাবেন, তখন কিছু হিতৈষী ব্যক্তি তাঁদের উপযুক্ত রক্ষী নিয়ে ভ্রমণ করতে পরামর্শ দেন। কারণ মাত্র দুদিন আগে এখানে ৬ জনের এক পরিবারকে ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

যদিও এই ভ্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পুত্র পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পাকে ঐ এলাকা এবং প্রজাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া কিন্তু পিতার মনে দ্বিতীয় একটি বাসনা ছিল। তিনি চাইছিলেন তাঁর দূরসম্পর্কিত আত্মীয় শ্রীসুব্বা রাজু এবং তাঁর পরিবারবর্গকে পুট্টাপর্তীর কাছাকাছি কোথাও নিয়ে এসে বসবাস করানো। এখানে এঁরা নিরাপদে থাকতে পারবেন, কারণ জীবিকার্জনের জন্য জঙ্গলে গেলে তাঁদের প্রত্যহই বিপদের সম্মুখীন হোতে হচ্ছিল। শ্রীকোণ্ডাম্মা রাজু চিন্তা করলেন যে, পুট্টাপর্তীর বিপরীত দিকে,—চিত্রাবতীর অপর তীরে এক গ্রামে শ্রীসুব্বা রাজুকে বসবাস করানোর ব্যাপারে রাজী করাতে হোলে পর্যাপ্ত পরিমাণ 'উৎকোচ' দান করা দরকার। এই 'উৎকোচ' আর কিছুই নয়, শ্রীকোণ্ডাম্মা রাজুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপেড্ডা ভেঙ্কাপ্পার জন্য শ্রীসুব্বা রাজুর সুকন্যা ঈশ্বরাম্মাকে বধূরূপে বরণ করে নেওয়া। এইভাবেই শ্রীপেড্ডা ভেঙ্কাপ্পার সঙ্গে ঈশ্বরাম্মার শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হয়।

এই দম্পতির ঈশ্বরানুগৃহীত মিলনের ফলস্বরূপ এক পুত্র (শ্রীশেষাম্মা রাজু) এবং দুই কন্যা (ভেঙ্কাম্মা এবং পর্বতাম্মা) জন্মগ্রহণ করেন। কয়েক বছর অতিবাহিত হবার পর ঈশ্বরাম্মা আর একটি পুত্রের জন্য অভিলাষিণী হন। গ্রামের দেবতাদের কাছে তিনি কাতর প্রার্থনা জানালেন এবং দেবতার বিশেষ

অনুগ্রহলাভ করার কামনায় সত্যনারায়ণ পূজা করলেন। এছাড়া নিশিপালন এবং উপবাস ইত্যাদি অন্যান্য ব্রতও অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কঠোরভাবে পালন করলেন।

আবির্ভাব

(ঈশ্বর সংকল্প নিলেন পুনরায় নররূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।) অবতারের আবির্ভাবের মহালগ্ন আসন্ন বলে রহস্যময় ইঙ্গিতগুলি শ্রীপেড্ডা ভেঙ্কাপ্পার শান্ত একঘেয়ে জীবনযাত্রায় আলোড়ন তুলতে লাগলো। যেমন, একরাত্রে আপনাআপনি ঘরের ভেতর তানপুরা বেজে উঠলো। পিতা এবং পুত্রেরা সবাই গ্রামের যাত্রায় ভীষণ উৎসাহী এবং প্রায়ই বাড়ীতে যাত্রার মহড়া হোত বলে ঘরে তানপুরা আর মাদল থাকতো। রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে এই যন্ত্র দুটিও নীরব থাকতো। কিন্তু, ঈশ্বরাত্মার প্রার্থিত পুত্রসন্তানের জন্মলগ্ন যতই নিকটবর্তী হোতে লাগলো, ততই কখনও মাঝরাতে কখনো বা ভোরবেলা আপনা থেকেই তানপুরা আর মাদল বেজে উঠতো, বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে যেতো। এমন সুর আর ছন্দে যন্ত্রগুলো বেজে উঠতো যে মনে হোত যেন কোনো নিপুণ ওস্তাদের হাতে এগুলো বাজছে। গ্রামের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এর নানারকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু এতে অস্পষ্টতা আরও বেড়ে গেল।

শ্রীপেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা ছুটলেন বুক্কাপট্টনম্ শহরে জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী এক গণৎকারের কাছে, রহস্যের সমাধান খুঁজতে। ইনি এই ধরনের ঘটনার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিচারক ছিলেন। তিনি বিচার করে বললেন যে লক্ষণ অতি শুভ ; স্বতঃস্ফূর্ত যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বারা এক মঙ্গলদায়ক শক্তির উপস্থিতি সূচিত হচ্ছে এবং এই পরম শুভশক্তি একত্ব, সঙ্গীত, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, আত্মবিকাশ এবং আনন্দ-বর্ষণের জন্য ঐ গৃহে আবির্ভূত হবেন।

১৯২৬ সালের ২৩শে নভেম্বর পুত্রের জন্ম হোল। দিনটি ছিল 'অক্ষয়' বর্ষের কার্ত্তিক মাসের শুভ সোমবার—শিবের বার। গ্রামবাসীরা, নিখিল ভুবনের ছন্দোময় সৌন্দর্যের মূর্তিমান প্রতীক ভোলা মহেশ্বরের মহিমাকীর্তনে ব্যস্ত। ঐ সময় আর্দ্রা নক্ষত্র উদিত হয়েছিল বলে দিনটি অধিক পবিত্র হয়েছিল। এইরূপ দিন, মাস এবং নক্ষত্রের দিব্য সংযোগের মত বিরল ঘটনায় মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ পূজো দেওয়া হয়। ঈশ্বরাম্মা তাঁর পূর্বেকার মানত মতো সত্যনারায়ণ পূজোয় বসেছেন। পূজো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় তীব্র প্রসববেদনা উঠলো। তৎক্ষণাৎ খবর পৌছে দেওয়া হোল তাঁর শাশুড়ীমার কাছে। তিনি তখন পুরোহিতের বাড়ীতে তাঁর নিজের সত্যনারায়ণব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে শীঘ্র বাড়ী আসতে বলা হোল। কিন্তু সত্যনারায়ণের ওপর তাঁর এমনই অটল বিশ্বাস যে এই ভক্তিমতী ধর্মপরায়ণা রমণী তাড়াহুড়ো করে যেতে চাইলেন না। তিনি বলে পাঠালেন যে, পূজো শেষ না করে তিনি উঠতে পারছেন না এবং পূজো শেষ হোলেই ঈশ্বরাম্মার জন্য প্রসাদ নিয়ে আসছেন। তদ্গতচিত্তে পূজো শেষ করে তিনি বাড়ী এলেন এবং ঈশ্বরাম্মাকে নির্মাল্য এবং চরণামৃত দিলেন। ঈশ্বরাম্মা কপালে স্পর্শ করে চরণামৃত পান করলেন এবং নির্মাল্যপুষ্প মাথায় ঠেকালেন। পরমুহূর্তেই ভগবান ভূমিষ্ঠ হোলেন। নিখিলভুবন আলোকধারায় প্লাবিত করে পূর্বদিগন্তে সূর্যের উদয় হোল।

সাই বাবা বলেন যে, এই আবির্ভাবের একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। যে জায়গায় অবতার মানবদেহ ধারণ করেছেন সেখান থেকে তিনি স্থানান্তরে গমন করেননি। এর কারণ, জগতের দুঃখলাঘবের জন্য কর্মস্থলের কেন্দ্র হিসাবে অবতার স্বয়ং এই বিশেষ স্থান নির্বাচন করেছেন। নভেম্বর মাসের পুণ্য প্রভাতে তাই পুট্টাপর্তী দুদিক দিয়ে আশীর্বাদধন্য হয়েছে—এই আনন্দোজ্জ্বল গ্রামকে ভগবান শুধু তাঁর জন্মস্থান হিসেবেই নয়, তাঁর বাসস্থান হিসেবেও বেছে নিয়েছেন।

গ্রামটিও নবজাত শিশুকে অভিনব উপায়ে স্বাগত জানালো। আঁতুরঘরের মধ্যে একটি সাপ দেখা গেল। মহিলাদের চোখে প্রথমে ধরা পড়েনি, হঠাৎ তারা দেখতে পায় যে শিশুর শয্যাটি কেমন যেন তরঙ্গের মতো দুলে দুলে

উঠছে। সন্দেহ হচ্ছে শয্যার নীচে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে কয়েক মুহূর্ত কাটিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর শয্যার নীচে একটা গোক্ষুর সাপ দেখতে পাওয়া গেল।

শিশুর মনোমুগ্ধকর রূপ ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তার মস্তকের চতুর্দিকে জ্যোতির্বলয়; মুখের হাসিতে স্বর্গের শোভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে; এই দৈবশক্তিধর শিশু সবারই মন জয় করে নিলো। আশ্চর্যের কিছু নেই, শৈশবেই তিনি অলৌকিক যোগশক্তির অধিকারী ছিলেন; যে শক্তি, যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি মুনির মতে, দুর্লভ কিছু আত্মা লাভ করেন এবং জন্মকাল থেকেই অবতারের মধ্যে নিহিত থাকে। সাই বাবা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন একথা জন্মের পূর্বেই স্থির করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছেন যে সর্বপ্রকার দৈবশক্তি সাথে নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যে মুহূর্তে এই শক্তি প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর মনে উদয় হবে, তৎক্ষণাৎ তাঁর দৈবসংকল্প থেকে একে একে তা প্রকট হবে।

কয়েক বছর আগে সাই বাবা গ্রন্থকারকে বলেছিলেন, "আমি রাত্তিরে ঘুমোই না। ঐ সময় আমার পূর্বজন্মগুলির ঘটনা মনে হয় আর ঐসব চলমান স্মৃতি যখন পরপর আসতে থাকে তখন আমি মনে মনে হেসে উঠি।" অনুমান করা যেতে পারে যে ছোট্ট শিশুটি যখন দোলনায় দুলতে দুলতে পূর্বজন্মের অসংখ্য আবির্ভাব-তিরোভাবের চিন্তায় মগ্ন থাকতো তখন সেই স্মৃতিমন্থন থেকেই শিশুর আননে ফুটে উঠতো হাসির পদ্মফুল এবং আনন্দের গোলাপকুঁড়ি।

শিশুর নামকরণ করা হোল সত্যনারায়ণ, কারণ সত্যনারায়ণের কাছে মানত করেই মায়ের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সময় তাঁর ছোট্ট কানে যখন এই নামটি ধীরে ধীরে বলা হচ্ছিল, মনে হয় শিশুটি মৃদু মৃদু হাসছিলেন, কারণ তিনি নিজেই কি চুপি চুপি স্থির করেননি যে এই নামটিই রাখা হোক? তা না হোলে অন্যভাবে এই নামকরণের ব্যাখ্যা কি করে সম্ভব? কারণ সত্য সাই বাবা বলেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক গুণ হোল 'সত্য' এবং 'নারায়ণ' (মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা)। সত্যের সাক্ষাৎরূপধারী এবং পথের দিশারী তার নিজের জন্য আর এর চেয়ে অধিক উপযুক্ত নামকরণ করতে পারতেন না।

শিশুটি সমগ্র পুট্টাপর্তী গ্রামের আদরের ধন হয়ে উঠলো এবং কৃষক আর গোয়ালাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো কে আগে ওর রেশমের মত কোঁকড়া চুলে হাত বোলাবে বা সোহাগ করে খাওয়াবে। তাঁর মুখের মধুর হাসিতে সবাই আকৃষ্ট হোত। পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পার বাড়ীতে সর্বদা লোকের ভীড় লেগে থাকতো। এরা কোন না কোন অজুহাতে চলে আসতো, হয় শিশুকে আদর করে ঘুমপাড়ানী গান শোনাতে, না হয় নয়নভোলানো রূপ দেখে কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের নীরস একঘেয়ে জীবনকে ভুলে থাকতে।

অচিরেই জুঁইফুলের কুঁড়ির সৌরভে বাতাস ভরে গেল; এলোমেলো পা ফেলে, টলে টলে, শিশুটি সারা বাড়ী ঘুরে বেড়ায়—যেন এক কম্পমান দীপশিখা। তার মধুঝরা আধো আধো কথা সবাই খুব উপভোগ করে। সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে বড়দের মতো চওড়া করে কপালে বিভূতি লাগাতে সে খুব ভালবাসে এবং কোন কারণে মুছে গেলে সঙ্গে সঙ্গে লাগানোর জন্য পীড়াপীড়ি করে। মেয়েরা যেরকম কপালে লাল কুমকুমের টিপ পরে তারও ইচ্ছে ঐ টিপ পরার। মা টিপ পরিয়ে দেবার সময় পেতেন না বলে সে নিজেই তার দিদির বাক্স থেকে কুমকুম বার করে টিপ পরে নিত। তিনি ছিলেন একাধারে শিব এবং শক্তি, তাই তাঁর শিবের বিভূতি আর পার্বতীর কুমকুম—দুইই চাই।

যেসব জায়গায় গরু, ভেড়া, শূয়োর বা মুরগী বধ করা হোত বা এদের উপর অত্যাচার হোত বা যেখানে মাছ ধরা হোত, তিনি সেই সব স্থান পরিহার করে চলতেন। মাংস রান্নার স্থান ও বাসনপত্র তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। খাবার জন্য মুরগী কাটার ব্যবস্থা হচ্ছে দেখতে পেলে তিনি একছুটে মুরগীটিকে বুকে চেপে ধরে আদর করতেন,—এই মনে করে যে একটি অসহায় প্রাণীর প্রতি ছোট্ট শিশুর গভীর অনুকম্পার তাৎপর্য উপলব্ধি করে যদি বড়রা দয়াপরবশ হয়ে তার প্রাণ বাঁচায়। জীবহত্যার প্রতি তীব্র বিরাগ এবং সর্বজীবে অসীম দয়া দেখে সবাই তার নাম দিলো 'ব্রহ্মজ্ঞানী' অর্থাৎ যাঁর আত্মোপলব্ধি হয়েছে। ঐ সময়ে সত্য গ্রামের এক একাউণ্ট্যাণ্টের বাড়ী দৌড়ে চলে যেতেন এবং সুব্বাম্মা নাম্নী এক প্রৌঢ়া মহিলার হাত থেকে খাবার গ্রহণ করতেন, কারণ এঁরা নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

খেলার সাথীরা মারধোর করলে তিনি কখনও প্রতিশোধ নিতেন না। এ ব্যাপারে সত্যের মুখে কখনও নালিশ শোনা যেতো না, বরং অন্যান্য বালকেরা এসে তাঁর বাবা-মার কাছে সত্যের ওপর পীড়নের কথা জানাতো, কিন্তু সত্যকে দেখে বোঝাই যেতো না যে তাঁর কোথায় আঘাত লেগেছে বা মনে ব্যথা পেয়েছেন। নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য সাধারণ ছেলেমেয়েরা যেসব ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়, তিনি কখনও তা করতেন না এবং সদাসর্বদা সত্যকথা বলতেন। তাঁর আচরণ অন্যের থেকে এমন স্বতন্ত্র ছিল যে এক বালক মজা করে তাঁর নাম দেয় 'ব্রাহ্মণশিশু'—উপযুক্ত বর্ণনাই বটে। এই বালকের তো আর জানা ছিল না যে, যে শিশুকে নিয়ে তারা হাসিতামাসা করছে, সেই শিশুই তাঁর পূর্বদেহে শিরডিতে ঘোষণা করেছিলেন,—'একনিষ্ঠ ভক্তদের সনাতন ধর্মের পবিত্র পথে আনতে এবং ঈশ্বরোপলব্ধির চরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে এই ব্রাহ্মণই সক্ষম হবে।'

মাত্র ৩/৪ বছরের এই 'ব্রাহ্মণের' হৃদয় মানুষের দুঃখ দেখলে গলে যেতো। বাড়ীতে কোন ভিখারী এসে আর্তস্বরে ভিক্ষা চাইবামাত্র সত্য খেলা ফেলে উঠে, ঝড়ের বেগে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে দিদিদের ভিক্ষা দিতে বাধ্য করতেন। এইভাবে সমানে ভিখারী আসতে থাকায় বাড়ীর লোকেরা স্বভাবতই বিরক্ত হোত এবং অনেক সময় রেগে গিয়ে ভিখারীদের তাড়িয়ে দিত, সত্য কিছু সাহায্য নিয়ে পৌছাবার আগেই। এর ফলে তিনি চমৎকার করে এমন একটানা কান্না শুরু করে দিতেন যে কান্না থামানোর জন্যে বড়দের ছুটে যেতে হোত সেই তাড়িয়ে দেওয়া ভিখারীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। বড়রা মনে করলেন যে এইভাবে সমানে ভিক্ষা দিতে গেলে তো ফতুর হয়ে যেতে হবে! এটা কমানো দরকার। এই ভেবে একদিন ঈশ্বরাম্মা সত্যকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "শোনো, তুমি এদের খাওয়াতে পারো—আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে।" কিন্তু সত্য এতে ভয় পাবার পাত্র নয়। ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে ভেতর থেকে খাবারদাবার এনে খাইয়ে তিনি নিজে সারাদিন না খেয়ে কাটালেন। কোন অনুরোধ উপরোধেও তিনি খেতে এলেন না। যেমন ছিল তেমনভাবেই খাবার পড়ে রইলো।

এক রহস্যময় ব্যক্তি এসে সত্যকে খাইয়ে যেতেন। এক নাগাড়ে কয়েকদিন

অনাহারে থাকলেও সত্যের চেহারায় বা চলাফেরায় তার কোন চিহ্ন দেখা যেতো না। তিনি মাকে বলতেন যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি এসে তাঁকে পেট ভরে দুধভাত খাইয়ে গেছেন। পেটের ওপর টিপে দেখলেও কথাটার প্রমাণ পাওয়া যেতো। ডান হাত বাড়িয়ে তিনি মাকে ঘ্রাণ নিতে বলতেন এবং কি আশ্চর্যের ব্যাপার—ঐ ছোট্ট পবিত্র করতলে ঈশ্বরাত্মা মাখন, দুধ, দই-এর এমন এক দিব্য ঘ্রাণ পেতেন, যে ঘ্রাণ তিনি পূর্বে কখনও পাননি। কি পরিচয় এই ব্যক্তির যিনি অতি বিস্ময়করভাবে দৃষ্টির আড়ালে থেকে শিশুটির পুষ্টি যোগাচ্ছেন? এ রহস্য থেকেই গেল।

সত্য যখন রাস্তায় বের হোতে শিখলেন তখন খুঁজে খুঁজে বিকলাঙ্গ, অন্ধ, স্থবির এবং রোগগ্রস্ত ভিখারীদের বাড়ীতে ধরে আনতেন। দিদিরা তখন আর কি করেন, ভাঁড়ার থেকে চাল ডাল বা অন্য খাবার এনে ভিখারীদের ঝুলিতে ঢেলে দিতেন—আর দেবশিশুটি মালিকের ভঙ্গি নিয়ে খুশী মনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন।

প্রত্যেক পিতামাতা তাদের সন্তানদের কাছে এত অসংখ্যবার আদর্শ সন্তান হিসেবে সত্যনারায়ণের নাম উল্লেখ করতেন যে গ্রামের সব ছেলেমেয়েরা সত্যকে 'গুরু' বলে ডাকা শুরু করলো। এক অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়ে মা-বাবা এবং অন্যান্যরা এই কথা জানতে পারলেন।

সেদিন গ্রামে রামনবমীর মিছিল বেরিয়েছে এবং অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। গরুর গাড়ী ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে, এর ওপর শ্রীরামচন্দ্রের বিরাট চিত্র দাঁড় করানো আছে, পুরোহিত মশাইও ওপরে বসে আছেন ভক্তদের হাত থেকে পুষ্পার্ঘ গ্রহণ এবং কর্পূরারতি করবার জন্য। সানাই আর ঢোলের আওয়াজে সবার ঘুম ভাঙিয়ে গ্রামের অসমতল রাস্তা দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ দুই দিদির খেয়াল হোল ওঁদের ছোট্ট ভাই সত্য তো বাড়ীতে নেই। সবাই পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি সুরু করলো—কারণ মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, ছেলে গেল কোথায়! ইতিমধ্যে সেই মিছিলটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতে ওঁদের নজর সেইদিকে পড়লো। এগিয়ে গিয়ে এঁরা অবাক হয়ে দেখলেন যে, তাঁদের সত্য, যাঁর বয়স মাত্র ৫ বছর—সুন্দর পোষাকে সেজেগুজে একজন

গণ্যমান্য ব্যক্তির মতো শ্রীরামচন্দ্রের ছবির ঠিক নীচে চুপটি করে বসে আছেন। এঁরা সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, সত্য কেন ওদের সঙ্গে না হেঁটে ওপরে উঠে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো—"ও যে আমাদের গুরু।"

বাস্তবিক, সর্বদেশের, সর্বযুগের শিশুদের তিনিই গুরু।

পুট্টাপর্তীতে একটি ছোট প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে সত্য অন্য ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়ার চাইতেও মহত্তর কাজের জন্য যেতেন। সময়নিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য এই স্কুলে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। প্রথমে যে দুজন ছাত্র স্কুলে এসে শিক্ষককে নমস্কার করতো তারা ভাগ্যবান, কারণ তারা শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেত। বাদবাকি সব ছাত্রকে সঙ্গত অসঙ্গত যে কারণেই আসতে দেরী হোক না কেন, বেত্রাঘাত করা হোত।

কতবার বেত মারা হবে নির্ভর করতো, দেরী করে আসার ছাত্রদের তালিকায় সেই ছাত্রটির ক্রমিক সংখ্যার ওপর। এই অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় হিসেবে ছাত্ররা, কি শীত কি বর্ষায় সূর্য ওঠারও আগে, স্কুলঘরের ছাদের ছাঁচের নীচে দেয়াল ঘেঁসে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো স্কুল খোলার অপেক্ষায়। সত্য, এদের শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে দেখেছিলেন এবং এই দুর্দশায় সহানুভূতি জানাতে বাড়ী থেকে শুকনো জামা, তোয়ালে এনে এদের পরিচর্যা করতেন। বড়রা টের পেয়ে সব জামাকাপড় তালাচাবি দিয়ে রাখলো ; এত জামাকাপড়ের অপচয় সহ্য করা সম্ভব নয়।

সত্যনারায়ণের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। ক্লাসে যেটুকু পড়ানো হোত তার চেয়ে অনেক বেশী তিনি জানতেন এবং অন্য ছাত্রদের অপেক্ষা অল্প সময়ে পড়া আয়ত্ত করতেন। যাত্রাথিয়েটারের যেসব গানের মহড়া বাড়ীতে হোত, সে সব গানই তিনি গলায় তুলে নিয়েছিলেন। এমনকি মাত্র ৭ বছর বয়সেই এই বালক এমন কয়েকটি মর্মস্পর্শী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যে সেগুলি অনেক নাটকে সাগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ছন্দোময়

পুট্টাপর্তী থেকে আড়াই মাইল দূরে বুক্কাপট্নম্ শহরের স্কুলে সত্যকে ভর্তি করা হোল মাত্র আট বছর বয়সে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে, উত্তপ্ত পাথুরে পথের ওপর দিয়ে এবং বর্ষায় কর্দমাক্ত মাঠের ভেতর দিয়ে কখনো বা একগলা জল ভেঙ্গে, ব্যাগভর্তি বইখাতা মাথার ওপর শক্ত করে ধরে, তাঁকে স্কুলে যাতায়াত করতে হোত। খুব ভোরে পান্তা ভাত, দই দিয়ে অথবা গরম ভাত আর চাটনি পরম তৃপ্তিসহকারে খেয়ে, দুপুরের খাবার ব্যাগের ভেতরে নিয়ে, সহপাঠীদের সাথে তিনি নিয়মিতভাবে বুক্কাপট্নম্ যেতেন।

শ্রী বি. সুকন্নাচার (১৯৪৪ সালে প্রকাশিত এক বইতে) লিখেছেন, "অষ্টম শ্রেণীতে তিনি আমার ছাত্র ছিলেন। তিনি সরল, সাদাসিধে, সৎ এবং অত্যন্ত ভদ্র বালক ছিলেন।"—এর থেকেই বোঝা যায়, তাঁকে কি কঠোর আত্মসংযমের মাধ্যমে স্বীয় দৈবক্ষমতা দমন করে রাখতে হয়েছিল। তিনি সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলেন, যেদিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর বিখ্যাত অবতারত্ব ঘোষণার জন্য প্রস্তুত বলে বিবেচিত হবে।

আর একজন শিক্ষক শ্রী ভি. সি. কোণ্ডাপ্পা (যিনি পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্রকে 'দৈবভাবাপন্ন' বলে পূজো করেছেন) ঐ বইতেই লিখেছেন, "তিনি খুবই বাধ্য ছিলেন এবং কখনও প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। আগেভাগে স্কুলে এসে সঙ্গীদের জড়ো করতেন এবং ক্লাসঘরে দেবদেবীর কোন মূর্তি বা ছবি ফুল দিয়ে সাজিয়ে সবাইকে নিয়ে পূজো করতেন এবং কর্পূর জ্বালিয়ে আরতি করার পর নানাপ্রকার প্রসাদ বিতরণ করতেন। শূন্য থলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে রকমারি প্রসাদ বের করতেন আর সেগুলো পাবার লোভে ছেলেরা ছেঁকে ধরতো। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন এক 'দেবদূত' তাঁর কথা খুব মানে এবং তিনি যা চান সব ঐ 'দেবদূত'ই যোগাড় করে এনে দেয়।"

ঐ 'দেবদূতের' শক্তি যে কতখানি প্রচণ্ড তা তাঁর এক শিক্ষক একদিন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। ক্লাসের বেশিরভাগ সময় ভজন রচনা এবং সহপাঠীদের ভেতরে বিতরণের জন্য তার অনুলিপি তৈরী করতে কেটে যেতো বলে সাই বাবা সাধারণত ক্লাসে একটু আনমনা থাকতেন। একদিন শিক্ষক লক্ষ্য করলেন যে তিনি যে পাঠ লিখে নিতে বলছেন সত্য তাঁর খাতায় সেগুলো তুলছে না। সমস্ত ক্লাসের পক্ষে এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে ভেবে ঐ শিক্ষক চেঁচিয়ে বললেন, "যারা পাঠ লিখছো না তারা উঠে দাঁড়াও।" সত্যই ছিলেন একমাত্র দোষী। সত্যকে কারণ জিজ্ঞেস করা হোলে তিনি সরল মনে বললেন, "স্যার! আপনার পড়া তো আমি সব বুঝে নিয়েছি, তাই খাতায় আর লিখিনি। আমাকে পড়া ধরুন, দেখুন আমি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারি কিনা।" কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের আত্মসম্মানে লেগেছে, ছাত্রকে শাস্তি পেতেই হবে। হুকুম হোল শেষ ঘণ্টা না পড়া অবধি সত্যকে বেঞ্চের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সত্য বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। ক্লাসের অন্য ছেলেরা মনের দুঃখে মাথা নীচু করে রইল। সেদিন তাদের কারুরই বসে থাকতে ভালো লাগছিল না নিজেদের গুরুকে ঐভাবে বেঞ্চের ওপর কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা পড়লো। পরবর্তী শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলেন। এঁর নাম জনাব মহবুব খান। ইনি সত্যকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন যে তা বলার নয়। তিনি শেখাতেন ইংরাজি এবং তাঁর পড়াবার কায়দা এমন আন্তরিক আর আকর্ষণীয় ছিল যে প্রতিটি ছেলে প্রতিটি পাঠ ভালভাবে শিখতো। এই প্রৌঢ় অকৃতদারের সত্যের ওপর এক গভীর মমতা ছিল। (সাই বাবা প্রশংসাচ্ছলে আজও বলেন যে মহবুব খান অত্যন্ত উচ্চমানের ব্যক্তি ছিলেন।)

তিনি সত্যের জন্য নানারকম সুস্বাদু মিষ্টান্ন আনতেন, অনেক আদর আর অনুনয় বিনয় করে সত্যকে খেতে বলতেন। তিনি জানতেন যে আমিষের সাথে বিন্দুমাত্র ছোঁয়াছুঁয়ি হলে সত্য সে খাবার গ্রহণ করবেন না, তাই সত্যের জন্য খাবার তৈরি করার আগে তাঁর বাড়ী বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হোত।

সত্য প্রথমে সেই খাবার গ্রহণ না করলে তিনি কিছুতেই খেতেন না। সত্যের পাশে চুপ করে বসে থাকতেন, আদর করে সত্যের এক মাথা কালো কোঁকড়া চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ধীরে ধীরে বলতেন, "আহা কি চমৎকার ছেলে তুমি! তুমি দশের মঙ্গল করবে। তোমার মধ্যে বিরাট শক্তি আছে।"

মহবুব খান ক্লাসে ঢুকেই অবাক হোলেন যখন দেখলেন যে সত্যনারায়ণ বেঞ্চে দাঁড়িয়ে এবং আগের ক্লাসের শিক্ষক তখনও চেয়ারে বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় মাস্টারমশাই তাঁর কানে ফিসফিস করে বললেন যে উঠবেন কি করে, যতবারই উঠতে চেষ্টা করছেন ঐ চেয়ারটাও যে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছে, মনে হচ্ছে চেয়ারটাকে যেন তাঁর পেছনে আঠা দিয়ে আটকানো হয়েছে। ক্লাসের ছেলেরাও এই ফিসফিসানিতে ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল এবং মাস্টারমশাই-এর করুণ অবস্থা দেখে গোপনে হাসাহাসি সুরু করলো। ছেলেরা বলাবলি করতে লাগলো যে এ নিশ্চয়ই সত্যের সেই 'দেবদূতের' কাজ। মহবুব খানেরও সেইরকম সন্দেহ হোল। তিনি মাস্টারমশাইকে বললেন, 'সত্যকে শীঘ্র বেঞ্চ থেকে নামতে আদেশ দিন।' মাস্টারমশাইও বিনা আপত্তিতে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং সত্যকে বেঞ্চ থেকে নামতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটাও আল্‌গা হয়ে গেল আর তিনিও নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

অনেক বছর পরে, এই ঘটনার উল্লেখ করে বাবা বলেন যে, তাঁর ইচ্ছা-শক্তিতেই এই ঘটনা ঘটেছিল। এর পেছনে ক্রোধ ছিল না—কারণ তাঁর অন্তরে ক্রোধ নেই। তিনি শুধু চেয়েছিলেন তাঁর দৈবশক্তি প্রদর্শন করাতে, যাতে তাঁর স্বরূপ এবং কর্ম সম্পর্কে যুগান্তকারী ঘোষণা শোনবার জন্য মানুষের মন ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়। সৎ এবং পবিত্র প্রকৃতির জন্য তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে ডাকা হোত।)নৈতিক শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি দেখাতেন যে এই সীমাবদ্ধ জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ সেই পারমার্থিক আনন্দের কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট, যে পারমার্থিক আনন্দ লাভ করা যায় প্রার্থনা, মনঃসংযোগ, আত্মত্যাগ এবং সন্তোষের মাধ্যমে। এইসব গুণসম্পন্ন ঋষিদের গল্প শুনলে তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করতেন।

কোণ্ডাম্মা রাজুর ছেলেরা এবং এক মেয়ে, একই বাড়ীতে বাস করায় মোট প্রায় কুড়িটি শিশুর মধ্যে সত্য বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। শূন্য থলের ভিতর থেকে বের করা 'পেপারমিণ্ট' তাঁর কাছ থেকে পেতে হোলে শর্ত ছিল শিশুদের শুদ্ধ এবং সৎ হোতে হবে। এই শিশুদের কাছে সত্য সর্বদা আদর্শস্থানীয় ছিলেন। কোণ্ডাম্মা রাজুর মুখে শোনা—বুক্কাপট্নম্ হাট থেকে ছেলেমেয়েদের জামা বানাবার জন্যে রঙীন ছিট কিনে আনা হোলে এবং দর্জী এসে ছেলেদের মাপ নেওয়া শুরু করলে—সত্য বলে উঠতেন, "প্রত্যেকে নিজের নিজের পছন্দমতো কাপড় নেবার পর শেষে যা থাকবে সেটাই আমি খুশী মনে মেনে নেব।"

পুট্টাপর্ত্তীর প্রশান্তি নিলয়মে যে গৃহে সাই বাবা বাস করেন—পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, "আমার নিজের বলতে এমন কোন জমি নেই যাতে আমার নিজের জন্য ফসল ফলে—প্রতিটি জমিই ইতিমধ্যে কারোর না কারোর নামে দলিল করা আছে। ভূমিহীন মানুষ দিন গোনে কবে তাদের গ্রামের পুষ্করিণী সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে—কারণ তাহলে পুকুরের শুকনো বুকে লাঙ্গলের ফালের কয়েকটা আঁচড় বুলিয়ে নিজেদের জন্য কিছু ফসলের চাষ দ্রুত করতে পারবে। ঠিক সেইরকম আমিও আমার আহার—'আনন্দ' ফসলের চাষ করি পুকুরের বুকের মত দুঃখে শুকিয়ে যাওয়া মানুষের হৃদয়জমিতে।"

সত্যর এই ধরণের হাবভাবের তাৎপর্য ঐ সময়ে কোণ্ডাম্মা রাজুও বুঝতে পারেননি। তিনি শুধু ছেলেটিকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন।

শিশুকাল থেকেই তিনি সর্বপ্রকারের নিষ্ঠুর প্রকৃতির খেলাধূলার বিপক্ষে ছিলেন। প্রতি বছর নদীর চরে যে বলদে-টানা-গাড়ীর দৌড় প্রতিযোগিতা হোত, তিনি তাঁর বন্ধুদের কখনো তা দেখতে দিতেন না। মালিকদের খুশী করবার জন্যে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে চালকরা বলদের লেজে মোচড় দিয়ে, পিঠে বেত্রাঘাত করে নির্মম নির্যাতন চালাতো। কিন্তু তিনি তীব্র কণ্ঠে এসবের প্রতিবাদ করে উঠতেন।

অনেক বছর পরের একটা ঘটনা। একদল ভক্ত বাবার দর্শনের পর প্রশান্তি নিলয়ম থেকে গরুর গাড়ী করে নদী পার হচ্ছে। ওপারে মোটর অপেক্ষা করছে। যাত্রাকালে বাবা আশীর্বাদ জানালেন। গরুর গাড়ীটি প্রধান গেট

দিয়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। হঠাৎ একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে বলল যে বাবা তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তারা ফিরে এলে, বাবা বললেন, "শোনো, বালির ওপর পৌছলে তোমরা গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে নদী পার হবে। কারণ, বেশি ওজন নিয়ে বালির ওপর দিয়ে চলতে গরুর খুবই কষ্ট হবে। বুঝতে পেরেছো?"

ভালুকের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া বা মোরগের লড়াই বা ঐ ধরনের কোন গ্রাম্য আমোদ-উৎসবের তিনি নিন্দা করতেন—সঙ্গীদেরও দেখতে বারণ করতেন।

তখনকার দিনে কোন ভ্রাম্যমান সিনেমা দেখানোর দল বুক্কাপট্নম্ বা কোথাচেরুভু নগরে তাঁবু ফেললে আশেপাশের এলাকায় একটা আলোড়নের সৃষ্টি হোত। গাঁয়ের লোকেরা তাদের সামান্য রুজিরোজগার নিঃশেষ করে ছুটতো সিনেমা দেখতে—একটাও যাতে বাদ না পড়ে। পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুও ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখতে যেতেন। সত্যকে চেষ্টা করতেন সঙ্গে নিতে—কিন্তু সত্য যেতে তো চাইতেনই না বরং এর প্রতিবাদ করতেন। তিনি বলতেন, ফিল্মগুলোর মান অত্যন্ত নীচু, দেবতার কাহিনী অতি নিকৃষ্টভাবে দেখানো হয় এবং সঙ্গীতকে পরিণত করা হয় জগাখিচুড়ীতে। তিনি আরও বলেন যে এইসব ফিল্মে জীবনের কুৎসিত দিকটাই তুলে ধরা হয় এবং নিষ্ঠুরতা, শঠতা ও অপরাধের প্রশংসা করা হয়।

যে কলাবিদ্যা—বিশেষ করে সাহিত্য এবং সিনেমা পয়সার লোভে আদর্শকে টেনে নীচে নামায় তার কঠোর সমালোচনা সাই বাবা আজ অবধি করে চলেছেন।

দশ বছর বয়সে তিনি পুট্টাপর্তীতে একটি 'পাণ্ডারী' ভজন দল গঠন করলেন—দেবতার উদ্দেশে প্রেম ও ভক্তিমূলক গীত গাইবার জন্য। এই ধরনের কিছু দল আশেপাশের গ্রামে পূর্ব থেকেই ছিল। আঠারটি বালক নিয়ে দল—প্রত্যেকের পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে পতাকা আর পায়ে ঘুঙুর। পাণ্ডুরঙ্গ মন্দির দর্শনাভিলাষী ভক্তের কাতর মিনতির ভাব নিয়ে রচিত লোকগীতির সুরে ও ছন্দে এরা নাচতো গাইতো। দীর্ঘ তীর্থযাত্রার ক্লেশ, মন্দিরে শীঘ্র পৌছানোর জন্য তীর্থযাত্রীর ব্যাকুলতা এবং মন্দিরচূড়া দর্শনে তাদের হর্ষোচ্ছাস—কবিতা

আর গানে এইসব ভাব তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতেন আর ছেলেদের সেসব শেখাতেন।

ভাগবতপুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করেও তিনি কিছু গান রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের দুষ্টামিতে অতিষ্ঠ হয়ে গোপিনীরা মা যশোদার কাছে নালিশ করতে এসেছেন। যশোদা কৃষ্ণকে বকছেন আর কৃষ্ণ বলছেন তিনি কিছু করেননি। যশোদা আর কৃষ্ণকে ঘিরে গোপিনীরা নেচে নেচে অভিনয় করছে—তাঁর দলের ছেলেমেয়েদের অভিনীত এই মধুর দৃশ্য গ্রামবাসীদের কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। সত্য কখনও সাজতেন যশোদা, কখনও বা কৃষ্ণ। তাঁর ছন্দোময় নৃত্য এবং দেবকণ্ঠের গীত সমগ্র নৃত্যনাট্যে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতো।

পরিচিত দেবদেবীর উদ্দেশে ভজন রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক নতুন দেবতা, নতুন তীর্থের সন্ধানে যাত্রার ভাব নিয়েও গীত রচনা করলেন। কে এই নতুন দেবতা? কোথায় এই নতুন তীর্থক্ষেত্র? কেউ বোঝেনি। এই নতুন তীর্থ কি শিরডি আর নতুন দেবতা কি সাই বাবা? শিরডির সাই বাবা? নাহলে কে হোতে পারেন? এই বালকের পক্ষে শিরডির সেই মুসলমান তপস্বীর কথা কি করে জানা সম্ভব? বালকদের নৃত্যনাট্য দেখতে দেখতে বড়রা আশ্চর্য হয়ে এই কথা চিন্তা করতো।

দেবতার পূজার নিমিত্ত চাল, তেল, ধূপকাঠি আর কর্পূর কেনবার জন্য এই ভজনমণ্ডলী প্রতি বাড়ী থেকে এক আনা করে চাঁদা সংগ্রহ করতো। যে জ্বলন্ত প্রদীপ সঙ্গে নিয়ে তারা গ্রামের পথে ঘুরে ঘুরে গান গাইত, ঐ প্রদীপের শিখাকে ভাস্বর রাখবার জন্য তেলের প্রয়োজন। প্রসাদ হিসেবে বিতরণের জন্য লাগতো আতপ চাল। কোন কোন উৎসবের সময় যখন বেশি টাকা তোলবার দরকার হোত, তখন চাঁদা ধার্য হোত দুআনা; ঐ টাকা দিয়ে কেনা হোত পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন। বুক্কাপট্নম্ গিয়ে পেট্রোম্যাক্স কিনে সবাই হৈ হৈ করে ফিরে আসতো। এইসব অনুষ্ঠানে যন্ত্রশিল্পীর ভূমিকা নিতেন রাজু পরিবারের ছেলেমেয়েরা।

সত্য ছিলেন এই দলের কেন্দ্রমণি, একাধারে সংগঠক, কোষাধ্যক্ষ, পরিচালক, গীতিকার এবং প্রধান গায়ক। তাঁর অভিনয় এমন প্রাণবন্ত ছিল যে, বৃন্দাবন মথুরার সেই অপূর্ব দৃশ্যাবলী, যেখানে গোপালক শ্রীকৃষ্ণের প্রাণমাতানো

বাঁশীর সুর যোগিকুল, সবৎস ধেনু, তরুলতা এবং যমুনানদী সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে—দর্শকদের চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতো।

একবার নরসিংহাবতার পালা হচ্ছে। নরসিংহের শৌর্য এবং সাফল্যের কাহিনী বর্ণনা করে গান চলছে। "লৌহস্তম্ভ ভেদ করে নরসিংহ অবতার বেরিয়ে এলেন"—এই পদটা যখন গাওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল নরসিংহের বেশে নিপুণভাবে সজ্জিত হয়ে সত্য স্টেজের ওপর এক উচ্চলম্ফ দিয়ে পড়লেন। অভিনয়ের ভেতর ক্রোধ, ঘৃণা আর বরাভয়ের ভাব নিখুঁতভাবে প্রকাশ করার ফলে তাঁর চোখমুখের চেহারা এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে দর্শকরা তা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। বড় বড় পালোয়ানরাও বালকটিকে ধরে রাখতে পারে না। অবশেষে, নারকেল ভেঙে পূজো এবং কর্পূরারতি করার পর সত্য স্বাভাবিক হন এবং পুনরায় গানটি শুরু করেন।

এই ঘটনায় 'পাণ্ডারী' ভজনদলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। রটে গেল যে এই দলের নাচগানের সময় ঈশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত হন এবং পুট্টাপর্তীর লোকেরা এ দৃশ্য দেখেছে। একবার আশপাশের গ্রামের বহু পরিবার কলেরার প্রকোপে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেলেও পুট্টাপর্তী গ্রামে কিন্তু যম হাত দিতে পারেনি। বিজ্ঞ লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে ভজনদলের দ্বারা সৃষ্ট স্বর্গীয় আবহাওয়ার ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

এরপর থেকে এই দলের কাছে বহু গ্রাম থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগলো সেখানে গিয়ে গান গেয়ে দেবতার ক্রোধ থেকে তাদের গ্রামকে বাঁচানোর জন্যে। প্রায়ই গরুর গাড়ী পাঠানো হোত এদের যাতায়াতের জন্যে। কিন্তু কখনও কখনও এই বালক-ত্রাণকর্তার দল ১০/১২ মাইল হেঁটেই চলতো—খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে—মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড উত্তাপে কোন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে নিতে। এইসব গ্রামবাসীরা 'শিরডি' এবং 'সাই বাবা' এই দুটি নাম ভাসা ভাসা ভাবে জানতো; কিন্তু অধিক কিছু না জানায় তারা বিশেষ মাথা ঘামাতো না।

যাত্রা বা থিয়েটারে সংলাপ, নৃত্য এবং সাজসজ্জার মাধ্যমে পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করা হোত। এতে দেখানো হোত কি করে শুভ শক্তির জোরে রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটে। সত্য যেসব বাড়ীতে

পদার্পণ করতেন সেইসব বাড়ীতে এই নাটকগুলি লেখা হোত, মহড়া হোত এবং মঞ্চস্থ হোত।

মুখ্যত পুরাণের বিখ্যাত দানব বনাসুরের ভূমিকায় তাঁর সুঅভিনয়ের জন্যে সত্যের পিতৃদেব অত্যন্ত নামকরা অভিনেতা ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও অননুকরণীয় ছিল।

এই সময় বন্যার্তদের সাহায্যার্থে টাকা তোলবার জন্যে অনেকগুলি নাটক পরিবেশিত হয়। 'বনাসুরম্', 'উষাপরিণয়ম্', 'দ্রৌপদীমানসংরক্ষণম্' ও 'কংসবধ'—এই নাটকগুলি খুব সমাদৃত হয়। নাটকগুলি সবই পৌরাণিক ঘটনাশ্রয়ী :—দ্রৌপদীর সম্মান কিভাবে রক্ষিত হয়েছিল বা অত্যাচারী রাজা কংস কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়েছিল ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিশোর সত্য নানা ভূমিকা বেছে নিয়েছিলেন অভিনয়ের জন্যে, বিশেষ করে কৃষ্ণ এবং মোহিনীর ভূমিকা। তাঁর অভিনয়, তাঁর গান এবং সর্বোপরি তাঁর নাচ দেখবার সময় সকলে হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতো। নৃত্যের সময় সুর আর তালের সাথে সাথে তাঁর শ্রীচরণের এমন নমনীয় এবং মনোমুগ্ধকর ছন্দ তারা কদাচিৎ দেখেছে। তাঁর নৃত্য দেখে দর্শকদের মনে হোত তিনি যেন স্বর্গলোক থেকে সদ্য নেমে আসা এক কুশলী নর্তক, যাঁর পা ফেলা দেখে মনে হয় তা যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করছে না।

অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরো নতুন নতুন ভূমিকায় নামতে লাগলেন। একবার 'কনকতারা' নামক এক জনপ্রিয় নাটকে তিনি তারার ভূমিকায় এমন চমৎকার অভিনয় করেন যে তাঁর জননী দর্শকদের মাঝখান থেকে মঞ্চের ওপরে ছুটে আসেন—কি ব্যাপার—না, তারাকে তিনি মেরে ফেলতে দেবেন না। মায়ের খেয়ালই নেই যে এটা নাটকের একটা দৃশ্য।

কখনো কখনো দর্শকদের খুশী করতে সত্য নাটকে একাধিক ভূমিকায় নামতেন। কৃষ্ণলীলার তিনি কৃষ্ণজননী দেবকী, বালক কৃষ্ণ এবং এমনকি কংসের রাজসভার নর্তকীর ভূমিকাতেও নামতেন। অন্যান্য সময়ে তিনি পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীর ভূমিকা নিতেন।

এইসময় এক পেশাদার নাট্যসংস্থা ঐ এলাকায় ভ্রমণ করতে আসে এবং তাদের গীতিনাট্য দেখতে প্রচুর ভীড় হয়। বুক্কাপট্নম্ থেকে সুরু করে পুট্টাপর্তী,

কোথাচেরুভু, এলুমালাপল্লী এবং অন্যান্য বড় বড় গ্রামে তারা অভিনয় দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। জেলার সবার মুখেই এদের অভিনয়ের প্রশংসা। দলের একটি মেয়ে ঋষ্যেন্দ্রমণি, বাজনার তালে তালে অদ্ভুত সব কসরৎ কায়দা করে নাচ দেখাতে ভীষণ পটু। প্রধান আকর্ষণ মাথার ওপরে একটা বোতল ব্যালান্স করে রেখে নাচতে নাচতে নীচু হয়ে শুয়ে পড়ে মেঝের ওপর দেশলাইয়ের বাক্সের ওপর রাখা একটা রুমাল দাঁত দিয়ে ধরে আবার ঠিক ঐভাবে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানো—আর সর্বক্ষণ ঐ বোতলটি মাথার ওপরে ঠিক ঠিক দাঁড় করিয়ে রাখা—রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। এই দুরূহ কসরৎ আয়ত্ত করতে মেয়েটিকে প্রচুর সাধনা করতে হয়েছে আর তাই দর্শকরা যে ধন্য ধন্য করবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

অনেকের সঙ্গে সত্যও এই পেশাদারদের অভিনয় এবং এই নাচটি দেখলেন, বাড়ী ফিরে প্রচণ্ড চেষ্টা চলতে লাগলো নাচটিকে আয়ত্ত করবার এবং অবশেষে সবাইকে অবাক করে দিলেন অতি সহজেই যখন এটি করে দেখাতে পারলেন। বয়স্করা চাইলেন সত্যর প্রোগ্রামে এই নাচটি দেখানো হোক, কিন্তু সত্য লজ্জায় পিছিয়ে গেলেন। অবশেষে কয়েকটি উৎসাহী যুবকের চাপে পড়ে তাঁকে রাজি হোতে হোল। ঠিক হোল কোথাচেরুভু গ্রামের মেলায় এই নাচ দেখানো হবে। মজা করে দুঃসাহসের সঙ্গে এই ঘোষণাও করা হোল যে বিখ্যাত নর্তকী ঋষ্যেন্দ্রমণি সশরীরে মঞ্চে অবতীর্ণ হবেন। এদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সত্যের সাজসজ্জা নিখুঁত হবে এবং তিনি কখনোই তাদের নিরাশ করবেন না। সত্যের বোনেরা ঋষ্যেন্দ্রমণির মতন করে সত্যকে সাজালেন—নিজেদের গয়নাগাটি পরিয়ে—চুলের সুন্দর কায়দা করে—তারপর কোথাচেরুভুতে নিয়ে গেলেন। সত্যকে যে এভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে একটা বোকার মত বাহাদুরী দেখানোতে রাজি করানো হয়েছে—এর পরিণতির কথা চিন্তা করে সত্যের পিতা তো বেশ আতঙ্কিত হলেন!

অভিনয়ের দিন এলো। পর্দা উঠলো। কংসের দরবারে 'ঋষ্যেন্দ্রমণি' দ্রুত এবং লঘুপদে নাচতে নাচতে প্রবেশ করলেন। এই নাচ দেখবার আগ্রহে দর্শকেরা পূর্ব থেকেই এত উত্তেজিত ছিল যে কোন পার্থক্য ধরতেই পারলো না। সেই বিখ্যাত নাচ শুরু হোল। সত্য এই নাচটির আরো উন্নতি

ঘটিয়েছেন। রুমালের জায়গায় সূঁচ এবং এই সূঁচ তোলা হবে চোখের পাতার সাহায্যে! সেই দিনের 'ঋষ্যেন্দ্রমণি' তো খুব সাফল্যের সঙ্গে এই চোখের পাতা দিয়ে সূঁচ তোলা দেখালেন, কিন্তু এর ফল হোল সাংঘাতিক।

মেলার সভাপতি নর্তকের বুকে একটি মেডেল ঝুলিয়ে দিলেন। প্রচুর প্রশংসা আর অভিনন্দন বর্ষিত হোল। বিভিন্ন স্থান থেকে এই নাচ দেখাবার আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। রূপোর কাপ আর সোনার মেডেলে দুহাত ভরে গেল। এইসব দেখে সত্যের মা এবং অন্যান্যরা প্রথমে খুবই রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন, কিন্তু পরে, এই ভেবে ভয় পেলেন যে সত্যের ওপর এইবার নির্ঘাৎ নজর লাগবে। এঁদের আশঙ্কা মিথ্যে হোল না। তাঁর দুই চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠলো, অসহ্য যন্ত্রণা, সমানে জল পড়তে লাগলো, জরও এসে গেল।

একদিন রাত্রে তাঁর মা শুনতে পেলেন কে যেন খড়ম পায়ে খটাস্ খটাস্ আওয়াজ করতে করতে বাড়ীর ভেতর ঢুকলো আর সোজা সত্যের ঘরের দিকে চলে গেল। খুবই রহস্যময় ব্যাপার মনে করে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং সত্যের ঘরে গিয়ে তাঁর কপালে হাত দিয়ে জর কত দেখলেন। কি আশ্চর্য—কপাল ঠাণ্ডা—জর ছেড়ে গেছে। একটা আলো এনে তিনি ছেলের চোখ ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। আশাতীতভাবে উন্নতি হয়েছে দেখলেন। পরদিনই সত্য সম্পূর্ণ সুস্থ হোলেন।

৬মেলা

উচ্চশিক্ষার জন্য সত্যকে বুক্কাপট্নমের বাইরে যেতে হবে বলে, স্থির হোল যে কমলাপুরে দাদা শেষাম্মা রাজুর কাছে তিনি থাকবেন। কমলাপুরের শ্রীপশুপতি সুব্বা রাজুর কন্যাকে শেষাম্মা বিবাহ করেছেন। এই ব্যবস্থায় সত্যের মা-বাবাও খুশী হলেন। এঁদের মনের পরিকল্পনা ছিল, কলেজের শিক্ষালাভ শেষ করে সত্য একজন অফিসার তৈরী হোন। এই কারণেই তাঁরা

সত্যের বিচ্ছেদ মেনে নিতে রাজি ছিলেন। বুক্কাপট্নমের মতো কমলাপুরেও সত্য নিয়মিত স্কুলে যেতেন। সেখানে তিনি সভ্য এবং শান্ত বলে শিক্ষকদের প্রিয় হোলেন।

শহরের প্রতিটি নাটকে, পর্দা ওঠবার আগে, উদ্বোধনী প্রার্থনা সঙ্গীত তাঁকে গাইতে হোত। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের গান শোনবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাঁরা পাঁচজনকে বলতে লাগলো যে শহরে একজন ভাল গায়ক এসেছেন। অল্পদিনের মধ্যে সব অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য একমাত্র তাঁকেই আমন্ত্রণ করা হোতে লাগলো।

ঐ স্কুলের একজন ড্রিলমাস্টারের কথা সত্য সাই বাবা আজও ভোলেননি। এই মাস্টার ছেলেদের প্রতি তাঁর প্রাণভরা ভালবাসার জন্য সমগ্র স্কুলের শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন। ইনি স্কাউটশিক্ষকও ছিলেন। সত্য যাতে স্কাউট হন তার জন্য এঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। তিনি নিজে এবং বন্ধুদের মাধ্যমে চেষ্টা চালাতে লাগলেন যাতে সত্য রাজি হন। রেভিন্যু অফিসারের দুই ছেলে সত্যের সঙ্গে পড়তো। তারা সত্যের সঙ্গে একত্র বসতো এবং সত্যকে খুব ভালবাসতো। এরাও সত্যকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এবং স্কাউটের একটি নতুন এবং সুন্দর পোষাক সত্যের ডেস্কে জোর করে রেখে দিল যাতে সে উৎসাহবোধ করে। এরা সবাই জানতো যে সত্য এই দলে যোগ দিলে তিনিই এর প্রাণস্বরূপ হবেন আর তাহলে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এর পৃষ্ঠপোষক হতে রাজি হবেন। তা না হোলে এদের ভুল ধারণা হবে যে, কিছু অলস আর বেকার ছেলে বেড়াবার আর পিকনিক করবার মতলব নিয়ে এই দল গঠন করেছে।

শেষ পর্যন্ত সত্য যোগ দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই পুষ্পগিরিতে এক বিরাট পশুমেলা বসলো। দলবল নিয়ে স্কাউটমাস্টার চললেন সেখানে। বিরাট জনসমাবেশ হবে। সুতরাং ছেলেদের সেবাকাজ চালাবার মস্ত সুযোগ। নিখোঁজ শিশু উদ্ধার, যাত্রীদের পানীয়জল দান,, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার তদারকী এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি কত কাজ। স্থির হোল প্রত্যেক ছেলেকে ক্যাম্প ফি বাবদ মাথাপিছু দশ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে।

এদিকে সত্যের হাতে একটা পয়সাও নেই। তিনি স্থির করলেন যে সঙ্গীদের শিক্ষা এবং প্রেরণা দান করবার এমন সুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না।

তিনি শিক্ষা দিয়ে দেখাবেন যে সেবার মধ্যেই সেবার পুরস্কার মেলে, এবং ভালবাসা দিয়ে জগৎ জয় করা যায়। তিনি ঠিক করলেন, বাসভাড়া বাঁচিয়ে পুষ্পগিরি পর্যন্ত হেঁটে যাবেন। স্কাউটমাস্টারকে জানালেন যে তাঁর আপনজনেরা মেলায় আসছে, আর তারাই তাঁর দেখাশোনা করবে। (সত্যিই তো সব তীর্থযাত্রীই তো তাঁর আপনজন!) তিনি হিসাব করে দেখলেন যে পুষ্পগিরিতে পাঁচ টাকাই যথেষ্ট। আগের ক্লাসের বইগুলো কম ব্যবহার করবার দরুণ, প্রায় নতুনের মতো ছিল। ক্লাসের একটি ছেলের কাছে তিনি সেগুলি বিক্রী করলেন। ছেলেটি বই-এর ন্যায্য দাম বার টাকা দিতে চাইলে তিনি কিন্তু পাঁচ টাকার বেশি নিলেন না। এরপর তিনি হাঁটা স্থরু করলেন এবং মেলা বসার আগের দিন রাত ৯টায় পুষ্পগিরি পৌছলেন।

পথশ্রমে তিনি খুবই ক্লান্ত। ছোট্ট একটি থলের ভেতর তাঁর জামাকাপড়, পয়সা রাখা ছিল—মেলায় আগত হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে তিনিও নদীর তীরে বালির বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখলেন টাকাপয়সাসমেত থলেটি চুরি গেছে।

পরবর্তীকালে, সমবেত ভক্তদের কাছে—এই ঘটনা বর্ণনাকালে সত্য সাই বাবা বলেছেন যে তিনি এতে মোটেই ঘাবড়াননি। নিরুদ্বিগ্ন মনে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে একটি পাথরের থালার ওপর তিনি এক আনা পয়সা এবং এক বাণ্ডিল বিড়ি দেখতে পেলেন। পয়সাটা তুলে নিয়ে বাজারে গিয়ে তিনি দেখলেন এক জায়গায় লটারী খেলা হচ্ছে। একজন তার সামনে খেলার যন্ত্র নিয়ে বসে আছে। একটা কালো কাপড়ের ওপর সাদা রং দিয়ে এক বৃত্ত আঁকা, আর তার পাশ দিয়ে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন। কয়েকটি চিহ্নের জন্য কিছু মূল্য ধার্য করা আছে, বাকি চিহ্নগুলিতে কোন মূল্য দেওয়া নেই। ঘড়ির কাঁটার মত একটা বড় কাঁটা যন্ত্রের মাঝখানে লাগানো আছে। লোকটির কাছে কিছু পয়সা বাজি রেখে জোরে ঐ কাঁটাটি ঘোরাতে হবে। কাঁটাটি যদি ঘুরতে ঘুরতে ২, ৩ বা ৪ এর কাছে এসে থেমে যায়, তবে যত পয়সা বাজি ধরা হয়েছে তার ২, ৩ বা ৪ গুণ পয়সা পাওয়া যাবে। নইলে, পয়সা আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না। সত্যকে তাঁর নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে হবেই। বেশ কয়েকবার তিনি বাজি ধরে খেললেন এবং প্রতিবারই জিতলেন।

এইভাবে মোট বার আনা পাওয়া গেল। সাই বাবা বলেন যে, ইচ্ছা করলে তিনি আরো জিততে পারতেন, কিন্তু ঐ বেচারার আয় অতি সামান্য বলে তাঁর দয়া হোল।

তিনি ভাবলেন, এই বার আনায় এক সপ্তাহ বেশ ভালভাবেই চলে যাবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে তিনি তাঁর নিজের আহার্য সংগ্রহ করতে পারতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর হাতের ঘ্রাণ দ্বারা প্রমাণিত করে দিতেন যে তিনি সত্যিসত্যিই খেয়েছেন। (এমনকি, এখনও, যদি ভক্তেরা তাঁর খাওয়া নিয়ে কখনো সন্দেহ প্রকাশ করে, তাঁকে বলতে শোনা যায় "আমার খাওয়া হয়ে গেছে" এবং ভক্তদের সন্দেহ দূর করতে তাঁর শ্রীহস্ত আঘ্রাণ করতে দেন!) সবার সঙ্গে না খাওয়াতে সেই স্কাউটমাস্টারের কিন্তু এই ধারণাই হোল যে মেলায় আগত সত্যের আপনজনেরাই তাঁকে ভালমন্দ খাওয়াচ্ছে, তাই কাজের দায়িত্ব বণ্টনের ব্যাপারে তিনি সত্য এবং অন্য ছেলেদের মধ্যে কোন তারতম্য করলেন না। প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর সহপাঠীদের ভেতরে নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে প্রেরণাসঞ্চার করতে সত্য লেগে গেলেন। (এই প্রসঙ্গে বলা চলে, আজও সাই বাবার শিক্ষার মূল স্বর নিঃস্বার্থ সেবা। অপরকে সেবা করার অর্থ নিজেকেই সেবা করা, কারণ অপর ব্যক্তির দেহ বা নামই শুধু ভিন্ন, আত্মা এক, অভিন্ন।)

ফেরবার সময় ঠিক হোল স্কাউটরা সবাই বাসে চেপে কমলাপুর যাবে। কিন্তু যেহেতু বাসের চাঁদা দিতে পারেননি তাই সত্য চুপচাপ ক্যাম্প ত্যাগ করে সম্পূর্ণ পথ পায়ে হেঁটে ফিরলেন—আদর্শের প্রতি এমনই তাঁর অনুরাগ!

সত্য কমলাপুরে একলাই বাস করতেন। পূর্বেই বাবা-মাকে ছেড়ে দাদার কাছে এসেছিলেন। দাদাও আবার শিক্ষকতার ট্রেনিং নিতে বাইরে থাকেন। এখানে কোটেসুব্বান্না নামে এক দোকানদার ছিল। তার দোকানে ওষুধপত্র থেকে শুরু করে নানারকম সৌখিন সব জিনিস পাওয়া যেতো। সত্যের কাপড়জামা বা অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন হোলে এক অভিনব উপায়ে সেগুলি তিনি ঐ দোকান থেকে পেতেন। দোকানে হয়তো নতুন ধরনের কোন জিনিস এসেছে, বাজারে সেটাকে চালু করা দরকার অথবা কোন পেটেন্ট ওষুধের বিক্রী বাড়ানো দরকার, সুব্বান্না অমনি সত্যকে গিয়ে রাস্তার মধ্যে ধরতো,

যখন সত্য বইপত্তর নিয়ে স্কুলে চলেছেন—এবং কি করতে হবে তা সত্য বলে দিতেন। সন্ধ্যের মধ্যেই ঐ বিশেষ দ্রব্যটির গুণ বর্ণনা করে একটি সুন্দর কবিতা লিখে ফেলতেন এবং তাতে মিষ্টি সুর দিয়ে গানও রচনা করতেন। গানগুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সত্য এর বদলে পেতেন প্রয়োজনীয় জামাকাপড় বইপত্র ইত্যাদি। পয়সা দিয়ে কয়েকটি ছেলে সংগ্রহ করে তাদের হাতে পণ্যের বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ড ধরিয়ে দেওয়া হোত। এই মিষ্টিসুরের গানগুলি মিলিতকণ্ঠে গাইতে গাইতে এরা দলবেঁধে রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করে বেড়াতো। এই কাজে ছেলেরা খুবই মজা পেতো। (সাই বাবা এখনও মাঝে মাঝে তাঁর কাছে সমাগত ভক্তদের এইসব পুরনো 'বিজ্ঞাপনী' গান গেয়ে শোনান।)

বাবার পুরনো দিনের ভক্তরা বলে থাকেন যে উরাভাকোণ্ডাতে যদিও বাবা তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন, কিন্তু কমলাপুরেই তাঁর মহিমা প্রথম বিকশিত হয়। পরবর্তীকালে কমলাপুরের অধিবাসীরা নিন্দাবাদে মুখর না হয়ে, আত্মদম্ভ বর্জন করে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বাবার ডাকে সাড়া দিয়েছিল বলেই কমলাপুরকে এই বলে প্রশংসা করা হয়। বাবা পুট্টাপর্তীতে ফিরে এলে এই কমলাপুরের অধিবাসীরাই **"বালসাই"**কে পূজার্চনার দ্বারা অভ্যর্থনা করার জন্য জনসভা ইত্যাদির আয়োজন করেছিল।

শেষাম্মা রাজু শিক্ষকের ট্রেনিং শেষ করে উরাভাকোণ্ডার এক হাইস্কুলে তেলুগু ভাষার শিক্ষকের চাকরিতে নিযুক্ত হলেন। তিনি একে শুভ বলে মনে করলেন, কারণ তাহলে সত্যকে তিনি কাছে রাখতে পারবেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে সত্য উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবেন।

সর্প পর্বত

উরভকোণ্ডা নামটি এসেছে স্থানীয় একটি পাহাড়ের নাম থেকে। প্রথমে এর নাম ছিল উরগাকোণ্ডা। 'উরগ' মানে সাপ আর 'কোণ্ডা' মানে পাহাড়। পাহাড়টির চূড়ায় প্রায় ১০০ ফিট উঁচু একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। দেখলে মনে হয় যেন একটা মস্ত সাপ অজস্র ফণা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে।

উরভকোণ্ডা হাই স্কুলের খ্যাতি কোনদিন ম্লান হবে না, কারণ এখানেই বাবা পড়াশোনা করেন। স্কুলে যোগদানের পূর্বেই তাঁর খ্যাতির কথা ছেলেরা জানতো। তারা বলাবলি করতো যে সত্য খুব ভাল লিখতে পারেন, সুন্দর গান করেন, অপূর্ব নাচেন, যেকোন শিক্ষকের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানের অধিকারী আর, শুধু তাই নয়, ভূত ভবিষ্যতও বলে দিতে পারেন। তাঁর দৈবশক্তি এবং কীর্তি সম্পর্কে প্রামাণিক কাহিনী সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। বুক্কাপট্নম্, পেনুকোণ্ডা, ধর্মাভরম্ ও কমলাপুর থেকে আগত লোকদের কাছ থেকেই উরভকোণ্ডার অধিবাসীরা সর্বপ্রথম এইসব কাহিনী শুনতে পায়। তারা শুনে অবাক হয় যে বাবা একেবারে শিশু বয়সেই শূন্য থেকে শুধুমাত্র হাত সঞ্চালন করে ফল, ফুল, মিষ্টি ইত্যাদি সৃষ্টি করবার দুর্লভ শক্তির অধিকারী ছিলেন। এরা বিস্ময়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে "কি অদ্ভুত সব কাণ্ড!"

এই অলৌকিক বালকের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার কৌতূহল নিয়ে তারা নতুন তেলুগু শিক্ষক শেষাম্মা রাজুকে ঘিরে ধরে। সত্য যে ক্লাসে পড়েন, সেই ক্লাস নেবার জন্য সব শিক্ষককেই, বিভিন্ন কারণে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়—কেউ নিছক কৌতূহলে, কেউ শ্রদ্ধায় আবার কেউ বা কুমতলব নিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে এসব একেবারে আজগুবী ব্যাপার।

কিছুদিনের মধ্যেই সত্য স্কুলের সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন এবং সমগ্র শহরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ক্লাস বসবার পূর্বে স্কুলের প্রার্থনাসভার

পরিচালক হিসাবে তিনি যখন স্টেজে উঠে দিব্যকণ্ঠে গান গাইতেন তখন সমগ্র পরিবেশ পবিত্র হয়ে উঠতো। শিক্ষক ও ছাত্রেরা আপন কর্তব্য সম্পাদনে নিজেদের উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করতো। স্কুলের থিয়েটারের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি খুব জোরে দৌড়তে পারতেন এবং এইরকম এক দৌড়ঝাঁপের খেলা 'গুডুগুডু' ভাল খেলতেন বলে খেলার দলের তিনি ছিলেন খুঁটি। স্কুলের স্কাউটদলেও তিনি ছিলেন সবার সেরা।

একবার অভিনয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীথাম্মি রাজু সত্যকে একটি নাটক রচনা ও প্রযোজনা করতে বলায় তিনি মহা উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একটি ছোট ছেলে এর নায়ক। সত্য নিজেই সেই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলেই শুধু নয়, প্রধানত বিষয়বস্তুর গুণে এই নাটকটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। বিষয়বস্তু ছিল—'ভণ্ডামী'—যা মানুষের প্রকৃতিগত পাপ। নাটকটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'কথা অনুযায়ী কি কাজ করা হয়?'

যবনিকা উঠলে দেখা গেল একটি মহিলা একদল মহিলা শ্রোতাকে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। মহিলাটি বলছেন যে, যারা খেটে উপার্জন করতে পারে না, যারা পঙ্গু, তারাই সাহায্য পাবার যোগ্য। তাদেরকে সাহায্য করাই গৃহিনীদের কর্তব্য। কিন্তু যারা শক্তসামর্থ্য, অন্যের গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটায়, তাদের সাহায্য করা ঠিক নয়। মহিলারা প্রস্থান করলেন। স্টেজে মহিলা একা বসে, কাছে তাঁর শিশুপুত্র কৃষ্ণ, যে এতক্ষণ মন দিয়ে এই পাঠ শুনছিল। (সত্য নিজে এই বালকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।) এই সময় এক অন্ধ ভিখারী ভিক্ষা চাইতে আসে কিন্তু তাকে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর বিরাট ভুঁড়িওয়ালা ষণ্ডামার্কা এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে। তার একহাতে চালভর্তি একটি চকচকে তামার পাত্র, অন্য হাতে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা এক তানপুরা। মহিলাটি সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে ভেতরে আনে এবং তার হাতে চাল আর অর্থ দান করে। এরপর পদতলে লুটিয়ে প্রণাম করে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। কৃষ্ণ তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে বসে "কই মা, একটু আগে তুমি যা যা বললে তুমি নিজে সে কাজ কেন করলে না?" এক ধমকে মহিলাটি কৃষ্ণকে থামান "আমরা মুখে যা বলি সেভাবে কি চলা যায়?" মা তো চটে লাল। বাচ্চা ছেলের এতবড় সাহস যে বড়দের

আচরণ নিয়ে কথা বলে ! ছেলেকে টেনে হি চড়ে নিয়ে গেলেন বাবার কাছে। বাবা অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট…মনোযোগ সহকারে ফাইলপত্র দেখছেন। তিনি পুত্রকে এক লম্বা লেকচার দিয়ে বোঝাতে চাইলেন শিক্ষার মূল্য কি এবং যত অসুবিধাই হোক না কেন ছেলেদের কি ভাবে লেখাপড়া করে ধাপে ধাপে ক্লাসে উঠতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি স্কুলের ছাত্র এলো এবং স্কুলের বেতন বাবদ মাত্র একটা টাকা সাহায্য চাইলো যাতে তার নাম কাটা না যায় এবং সে প্রমোশন পায়। বাবা মানিব্যাগ খুলে দেখালেন তাঁর কাছে একটা পয়সাও নেই। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর অফিসের কয়েকটি ছোকরা এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট এসে উপস্থিত হোল। নতুন এক অফিসার আসছেন দু'এক দিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে এবং তাঁর সম্মানার্থে এক ভোজ হবে আর তার জন্য চাঁদা তুলতে তারা লিস্ট নিয়ে বেরিয়েছে। ভদ্রলোক তো খুব উৎফুল্ল হোলেন ব্যাপারটা শুনে এবং বললেন যে খুব ঘটা করেই এটা করতে হবে যাতে নতুন অফিসারটি খুশী হন। তিনি ভোজসভায় ভাষণও দিতে চাইলেন। তারপর দেরাজ খুলে তিনি কুড়ি টাকা চাঁদা দিলেন।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে কৃষ্ণের অবস্থা তো সঙ্গীন ! সে বাবাকে বললে কেন তিনি ঐ ছেলেটিকে মিথ্যে কথা বললেন এবং কেন তিনি নিজে যা বলেন, তার বিপরীত কাজ করেন। বাবা রেগেমেগে বললেন "তবে কি কথা অনুযায়ী কাজ করতে হবে ?" আর দেরী না করে সেই মুহূর্তে স্কুলে যাবার জন্য ছেলেকে ধমকে দিলেন।

এবার দৃশ্য বদল। স্কুল। কৃষ্ণ ক্লাসে ঢুকছে। মাস্টারমশাই খুব ব্যস্ত, কারণ পরের দিন ইন্সপেক্টার আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে। এই উপলক্ষে তিনি ছাত্রদের খুব যত্ন করে পড়া তৈরি করালেন। বললেন যে ইন্সপেক্টার যদি জিজ্ঞেস করেন যে, কতগুলো পড়া শেষ হয়েছে, তখন ছাত্ররা যেন বলে ২২টা। যদিও আসলে সংখ্যা হওয়া উচিত ২৩। ২৩ নম্বর পড়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, যিনি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলেননি। ইন্সপেক্টার এলে উনি নিজেই এই গল্প পড়াবেন। তিনি ছেলেদের অনেকবার করে এই পড়াটা মুখস্থ করালেন যাতে তারা পরদিন চটপট উত্তর দিতে পারে। আবার এদের ধমকও দিলেন যদি কেউ ফাঁস করে দেয় যে এটা আগেই পড়া হয়ে গেছে

তবে তার কপালে অনেক দুঃখ আছে। তিনি বললেন, "এমন ভাব দেখাবে যে এই প্রথম এটা পড়ানো হচ্ছে।" ক্লাস শেষ হলে সবাই চলে গেল। শুধু কৃষ্ণ বসে আছে। ইতিপূর্বেই তার মা আর বাবাকে যে প্রশ্ন সে করেছিল, সেই একই প্রশ্ন পুনরায় সে তার শিক্ষককে করলো "আপনারা যেরকম উপদেশ দেন সেইরকম কাজ করেন না কেন? রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যবাদিতার বিষয়ে আমাদের শেখানোর কি অর্থ হয় যদি আপনি নিজেই সেই পথ অনুসরণ না করেন?" পূর্বের ন্যায় একই উত্তর এলো "তুমি কি বলতে চাও যে উপদেশ-প্রদানকারীকে উপদেশ মেনে চলতে হবে?"

উদাস মনে কৃষ্ণ খালি ভাবছে—এত ভণ্ডামী, চারিদিকে কি শুধুই ভণ্ডামী?

পরবর্তী দৃশ্য—কৃষ্ণের বাড়ী।

পরদিন স্কুলে যাবার সময় হয়েছে—কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই স্কুলে যাবে না। বইখাতা সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলছে যে স্কুলে যাওয়া মানে সময়ের অপব্যয় এবং সে স্থির করেছে যে আর কোনদিন স্কুলে যাবে না। হতবুদ্ধি পিতামাতার ডাকে স্কুলের মাস্টার ছুটে এলেন। কৃষ্ণ তখন বলছে—"মা, বাবা বা শিক্ষক হিসেবে তোমরা যা শেখাও তা যদি শুধু কথার কথা হয়, এবং কাজের বেলায় সেগুলো পালন করা না হয় তবে কোন কিছু শেখবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।" এই কথায় এঁদের চোখ খুলে যায় এবং কৃষ্ণকে এঁরা গুরু বলে মানতে শুরু করেন। এঁরা প্রতিজ্ঞা করেন যে, এর পর থেকে কথায় ও কাজে মিল থাকবে এবং সর্বদা সত্যপথ অবলম্বন করে চলবেন।

এই হোল নাটকটির মূল ভাব এবং সাই বাবা যখন এটি রচনা করেন, তখন তার বয়স মাত্র বারো বছর। এর ভেতরে তাঁর দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা এবং যথার্থ শিক্ষার জন্য তাঁর উৎসাহের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

কারোর কোন দামী জিনিস হারালে সবাই সত্যের খোঁজ করতো, কারণ তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জিনিসটি কোথায় আছে বলে দিতে পারতেন। সাই বাবা বলেন যে ঐ সময়ে তিনি অপহরণকারীর নামের প্রথম ও শেষ অক্ষর বন্ধুদের কাছে বলতেন এবং এই সূত্র ধরেই তারা অপহৃত জিনিস ফিরে পেতো। একবার এক শিক্ষকের দামী কলম হারিয়ে যায়। সত্যকে উনি ধরলেন যে, চোরের সন্ধান দিতে হবে। সত্য একটি চাকরের নাম বললেন, কিন্তু শিক্ষকটি

মানতে চাইলেন না, কারণ তিনি চাকরটিকে খুব সৎ ও বিশ্বাসী বলে জানতেন। তাছাড়া চাকরটির ঘর খুঁজেও কলম পাওয়া গেল না। সত্য তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বললেন যে, চাকরটির ছেলে অনন্তপুরে থেকে পড়াশুনা করে— তার কাছে কলম পাচার করা হয়েছে। এই ঘটনা তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন বললেন। চাকরটি নিরক্ষর বলে অন্যকে দিয়ে চিঠিপত্র লেখাতো। সত্য ঐ ছেলেটিকে এমনভাবে একটি চিঠি লিখিয়ে পাঠালেন যেন তার বাবাই তাকে লিখছে। প্রাথমিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর জানতে চাওয়া হোল বাবার দেওয়া কলম দিয়ে কেমন লেখা হচ্ছে। উপদেশ দেওয়া হোল কলমটি দামী, সাবধানে যেন ব্যবহার করে, যাতে চুরি না যায় সেদিকে যেন খেয়াল রাখে। ঐ সাথে নিজের ঠিকানা দিয়ে একটি টিকিটযুক্ত খামও পাঠানো হোল। দিন চারেকের মধ্যেই শিক্ষকের কাছে উত্তর এসে হাজির। ছেলেটি লিখেছে, বাবার কাছ থেকে দামী কলম উপহার পেয়ে সে খুবই খুশী, কলম দিয়ে চমৎকার লেখা হচ্ছে এবং সে খুব যত্ন করে কলমটি রাখবে। সত্যের অলৌকিক ক্ষমতার জয়জয়কার হোল। সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানালে। এই সময় এক ঘটনায় সত্য উরভকোণ্ডার সাধারণ লোকের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করেন। শিরডির সাই বাবার জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। একজন মুসলমানের একটি ঘোড়া হারিয়ে যায় বা চুরি যায়। লোকজন বা মালপত্র বহন করার জন্য তার একটি ঘোড়ার গাড়ী ছিল এবং এইটিই তার উপার্জনের একমাত্র সহায়। সে পাগলের মত ঘোড়ার খোঁজ করতে শুরু করলো। কিন্তু আশপাশের সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঘোড়াটির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে এক ব্যক্তির কাছে সত্যের কথা শুনে ছুটে আসে এবং সে সত্যের কাছে তার দুঃখের কথা জানায়। সত্য তখনি তাকে শহর থেকে দেড় মাইল দূরে এক ঝোপের কাছে যেতে বললেন। সেখানে গিয়ে দেখা গেল ঘোড়াটি মহানন্দে নিশ্চিন্ত মনে চরে বেড়াচ্ছে। এই ঘটনার পর মুসলমান সমাজে সত্য বিস্ময়কর বালক বলে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। ঘোড়ার গাড়ীর চালকেরা স্কুল থেকে আসা যাওয়ার পথে সত্যকে দেখতে পেলেই গাড়ীতে তুলে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতো। ওরা মনে করতো গাড়ীতে সত্য উঠলে ওদের মঙ্গল হবে।

মাত্র তের বছরের বালকের কৃশ দেহের ভেতর লুকোনো প্রচণ্ড ঐশ্বরিক শক্তির সামান্য পরিচয় বহন করে, এই ধরনের ঘটনা একটার পর একটা ঘটতে লাগলো।

১৯৪০ এর ৮ই মার্চ। সন্ধ্যে সাতটা। সত্য তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চেপে ধরে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলেন। বিরাট এক কালো রংয়ের কাঁকড়াবিছে দংশন করেছে। এই দুর্ঘটনায় সমগ্র শহর ব্যথায় মুহ্যমান। কাঁকড়াবিছে বা সাপ খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু 'অজ্ঞান' অবস্থায় পড়ে রইলেন। দেহ শক্ত কাঠ হয়ে গেল। বাক্‌শক্তি লোপ পেল। শ্বাস চলাচল ক্ষীণ হয়ে এল।

এই ধরনের ঘটনা এখন ঘটলে ভক্তরা শঙ্কিত হয় না। সাই বাবা যে স্থূল দেহ ছেড়ে সূক্ষ্ম দেহে অন্যত্র গমন করেন এ ব্যাপারে তারা এখন অভ্যস্ত।

কিন্তু ঐ সময় এইসব দৈব ব্যাপারের কারণ অজ্ঞাত ছিল বলে তাঁর ভাই শেষাম্মা এবং অন্যেরা ঘাবড়ে গেলেন।

উরভকোণ্ডা এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকজনদের মনে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে ঐ এলাকার সাপ বা কাঁকড়াবিছে দংশন করলে কেউ প্রাণে বাঁচে না। প্রধানত যে অজস্র ফণাবিশিষ্ট 'সর্পপ্রস্তর' থেকে এ জায়গার নামকরণ হয়েছে তারই প্রভাবে এই কুসংস্কার জন্মেছে, কারণ পাথরটিকে দেখলে সত্যিসত্যিই মনে হয় যেন একটি সাপ ছোবল দেবার জন্য ফণা তুলে আছে।

শেষাম্মা এক ডাক্তারকে ডাকলেন। তিনি এসে ইন্‌জেকসন দিলেন এবং কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করে গেলেন। সারারাত সত্য 'অজ্ঞান' হয়ে আছেন। রাত্রে এক ঘটনায় বোঝা গেল সত্য 'অচেতন' তো হননি বরং তিনি 'অতিচেতন' অবস্থায় রয়েছেন। বালকের এই অবস্থা কোন দুষ্ট আত্মার প্রভাবের ফল মনে করে একজন প্রস্তাব করলেন যে পাহাড়ের গুহায় মুথ্যালাম্মা নামে যে ভূত বাস করে তাকে তুষ্ট করা হোক। ছেলের দল ছুটলো সেখানে, মই-এর সাহায্যে নামলো সেই মন্দিরের অতি পবিত্র অভ্যন্তরে। ফুল দিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে, নারকেল ভেঙে, পুজো দিলো। তারা যখন এইসব করতে ব্যস্ত, তখন সত্য বস্তুতপক্ষে অচেতন অবস্থাতেই বলে উঠলেন, "নারকেলটি ভেঙে তিন

টুকরো হয়েছে।" আর ছেলেরা ফিরেও এলো প্রথামত নারকেলের দুটুকরোর বদলে তিন টুকরো নিয়ে।

পরের দিন সকালে ডাক্তার এসে দেখে বললেন—বিপদ কেটে গেছে। দুই একদিনের মধ্যেই সত্য সুস্থ হয়ে উঠলেন আর এরপর থেকেই অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করলেন। এই আচরণ প্রসঙ্গে এক সময় বলা হতো যে, সত্যের দেহে শিরডির সাই বাবা আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেই তাঁর এরকম রূপান্তর হয়েছিল।

এইকথা কোনমতেই ঠিক হতে পারে না। সাই বাবা বলেছেন, তিনি স্বয়ং তাঁর স্বরূপ প্রকাশের পথে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কারণ সাধারণ বালকের মত ভাইবোন, সহপাঠী এবং অন্যান্য জাগতিক বন্ধনের সঙ্গে খেলা করতে করতে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন এবং আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। এই ঘটনা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কোনরকম বিষ বা বিষময় স্থূল জগৎ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না।

শেষাম্মা, পুট্টাপর্তীতে মা বাবার কাছে উরভকোণ্ডার ঘটানাবলীর বিবরণ জানিয়ে লিখলেন—সত্য কারুর সঙ্গে কথা ব'লছে না, তাকে খাওয়ানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, অধিকাংশ সময় সে নীরব থাকে, মাঝে মাঝে কবিতা বলে বা গান গেয়ে ওঠে বা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায়, বা প্রাচীন ভারতের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। কিন্তু নানাপ্রকার রহস্যময় বাধার দরুণ মা বাবা সাতদিনের আগে আসতে পারলেন না। শেষাম্মার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেল। পুট্টাপর্তীতে লোক পাঠিয়ে খবর দেবার ব্যবস্থা করা হলো। লোকটি সাইকেলে করে প্রথমে অনন্তপুর যাবে; সেখান থেকে বুক্কাপট্টনম্ হ'য়ে শেষে পুট্টাপর্তী। শেষাম্মা যখন তাকে পথনির্দেশ দিচ্ছিলেন, তখন সত্য বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "এখন আর লোক পাঠানোর প্রয়োজন নেই। মা-বাবা আধঘণ্টার মধ্যেই এখানে আসছেন।" আর বাস্তবিকই, ঠিক আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা এসে পৌছলেন।

সত্যের হঠাৎ গান গেয়ে ওঠা, কথা বলা এবং অস্বাভাবিক আচরণ দেখে মা-বাবার মনেও ভয় সংক্রমিত হলো। মাঝে-মাঝেই তাঁর দেহ শক্ত হ'য়ে যাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিল তিনি যেন দেহ ছেড়ে অন্যত্র গমন করেছেন। এমন রহস্যাচ্ছন্ন সব ব্যাপার।

একদিন সত্য শুয়ে আছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে একেবারেই বাহ্য জ্ঞানহীন। হঠাৎ, তিনি মা বাবাকে বললেন, "প্রতিবেশী এক কথকঠাকুর ভুলভাবে পুরাণ পাঠ করছেন এবং ভুল ব্যাখ্যা করছেন। তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।"

কথকঠাকুর তো কিছুতেই আসবেন না। তিনি বললেন, "এই বালক পবিত্র পুরাণ গ্রন্থের কি বোঝে? আর আমি ঠিক বলছি কি ভুল বলছি— তারই বা কতটুকু জানে? আচ্ছা, বলতো, ছেলেটা শুনতে পেলো কি করে যাই হোক, ওকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলো।" এই বলে কথকঠাকুর পুনরায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুরু করলেন। কিন্তু সত্য নাছোড়বান্দা। অবশেষে মা বাবা কথকঠাকুরকে বোঝালেন, "অনুগ্রহ ক'রে একটু এসে পুত্রকে বিনয়শিক্ষা দিয়ে যান। ইদানিং তাকে সামলানো দায় হয়েছে।" এই কথায় মা-বাবাকে খুশী ক'রতে কথকঠাকুর এলেন।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিটি এসে উপস্থিত হ'লে সত্য তাকে পুরাণের ঐ অংশ পুনরায় ব্যাখ্যা করতে বললেন এবং কোথায় তার ভুল হয়েছে দেখিয়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে ঐ পুরাণের ওপর একটার পর একটা প্রশ্ন ক'রে গেলেন। কথকঠাকুর তো বিস্ময়ে অভিভূত! শেষপর্যন্ত তিনি সত্যের চরণে পতিত হ'য়ে তাঁর কথা অমান্য করবার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করলেন।

অনন্তপুর জেলার মেডিকেল অফিসার ঐ সময় উরভকোণ্ডায় অবস্থান করছিলেন বলে চিকিৎসক তাঁর পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন যে এটা ফিটজাতীয় ব্যারাম, একধরণের হিষ্টিরিয়া এবং এর সঙ্গে বৃশ্চিকদংশনের কোন সম্বন্ধ নেই। তিনিও নিজের বিবেচনামত কিছু ওষুধপত্র খেতে দিলেন। তিনদিন কঠোরভাবে এই ব্যবস্থা মানা হলো। কিন্তু সেই হাসি, কান্না, অনর্গল বকা, আবার নীরব হ'য়ে যাওয়া—এসব লক্ষণ আগে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। সত্য ভজন করেন, ঈশ্বরের কথা বলেন, এমন সব তীর্থস্থানের বর্ণনা দেন যেখানে পূর্বে কেউ যায়নি, তিনি বলেন যে জীবনটা একটা নাটক। জ্যোতিষীরা এসে বললো ভূতে ভর করেছে। সেই ভূতটা নাকি ঐ বাড়ীর বহুদিনের বাসিন্দা—সেই নাকি প্রথম ভাড়াটে। এরা শেষাম্মাকে বাড়ী নির্বাচনে অসতর্কতার জন্য ভৎর্সনা করলেন। যাদুকররা এর কারণ হিসেবে

বললেন যে আচম্‌কা ভয় পেয়ে স্নায়ুবিকার হয়েছে। পুরোহিত এসে মন্দিরে পূজা দিয়ে মানত করতে শেষাম্মাকে পরামর্শ দিলেন। বিজ্ঞলোকেরা এসে মাথা নাড়লেন আর ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন যে ঈশ্বরের লীলা বোঝা বড় শক্ত।

শেষাম্মাকে সবাই সমবেদনা জানায় তার ভাইয়ের এই রোগের জন্য। প্রত্যেকেই বলে, এই রোগ সারাবার বিশেষ ওষুধ সে জানে। অবশেষে শেষাম্মা ওঝাকে ডাকলেন। ওঝাকে দেখেই সত্য তার মুখের ওপর বলে উঠলেন, "এই যে এসো। তুমি তো প্রতিদিনই আমার পূজো করো। আজ যখন এখানে এসেছো তখন তোমার একমাত্র কাজ হ'লো আমার পূজো শেষ ক'রে সরে পড়া।" এদিকে ওঝাটির মনে হ'লো সে যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে তার নিজের ইষ্টদেবতাই সত্যের মুখ দিয়ে এই কথাগুলি বলছেন। সে পারিশ্রমিক নেবার কথা ভুলে গিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলো। যাবার পূর্বে ছোট ভাই-এর সাথে সশ্রদ্ধ আচরণ করতে সে শেষাম্মাকে বলে গেল, কারণ সত্যের সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাকে মোটেই ভূতে পায়নি।

মা-বাবা খুবই ভেঙ্গে পড়লেন। সত্যকে পুট্টাপর্তী এনে তার আচরণ দেখে তাঁদের আশঙ্কা আরো বেড়ে গেল। কখনো চুপচাপ রয়েছেন, কখনো গান গেয়ে উঠছেন, কখনো বা শাস্ত্রোপদেশ দিচ্ছেন—এর দ্বারা সত্য নিজেই তাঁদের মনের ভাবান্তর তীব্র ক'রে তুলছিলেন। হঠাৎ বোনকে বলে উঠলেন, "দেবতারা আকাশপথে যাচ্ছেন, এসো, আরতি করো।" কখনও বলছেন, স্কুলের পড়াশোনার খুবই ক্ষতি হলো—বলবার পরই শিক্ষার মূল্যের ওপর তৎক্ষণাৎ গান রচনা করে গাইতে লাগলেন অথবা ধূর্ত মহাজনরা অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের কিভাবে ঠকায় এ বিষয়ে গান রচনা করে গাইতে লাগলেন।

উরভকোণ্ডা থেকে আসার সময় তাঁরা বেলারী এবং ধর্মাভরমে দুজন চিকিৎসককে দিয়ে সত্যকে দেখিয়েছিলেন। দেহের চিকিৎসা নিয়ে যাদের কারবার তারা কি করে সত্যের রোগনির্ণয় করবে? তাদের স্টেথোস্কোপের সাহায্যে দেবতার হৃৎস্পন্দন বোঝা অসম্ভব। এর দ্বারা আত্মার রহস্যও জানা যায় না। বিশেষ ক'রে যিনি জাগতিক বন্ধন অতিক্রম করতে সংকল্পবদ্ধ, সেই মহামানবের ক্ষেত্রে তো একেবারেই সম্ভব নয়। এর আগে সত্য তাঁর মা-বাবাকে একদিন বলেছিলেন, "তোমরা এত চিন্তা করছো কেন? তোমরা এখানে

থেকে চলে গেলে কোন ডাক্তারকেই আর ডাকা হবে না। ডাকা হ'লেও সে আমাকে সারাতে পারবে না।"

গ্রামে অসুখ-বিসুখ হ'লে প্রথমেই লোকে আশঙ্কা করে যে হয় কেউ তুকতাক করেছে বা কোন অপদেবতা ভর করেছে। তাই পুট্টাপর্তীতেও দুজন ওঝাকে ডাকা হ'লো। ওঝা এসে প্রয়োজনীয় উপকরণের এক ফর্দ তৈরী করলো। অপদেবতাকে আহ্বান করবার জন্য এবং এর ভয়ানক চিহ্ন একটি মেষশাবক বা মুরগীর ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য এই জিনিষগুলি দরকার। ওঝা যখন ঘরে বসে ফর্দ তৈরী করছে, ওদিক থেকে সত্য হাসতে হাসতে তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন কয়েকটি পদ সে ভুলে গেছে। ওদের অজ্ঞতা আর কুসংস্কারজনিত ক্রিয়াকলাপের যাবতীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে যেন বদ্ধপরিকর— সবকিছুই তাঁর কাছে মজার ব্যাপার, লীলা।

কাদিরির কাছে ব্রাহ্মণপল্লী গ্রামের ভয়ঙ্কর চিকিৎসা ঐ চোদ্দ বছরের বালক কি করে সহ্য করেছিল তা বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সহ্যশক্তির এ এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

উদ্বিগ্ন পিতামাতার কাছে একজন এসে এক শক্তিশালী ওঝার সন্ধান দিলেন। কোনো অপদেবতার সাহস নেই তার সামনে কোনরকম কেরামতি দেখায়! ওরা ঘোষণা করলো যে সে সত্যকে পুরোপুরি সারিয়ে দেবে আর সত্যও সুস্থ হয়ে স্কুলে যেতে পারবেন। যাত্রার জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু বলদ দুটি কিছুতেই নড়তে চাইলো না। পথেও নানারকম বাধা এলো, অসুখ হলো। এইভাবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে 'রোগী'কে সেই ওস্তাদ রোজার হাতে সমর্পণ করা হলো।

লোকটিকে দেখতে দৈত্যের মতন, ভয়ঙ্কর, চোখ দুটি রক্তবর্ণ, আর ব্যবহার অত্যন্ত অমার্জিত। সে প্রেতবিদ্যার সবকিছুই খাটাতে চেষ্টা করলো। প্রথমে একটি মোরগ বলি দিল, তারপর একটি মেষশাবক। রক্তের এক বৃত্ত বানিয়ে, তার ঠিক মাঝখানে সত্যকে বসিয়ে তার জানা সব মন্ত্র সে আউড়ে গেল। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সত্য তো মুচকি মুচকি হাসছেন। লোকটি মনে ক'রছে রোগীকে তার হাতে ছাড়া হয়েছে; সুতরাং তার এবং বালকের শক্তির লড়াইয়ে একটা কিছু না ক'রে সে মা-বাবার হাতে সত্যকে ছেড়ে দেবে না।

এইবার সে এমন সব বীভৎস পদ্ধতি প্রয়োগ করলো যা সে পূর্বে কখনো বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা ক'রতে সাহসী হয়নি। যেমন, সত্যের মাথা কামিয়ে মাথার চামড়ার ওপর ব্রহ্মতালু থেকে কপাল পর্যন্ত এক তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে চিরে 'x' চিহ্ন আঁকলো। ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। এ সত্ত্বেও সত্য বিন্দুমাত্র কাতর হলেন না। এরপর ঐ রক্তাক্ত ক্ষতের ওপর লেবু, রসুন এবং অন্যান্য টক ফলের রস ঢেলে দেওয়া হলো। মা-বাবা এতক্ষণ ধরে এইসব নিষ্ঠুর চিকিৎসা অসহায়ের মত দেখছিলেন। সত্যের চোখে এক ফোঁটা জল নেই, অসহ্য যন্ত্রণাতেও তাঁর মুখে মৃদু হাসি। এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে মা-বাবাও ভীষণ অবাক হলেন। এদিকে সেই পাষণ্ড অত্যাচারী পদে পদে বিফল হওয়ায় প্রচণ্ড ক্ষেপে গেছে। সে আদেশ দিল প্রতিদিন ভোরবেলা ১০৮ বালতি ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢালতে হবে। তাও করা হলো। তার বিদ্যে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, কিন্তু বালকের দেহে যে অপদেবতার ভর হয়েছে তাকে কিছুতেই কাবু করা গেল না। সেই অপদেবতা তো চীৎকার ক'রে বলে উঠলো না যে সে এই দেহ ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। সত্য যখন এক জায়গায় থাকে তখন তার নাকি 'পাথুরে জ্বর' হয় আর চলাফেরা ক'রলে 'হরিণ জ্বর'—এই জ্বর তাড়াবার জন্যে লোকটি তখন মরিয়া হয়ে একটা মোটা লাঠি দিয়ে সত্যের দেহের প্রতিটি সন্ধিস্থলে অমানুষিক প্রহার চালালো।

এইবার চূড়ান্ত চিকিৎসা হিসেবে, সে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক চিকিৎসা পদ্ধতি—'কালিকম্'—প্রয়োগ করবে স্থির করলো। এই চিকিৎসা বাঘা অপদেবতাও সহ্য ক'রতে পারে না। এ হলো মন্ত্রপূত এক কাজল। এইসব ওঝাদের জানা বিষাক্ত এবং জ্বালাকর যতরকম পদার্থ আছে সব মিশিয়ে আগুনে কাজল তৈরী হয়েছে যাতে করে নির্যাতন চরমে ওঠানো যায়। এই কাজল সত্যের চোখে লাগানো হলো। মা-বাবা পরিণাম ভেবে আতঙ্কে শিউড়ে উঠলেন। সত্যের মাথা এবং মুখ লাল হয়ে এমন সাংঘাতিকভাবে ফুলে গেল যে তাঁকে চেনার কোন উপায় ছিল না। সত্যের ভগ্নী ভেঙ্কাম্মার কথা অনুসারে সত্যের কাছাকাছি যারা ছিল তাদের ভেতরেও এই উগ্র ঝাঁঝালো ওষুধের তীব্র জ্বলুনী সংক্রমিত হয়েছিলো। সত্যের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, তাঁর সমগ্র শরীর যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে। ওঝার আনন্দ

আর ধরে না, এইবার অপদেবতা নির্ঘাত বিদায় নেবে, সাফল্য মুঠোয়। সত্য নির্বাক, নিস্পন্দ। যারা ভীড় করে দাঁড়িয়ে এই অমানুষিক নির্যাতন অসহায়ের মত দেখছিল তারা সবাই—বিশেষ ক'রে সত্যের মা-বাবা ও বোনেরা নিজেদের অপরাধী মনে ক'রতে লাগলো। তীব্র মনোবেদনায় তাঁদের দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, বাধা মানতে চাইছে না। ওঝা কাউকে সত্যের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না বলে তাঁরা ওঝার অলক্ষ্যে সত্যকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। এরই মধ্যে ইসারা ক'রে সত্য তাঁদের শান্ত থাকতে বলছেন। সত্য কোনরকমে আভাসে ইঙ্গিতে তাঁদের বোঝালেন যে, এই ঘর থেকে কোন এক ছুতো ক'রে তিনি বেড়িয়ে আসবেন, ওঁরা যেন তাঁর জন্য প্রস্তুত হয়ে বাইরে অপেক্ষা করেন। বাইরে বেড়িয়ে এসে তিনি যন্ত্রণানিবারক এক ওষুধের নাম বললে সেই ওষুধ আনা হ'লো এবং তাঁর চোখে লাগানো হলো। যে চোখদুটি ভীষণভাবে ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল, আবার তা স্বাভাবিক হ'য়ে গেল এবং ফোলাও কমে গেল।

তিনি পরে বলেছিলেন, "এতটুকু এক বালক যে কি করে ভয়ঙ্কর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অক্ষতভাবে, অসীম সহনশীলতা দেখিয়ে এবং অলৌকিক উপায়ে বেরিয়ে এল—এসব দেখেও কি এখনো তোমাদের বিশ্বাস হ'লো না আমি সাই বাবা। আমি যদি তোমাদের প্রস্তুত না করেই হঠাৎ একদিন একথা ঘোষণা করতাম তাহলে তোমরা কিভাবে একে গ্রহণ করতে? আমি তোমাদের জানাতে চাইছিলাম যে আমি দিব্যস্বরূপ, দুঃখ, যন্ত্রণা বা আনন্দ সবই আমার কাছে সমান।"

চিকিৎসায় বাধা পড়াতে ওঝাতো ক্ষেপে আগুন! মুখ থেকে শিকার ফসকে যাওয়ায় সে তো রাগে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে বললো "একটুর জন্যে জিততে দিলে না!" কিন্তু মা-বাবার ভাবনা ছিল অন্যরকম। চিকিৎসার নমুনা দেখে তাঁরা এত আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে সাক্ষাৎ ঐ যমদূতের গ্রাম থেকে তাঁদের প্রিয় ছেলেকে বাঁচাবার উপায় খুঁজছিলেন। ওঝাকে পুরো টাকাকড়ি মিটিয়ে দিলেন, বাড়তি কিছু উপহারও দিলেন তাকে এবং সবশেষে ধন্যবাদ জানালেন তার 'বিদ্যে-বুদ্ধি' প্রয়োগ করার জন্য। তাঁরা ওঝাকে বললেন, "কি আর করা যাবে! আমাদের দুর্ভাগ্য। সত্যকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি

শরীরে একটু বল বাড়াবার জন্য। তারপর আবার তোমার হাতে ছেলেকে দিয়ে যাবো। তোমার চিকিৎসাতেই সে থাকবে।" তাঁরাই জিতলেন এবং ঐ ভয়ানক স্থান থেকে মুক্তি পেয়ে শেষ পর্যন্ত পুট্টাপর্তী গিয়ে পৌছলেন।

সত্য তখনও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেননি। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি যেন অন্য মানুষ। তিনি ভগবানের স্তব করছেন, এমন সব কবিতা আবৃত্তি করছেন যা কোন বালকের পক্ষে জানা সম্ভব না। কখনো তাঁর দেহে দশজন লোকের শক্তি হচ্ছে, কখনো বা তিনি পদ্মবৃন্তের মতো দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পড়ছেন। সদাচার এবং শিষ্টাচার নিয়ে তিনি বয়স্কদের তর্কে পরাজিত করছেন এবং তাদের লজ্জায় ফেলছেন। পরিবারের এক বন্ধু পরামর্শ দিল যে কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে একজন ভালো চিকিৎসক আছেন। এই ধরনের বহু রোগ একরকম সবুজপাতার ওষুধ দিয়ে তিনি সারিয়েছেন।

সত্যকে আবার গরুর গাড়ীতে তোলা হলো এবং গ্রামের পথে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে গাড়ী চললো।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সত্যের খেয়াল হলো তাঁকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলে উঠলেন, "আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি ফিরে যাবো।" এই কথা উচ্চারিত হওয়ামাত্র গরুদুটির চলা বন্ধ হয়ে গেলো। একঘণ্টা ধরে লেজে মোচড় দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তারা আর এক পাও এগোল না। অবশেষে যখন তাদের মুখ বাড়ীর দিকে ফেরানো হলো, অমনি তাদের গলার ঘণ্টা টুং টাং করে বেজে উঠলো আর তারা আবার চলতে শুরু করলো।

পারিবারিক বন্ধু শ্রীকৃষ্ণামাচারিয়া পেনুকোণ্ডায় ওকালতি করেন। তিনি রাজু পরিবারের বিপদের খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন, যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন ভেবে। তিনি সত্যকে গম্ভীরভাবে নিরীক্ষণ করে নদীর ধারে বসে চিন্তা করতে লাগলেন। পরে তিনি ভেঙ্কাপ্পা রাজুকে বললেন, "আমি যা মনে করেছিলাম তার চেয়ে ব্যাপারটা দেখছি অনেক বেশী গুরুতর। ওকে এক্ষুণি নরসিং মন্দিরে নিয়ে যাও। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো।"

সত্য কথাগুলি শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ উকিলটির দিকে ফিরে বললেন, "কি রকম মজার ব্যাপার দেখুন তো। ঐ মন্দিরে আমি তো আগে

থেকেই অবস্থান করছি, আর আপনারা 'আমার' কাছেই 'আমাকে' নিয়ে যেতে চাইছেন!" এই কথা শোনার পর উকিলটির আর জেরা করার সাহস হলো না।

১৯৪০ সালের ২৩শে মে। ১৪ বছর বয়সের বালক সত্য যথারীতি শয্যাত্যাগ করেছেন। কিছু পরে বাড়ীর সবাইকে তিনি তাঁর কাছে ডেকে আনলেন এবং কোথাও কিছু নেই হঠাৎ শূন্য থেকে মিছরি আর ফুল সৃষ্টি করে তাদের হাতে উপহার দিলেন। এই অভিনব ঘটনার খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটতে ছুটতে এলো। তিনি তাদের প্রত্যেককে একটা করে পিঠে, কিছু ফুল আর মিছরি দিলেন। সব জিনিসই শূন্যে হাত ঘুরিয়ে সৃষ্টি করা। সত্যের এই প্রাণোচ্ছল ভাব দেখে সবাই ভেঙ্কাপ্পা রাজুকে ডাকতে গেলো—যাতে তিনিও এসে তাঁর এই হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে যান। ভেঙ্কাপ্পা রাজু ছুটে এলেন, ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে 'বরপ্রদাতা' সত্যের কাছে যাবার পূর্বে হাত পা মুখ ধুয়ে শুদ্ধ হতে বললো। এই কথায় ভেঙ্কাপ্পা রাজু রেগে গেলেন। এসব ব্যাপার তাঁর মনে কোনরকম দাগ কাটেনি। তাঁর ধারণা সত্য কোন গোপন জায়গা থেকে হাতসাফাই করে জিনিসগুলি এনে তাদের ঠকাচ্ছেন। বহুবছর পরে তিনি গ্রন্থকারের কাছে এই কথা প্রকাশ করেন। তিনি মনে মনে কামনা করছিলেন, তাঁদের সংসারের এই বিপদের পর্ব যেন এইখানেই শেষ হয়—আর বেশীদূর গিয়ে কোনো মর্মান্তিক ঘটনায় যেন না পৌছয়। করুণ হাসি হেসে সবাইকে শুনিয়েই তিনি ছেলেকে বললেন, "অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এসব এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে।" হাতে একটা লাঠি নিয়ে তিনি সত্যের দিকে তেড়ে গেলেন এবং মারতে উদ্যত হয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে চললেন, "তুই কে? ভগবান, না ভূত, না উন্মাদ? আমাকে বলতেই হবে।" যে ঘোষণা এতদিন ধরে করা হয়নি, সত্যের উত্তর তৎক্ষণা বেড়িয়ে এলো সেই বিখ্যাত ঘোষণার আকারে—"আমি সাই বাবা।"

এরপরে আর যুক্তিতর্ক চলে না। ভেঙ্কাপ্পা রাজু নিশ্চুপ হয়ে গেলেন, তাঁর হাত থেকে লাঠি পড়ে গেলো। তিনি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, একভাবে, পলকহীন চোখে সত্যকে দেখছেন। "আমি সাই বাবা"—কথাটি

তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সত্য বলে চলেছেন—"আমি আপস্তম্ব সূত্রসম্ভূত এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয়। আমি সাই বাবা। আমি এসেছি তোমাদের সব দুঃখ বেদনার অবসান ক'রতে। তোমাদের বাড়ী-ঘর পরিষ্কার এবং পবিত্র করে রাখবে।" সেদিন বিকেলে তিনি বারবার 'সাই বাবা' কথা দুটি উচ্চারণ করলেন। দাদা শেষাম্মা তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "'সাই'বাবা" বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?" তিনি একথার সোজাসুজি জবাব না দিয়ে শুধু বললেন, "তোমাদের পূর্বপুরুষ ভেঙ্কাবধূত প্রার্থনা করেছিলেন যে আমি যেন তোমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করি। তাই আমি এসেছি।"

এই ভেঙ্কাবধূত কে ছিলেন? শেষাম্মাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি গ্রন্থকারকে বলেছিলেন যে বহুবছর পূর্বে তাঁহাদের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ঋষি ছিলেন এবং আশপাশের গ্রামের হাজার হাজার মানুষ তাঁকে গুরু জ্ঞানে ভক্তি ক'রতো।

'সাইবাবা' নামটি গ্রামবাসীদের মনে ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রলো। খোঁজখবর নিয়ে তারা জানতে পারলো যে শিরডির সাইবাবা নামে এক মুসলমান ফকিরের পরমভক্ত এক সরকারী কর্মচারী পেনুকোণ্ডাতে কিছুকাল পূর্বে এসেছেন। এঁদের ইচ্ছে যে সত্যকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ তিনি শিরডির সাইবাবা সম্পর্কে অনেককিছু জানেন। সত্যের রোগের কারণ এবং নিরাময়ের পথও তিনি নিশ্চিত বলে দিতে পারবেন। তিনি বালককে দেখতে রাজি হলেন কিন্তু রোগের ইতিবৃত্ত জানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, "ছেলেটির পরিষ্কার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।" তিনি পরামর্শ দিলেন কোন উন্মাদাশ্রমে যেন তাঁকে ভর্তি করা হয়। সত্য বাধাদান করে বলে উঠলেন —"ঠিক কথা মস্তিষ্ক বিকৃতিই বটে—কিন্তু কার? তুমি এমন অন্ধ। যে সাইএর তুমি উপাসনা করো তাঁকেই তুমি চিনতে পারছো না।" এই কথা বলে তিনি শূন্য থেকে মুঠো মুঠো বিভূতি সৃষ্টি করে ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন।

পিতার ধারণা হলো শিরডির সাইবাবাই তাঁর পুত্রের ভেতর থেকে কথা বলছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"তোমাকে নিয়ে এখন আমাদের কি করা কর্তব্য?" সত্য উত্তরে বললেন—"আমাকে পূজো করো।" কখন?—"প্রত্যেক বৃহস্পতিবার। তোমাদের মন এবং গৃহ পবিত্র রাখবে।"

পরে, এক বৃহস্পতিবারে, এক ব্যক্তি সত্যকে চ্যালেঞ্জ করে বললো, "তুমি সত্যিই সাইবাবা তা এখনই আমাদের কাছে প্রমাণ করে দেখাও।" বাবা বললেন, "হ্যাঁ, দেখাবো বই কি।" সবাই তাঁর কাছে সরে এলো। তিনি আদেশের স্বরে বললেন, "ঐ যুঁইফুলগুলো আমার হাতে তুলে দাও তো?" ফুলগুলি বাবার হাতে দেওয়া হলো। নিমেষের মধ্যে সব ফুল মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তিনি বললেন, "নাও, তাকিয়ে দেখ।" তারা সবিস্ময়ে দেখলো, মেঝের ওপর সেই ফুলগুলো দিয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তেলেগু ভাষায় 'সাইবাবা' কথাটি লেখা রয়েছে।

এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নতুন সত্যসাই যুগকে গ্রহণ করার জন্য তিনি একটু একটু করে জনসাধারণকে প্রস্তুত করছিলেন। ওঝার হাতের সেই অমানুষিক নির্যাতন শান্ত নির্বিকার চিত্তে সহ্য করায়, সবাই বুঝে গিয়েছিলো যে তিনি সাধারণ কোন বালক নন, কোন উচ্চতর শক্তি তাঁর ভেতরে রয়েছে। সঙ্গীতে, নৃত্যে, সুরসৃষ্টিতে এবং কবিতা রচনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর দিব্যদ্যুতি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণ এবং চরমতম নির্যাতনেও অবিচল থাকার অনেক ঘটনা তিনি প্রদর্শন করেছেন। এইবার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সমগ্র জগতের কাছে তাঁর প্রকৃত সত্তার কথা ঘোষণা করবেন।

এদিকে শেষাম্মা আশা করে বসে আছেন যে এইসব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সত্যকে দিয়ে হাই স্কুল কোর্স শেষ করাবেন। জুনমাসে তিনি সত্যকে উরভকোণ্ডার স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। সত্যের 'পাগল' হয়ে যাওয়া আর তাঁকে 'সারাবার' জন্য মা-বাবার আপ্রাণ চেষ্টার কথা এখানকার সবারই জানা। তাই সত্য সবার কাছেই বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেন। তাঁকে বলা হতে লাগলো 'অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, ভবিষ্যদ্বক্তা, রহস্যময় এক বালক।' তাঁর সম্বন্ধে সবার মনে তীব্র কৌতূহল। প্রতি বৃহস্পতিবার বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন ফুল-মিষ্টি হাতে নিয়ে তীর্থযাত্রায় তাঁর কাছে এসে, অনেক রাত অবধি তাঁকে ঘিরে বসে থাকতো। তিনি শেষাম্মাকে দেখিয়ে এদের বলতেন, "ও এসব বিশ্বাস করে না, ওর এখনও জ্ঞানচক্ষু খুলল না।" স্কুলের হেডমাস্টার তাঁর বালক ছাত্রকে নত হয়ে প্রণাম করতেন। এসিস্ট্যান্ট

মাস্টাররাও থাম্মি রাজু ও শেষাআয়েঙ্গার—তাঁর মহিমা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর দিব্যবাণী মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

উরভকোণ্ডায় বৃহস্পতিবার, একটি বিখ্যাত দিন হয়ে উঠলো। সত্য সবাইকে বিস্মিত ক'রে নানারকম জিনিস শূন্য থেকে হাত ঘুরিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন শিরডিসাইবাবার ছবি, তাঁর পরিধেয় গেরুয়া বস্ত্রের অংশ, শিরডি মন্দিরে নিবেদিত খেজুর ফল—এছাড়া ফুল, মিছরি, এবং উধি বা ছাই। একদিন হাই স্কুলের মাস্টাররা দল বেঁধে এলেন তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন বলে। অসংখ্য প্রশ্ন নানাদিক থেকে, এলোপাথারী তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করা হলো। তিনি গুছিয়ে গুছিয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের ক্রম অনুযায়ী উত্তর দিয়ে গেলেন; যে যে শিক্ষক যে যে বিশেষ প্রশ্ন তাঁকে করেছিলেন সেই সেই শিক্ষককে সেই সেই প্রশ্নের উত্তর মন দিয়ে শুনতে বললেন। চটপট এবং নির্ভুল উত্তরদান —শুধুমাত্র তাঁর অসামান্য প্রজ্ঞার পরিচয় হিসেবেও লক্ষ্য করবার মত।

প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী হাম্‌পির ধ্বংসাবশেষ থেকে কয়েক মাইল দূরে হোমপেট শহর। এখানকার ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর, হেল্‌থ্‌-অফিসার, এনজিনিয়র, মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার এবং কিছু বণিক শেষাম্মাকে আমন্ত্রণ জানালেন ঐ শহরে সত্যকে আনবার জন্য। শেষাম্মা ভাবলেন এই ভ্রমণের ফলে যে স্থান এবং পরিবেশের পরিবর্তন হবে তাতে সত্যের নিশ্চয়ই মানসিক উন্নতি হবে। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। এছাড়া সামনের অক্টোবরেই দশেরার ছুটি। তিনি মত দিলেন।

যাত্রাপথে তাঁরা দলবল নিয়ে ধ্বংসনগরী হাম্‌পিতে এলেন। সেই বিখ্যাত পথ ধরে তাঁরা হাঁটলেন যে পথে সুদূর অতীতে একসময় প্রাচ্যের সব জাতির নরনারী, মধ্যপ্রাচ্যের এবং ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী অঞ্চলের পরিব্রাজক এবং বণিকের দল তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে গেছে। তারা ঘুরে ঘুরে হাতীশালা, রাণীর প্রাসাদ, অভিষেক মঞ্চ, এবং বিঠ্যলনাথ মন্দির দেখলেন। তারপর পাথরের তৈরি এক প্রকাণ্ড রথ দেখতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। অবশেষে ভগবান বিরূপাক্ষের মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দ—এই দীর্ঘ তিনশো বছর ধরে বিজয়নগরের সম্রাটরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক ছিলেন। এদেরই কুলদেবতা হলেন বিরূপাক্ষ।

পরে জানা গেল যে, সারা সকাল ধরে সত্য, যেন স্বপ্নের ঘোরে, ঐ ধ্বংসস্তূপের ভেতরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অথচ তিনি নিজে এ সব কিছুই জানেন না। মন্দিরের সামনে বসে থাকা এক সাধু বললেন, "বিশ্বাস করো, এই বালক দৈবশক্তির অধিকারী। সবাই যখন বিরূপাক্ষ মন্দিরের অভ্যন্তরে গেল, সত্য তাঁদের সঙ্গে থাকলেও, তিনি মন্দিরে পূজা দেবার চাইতে তোরণ-দ্বারের উচ্চতা এবং সৌন্দর্য উপভোগ করতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। তিনি বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। কেউ তাকে দলের সঙ্গে ভেতরে যাবার জন্য জোরও করেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরতি শুরু হলো। পূজারী লিঙ্গবিগ্রহের সামনে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কর্পূরারতি করছেন। কর্পূর-দীপের আলোকে আলোকিত লিঙ্গবিগ্রটি দেখবার জন্য তিনি পুণ্যার্থীদের কাছে ডাকলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তারা বিস্ফারিত চোখে দেখলো লিঙ্গমূর্তিটি সেখানে নেই তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন সত্য। তিনি স্মিত হেসে তাদের প্রণাম গ্রহণ করছেন। দৃশ্যটি এমন রোমাঞ্চকর এবং অপ্রত্যাশিত যে শেষাশ্মার ধারণা হলো হয়তো সত্য সবার দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে এইসব কাণ্ড ঘটিয়েছেন। যাচাই করবার জন্য তিনি তক্ষুণি মন্দিরের বাইরে বেড়িয়ে এলেন, এসে দেখলেন যে, সত্য সুদূর দিগন্তে দৃষ্টি রেখে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

দলের লোকেদের বিস্ময়, বর্ণনার চাইতে কল্পনা করে নেওয়াই সহজ হবে। তাদের মনের অবিশ্বাস কেটে গেছে, তারা নিশ্চিত যে তিনি অবতার, তাই সেদিন বৃহস্পতিবার না হলেও, তারা তাঁর বিশেষ পূজা করলো। হোম্‌পেটের লোকেরা মনে প্রত্যাশা নিয়ে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। তারা শহরে পৌঁছবার বহু পূর্বেই খবর রটে গেছে যে বিরূপাক্ষ বিগ্রহরূপে সত্যকে দেখা গিয়েছে।

পরদিন বৃহস্পতিবারে, সত্য 'সাইবাবা'রূপে, তাঁর স্পর্শদ্বারা একটি যক্ষ্মারোগীকে সারালেন এবং তাকে উঠিয়ে একমাইল হাঁটালেন। শূন্য থেকে নানারকম জিনিস তাঁর ভক্তদের জন্য সৃষ্টি করলেন। লোকের আনন্দ উত্তেজনা উপ্‌ছে পড়তে লাগলো। গভীর রাত অবধি ভজন এবং নাম-সংকীর্তন চললো। কেউ থামতে চায় না।

বালক সাইবাবা যে সংসারবন্ধনে দিন দিন বীতস্পৃহ হয়ে উঠছিলেন- ; এ বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।

কান পেতে মহাকালের ধ্বনি শুনে তিনি বুঝেছিলেন মহাকাল তাঁকে আহ্বান করছে শৃঙ্খলমোচন করে জগতের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করতে। তাই বন্ধনডোর ছিন্ন করবার জন্য তিনি উতলা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য যে সময়সীমা তিনি লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বুঝেছিলেন, সংসার ত্যাগ করে সাইবাবারূপে নিজেকে ঘোষণার মহালগ্ন এসে গেছে।

১৯৪০ সালের ২০শে অক্টোবর—হাম্পি থেকে স্পেশাল বাসে করে ফিরে আসবার পরদিন—সত্য যথারীতি স্কুলে যোগ দিলেন। আবগারী ইন্সপেক্টর শ্রীঅঞ্জনেয়ুলু বাবার পরম অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে স্কুলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে খুবই অনিচ্ছাসহকারে বাড়ী ফিরলেন। কারণ তাঁর যেন মনে হলো তিনি দেখছেন এক অপরূপ জ্যোতির্বলয় বাবার মুখমণ্ডল ঘিরে রয়েছে এবং তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন, কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে বাবাও স্কুল থেকে চলে এলেন। সদর দরজার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি হাতের বই-খাতা সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, "এখন থেকে আমি আর তোমাদের সেই সত্য নই। আমি এখন 'সাই'।" রান্নাঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর মাথার চারদিককার জ্যোতির্বলয়ের তীব্র আলোকচ্ছটায় সত্যের ভ্রাতৃবধূর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দু'হাতে চোখ ঢেকে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। বাবা ভ্রাতৃবধূকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি চললাম। আমি আর তোমাদের কেউ নই। মায়া কেটে গেছে। ভক্তদের আকুল ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি। আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। আমার নিজের কাজ অপেক্ষা করছে।" এই কথা বলে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ভ্রাতৃবধূর কাতর অনুরোধে তিনি কোনরকম কর্ণপাত না করে গৃহ পরিত্যাগ করে এগিয়ে চললেন। খবর শোনামাত্র তাঁর দাদা ছুটে এলেন, কিন্তু সাইবাবা দাদাকেও বললেন, "আমাকে সারিয়ে তোলার সব চেষ্টার কথা ভুলে যাও। আমি সাই। আমি আর নিজেকে সংসারের কেউ বলে মনে করি না।" প্রতিবেশী নারায়ণ

শাস্ত্রী কোলাহল শুনে আঁচ করেছিলেন যে গুরুতর কিছু একটা হয়েছে। তিনি দৌড়ে এলেন এবং জ্যোতির্বলয়ের শোভাদর্শন করামাত্র সাইবাবার চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। এই ব্যক্তিও সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা শুনতে পেয়েছিলেন, "মায়া কেটে গেছে। আমি চললাম। আমার কাজ অপেক্ষা করছে।"

ঘটনার পরিণতি যে এইরকম হবে শেষাম্মা রাজু ভাবতে পারেননি। তাঁর বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাবার মত হ'লো। চিন্তা করে কোন কূলকিনারা খুঁজে পেলেন না। মাত্র চোদ্দ বছরের বালকের মুখে এসব কি গুরুগম্ভীর কথা! ভক্তবৃন্দ! কর্মযোগ! মায়াবাদ! সংসারতত্ত্ব! তিনি আর কিছু চিন্তা করতে পারেন না। তখন তাঁর খেয়াল হলো মা-বাবা তো তাঁর দায়িত্বেই সত্যকে রেখে গেছেন। সুতরাং তাঁর আশু কর্তব্য হ'লো গুরুতর এই ঘটনার কথা অবিলম্বে তাঁদের জানানো আর তাঁরা উরভকোণ্ডায় এসে না পৌছনো পর্যন্ত সত্যকে বাড়ীর ভেতরে আটকে রাখা।

সত্য কিন্তু সেই গৃহত্যাগ করে চলে যাবার পর আর প্রত্যাবর্তন করলেন না। শ্রীঅঞ্জনেয়ুলুর বাড়ীর বাগানে গাছপালা ঘেরা একটি পাথরের বেদীর ওপর তিনি অবস্থান করা শুরু করলেন। নানাপ্রান্ত থেকে ভক্তরা এসে তাঁকে ফলফুল নিবেদন করতে লাগলো। ভক্তেরা মিলিত কণ্ঠে সত্যের শেখানো ভজন গান গেয়ে, বাগানের চারদিক মুখরিত ক'রে তুললো। সেই ঐতিহাসিক দিবসের পবিত্র লগ্নে তিনি সর্বপ্রথম যে প্রার্থনাগীত তাদের শিখিয়েছিলেন তা হ'লো—

"মানস ভজোরে গুরুচরণম্
দুস্তর ভবসাগর তরণম্।"

এইদিনের মধুর স্মৃতি আজও অনেকের মনে গেঁথে আছে।

তাঁর স্কুলের বন্ধুরা মুষড়ে পড়লো। তারা কেঁদে ফেললো যখন শুনলো যে সত্য আর কোনোদিন স্কুলে আসবে না, সত্যকে তারা আর আগের মত ক'রে কাছে পাবে না, কারণ তিনি নাকি শুধু তাঁর ভক্তদের নিয়েই থাকবেন।

ধূপ আর কর্পূর হাতে নিয়ে অগণিত লোক বাগানে এলো তাঁকে পূজো

দিতে। কিছুলোক এলো পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাতে, কিছুলোক এলো অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে, কেউ এলো শিক্ষা লাভ করার ইচ্ছায় আবার কেউ কেউ এলো ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে।

এইভাবে পূজার্চনা ক'রে ঐ বাগানে তিনদিন কাটলো। একব্যক্তি ছবি তুলতে এসে দেখে ক্যামেরার সামনে একটি বড় পাথরে সাইবাবা আড়াল হয়ে যাচ্ছেন। ছবি তুলতে হ'লে পাথরটি সরানো দরকার বলায়, বাবা সে কথায় কোন কান দিলেন না। যাইহোক, পাথরটিকে না সরিয়েই ছবি তোলা হ'লো। পরে প্রিন্ট করে দেখা গেল ঐ পাথরটি সিরডি-সাইবাবার প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হয়েছে। উপস্থিত লোকেদের চোখে সেটা কিন্তু পাথরই রইলো, শুধু ছবির ভেতরে এই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ভজন করতে করতে হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, "এইরে, আবার মায়া আমাকে ধরতে আসছে।" জননী ঈশ্বরাম্মা সবেমাত্র হন্তদন্ত হয়ে পুট্টাপর্তী থেকে ছুটে এসেছেন, তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি এই কথা বললেন। মা-বাবা তাঁকে অনেক করে বোঝালেন বাড়ী ফিরে যাবার জন্য। বাবা উত্তরে বললেন, "কে কার আপনজন?" মা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর স্নেহের পুত্রের কাছে প্রার্থনা জানালেন সংসারে ফিরে আসবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই পুত্রকে সংকল্প থেকে টলাতে পারলেন না। সত্য বারবার একই কথা বলে চললেন—"সবই অসত্য, সবই মায়া।"

শেষকালে মাকে তিনি কিছু খাবার এনে দিতে বললেন। মা খাবার এনে দিলে তিনি সব খাবার মিশিয়ে কয়েকটি দলা তৈরি করলেন। মা তাঁর হাতে তিনটি দলা তুলে দিলে তিনি খেয়ে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এখন আর মায়া কিছু করতে পারবে না। আর চিন্তার কিছু নেই।" এই কথা বলে তিনি পুনরায় বাগানে চলে গেলেন।

এর কয়েকদিন পরেই সাইবাবা উরভকোণ্ডা ত্যাগ করেন। মা-বাবা তাঁকে পুট্টাপর্তি ফিরে যেতে রাজি করালেন এই সর্তে যে তাঁরা আর এর পর থেকে তাঁকে এই ব্যাপার নিয়ে বিদ্রূপ করবেন না বা তাঁর ভক্তেরা দেখা করতে এলে কোনো বাধা দেবেন না। শ্রীঅঞ্জনেয়ুলু বাবার শ্রীপাদপদ্মে পূজা নিবেদন করলেন। সহরের লোকেরা বাবাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে সহরসীমানা

পর্যন্ত গেল। পথের অনেক স্থানে ভজনগানের আয়োজন করা হয়েছিলো এবং তাঁকে আরতি করা হয়েছিলো।

পুট্টাপর্তীতে ফিরে এলে সাইবাবাকে সর্বাগ্রে অভ্যর্থনা জানালেন সুব্বাম্মা নাম্নী ঐ গ্রামের এক একাউন্টেন্টের স্ত্রী। এঁর বাড়ীতেই বাবা প্রথমে উঠলেন। পরে বাবা কিছুদিন বৃদ্ধ পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুর গৃহে এবং তারও পরে ঈশ্বরাম্মার ভাই সুব্বা রাজুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সুব্বাম্মার গৃহে ফিরে এলেন। সুব্বাম্মা প্রেম ও ভক্তিভরে তাঁর সেবা করতেন এবং প্রশস্ত গৃহে ভক্তদের সাদরে আপ্যায়ন জানাতেন। তাঁরা যাতে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারেন, এ ব্যাপারে সুব্বাম্মার চেষ্টার অন্ত ছিল না।

সাইবাবার পুনরাগমন

আপস্তম্ব সূত্রসম্ভূত এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় বলে সাইবাবা নিজেকে যেদিন ঘোষণা ক'রলেন, তার পর থেকে তাঁর "বাল সাই" (বালক সাই) বা "সত্য সাই বাবা" নাম চারিদিকে ছড়িয়ে গেলো। এই নামে তাঁর নিজেরও সম্মতি ছিল। প্রথম প্রথম প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর উপস্থিতিতে ভজন হতো —পরে প্রতিদিনই ভজন হতে লাগলো। এমনকি দিনে দুবার করেও কখনো ভজন হয়েছে। কারণ পূজা নিবেদন করবার জন্য দূর থেকে আসা ভক্তদের পক্ষে ভজনের জন্য পরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বসে থাকা সম্ভব হতো না। প্রথম যে ঘরে ভজন শুরু হয় তার মাপ হলো—৮ ফুট লম্বা, ৮ ফুট চওড়া। রাস্তার ওপরেই ঘর। এই রাস্তাতেই পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুর বাড়ী। এই ছোট্ট ঘরে ১২ জনের বেশী লোক ধরত না। তাছাড়া সামনের রাস্তাতেও লোকে ভীড় করে ভজন শুনতো। একবার হিন্দুপুর থেকে জিপগাড়ী নিয়ে এক রিক্রুটিং অফিসার বাবাকে দর্শন করতে এলেন। গ্রামবাসীরা সেই প্রথম মোটরগাড়ী চোখে দেখলো। দর্শনার্থীর সংখ্যা ক্রমশ এত বৃদ্ধি পেতে লাগলো যে সুব্বাম্মা প্রথমে একটি চালাঘর বানালেন এবং স্থান সংকুলান না হওয়াতে, কয়েকমাস পরে

সেটিও বড় করা হলো। একটি তাঁবুও খাটানো হলো। বাঙ্গালোর বা অনন্তপুরের কিছু ভক্ত তো নিজেরা তাঁবু সাথে করে নিয়ে আসতেন। শেষে ঐ বাড়ীর অত জায়গাতেও অসুবিধা বোধ হওয়ায়, আলাদা করে একটি মস্তবড় খাবার ঘর তৈরী করানো হলো ; কারণ, বাবা এ ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন যে, যত দর্শনার্থী আসবে, সবার জন্য সর্বাগ্রে আহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সেসব দিনের প্রত্যক্ষদর্শী একটি বৃদ্ধা মহিলা বলেন যে, মাঝে মাঝে যখনই খাবার কম পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত, বাবাকে চুপি চুপি তা জানানো হতো। তিনি দুটো নারকোল আনতে বলতেন। তারপর একটি নারকোল দিয়ে অপরটিকে এমনভাবে আঘাত করতেন যে নারকোল দুটি ভেঙে ঠিক সমান চার টুকরো হতো। নারকোলের জল, ভাত এবং অন্যান্য খাবারের উপর ছিটিয়ে দিয়ে তিনি পরিবেশন করতে বলতেন এবং এর ফলে সারাদিন ধরে যত ভক্ত সমাগম হোক না কেন খাবারে আর অকুলান হতো না।

গ্রামের একাউন্টেন্টের স্ত্রী সুব্বাম্মার একনিষ্ঠ ভক্তির কথা সাইবাবা উল্লেখ করেছেন। এই বৃদ্ধা মহিলা বাবার দর্শনার্থীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তদারক করতেন। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে, বর্তমানে যাকে পুরোনো মন্দির বলা হয়, সেটি তৈরী হবার পূর্ব পর্যন্ত, বাবা এই মহিলার গৃহেই কয়েক বছর বাস করেন।

শিরডির সাইবাবার নাম তখন ঐ এলাকায় কেউ জানতো না। সাইবাবা, এই কারণে, অনেকগুলি ভজন এবং স্তব রচনা করেন। দ্বারকামায়ী, পুতিমন্দির, উধি, নিমগাছ এবং আরো অনেক বিষয় নিয়ে এগুলি রচনা করা হয়েছিল। পুট্টাপর্তীর ভক্তদের কাছে এইসব তথ্য অজানা ছিল। এর মধ্যেকার অনেক গান আজও প্রশান্তি-নিলয়মে গাওয়া হয়।

বাবা যেখানে বাস করতেন সেখানকার সাংসারিক পরিবেশ তাঁর মোটেই ভাল লাগতো না। তাই কখনো কখনো কাছের পাহাড়ে তিনি ঐ বালক বয়সে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। তাঁকে দেখতে না পেলে সুব্বাম্মা এবং আরো অনেকে কাছাকাছি পাহাড়, জঙ্গল সব খোঁজা শুরু করতেন। তাঁকে পাওয়া যেত, হয় পাহাড়ের কোন পাথরের ওপর—নীচে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে—চুপচাপ বসে থাকা অবস্থায়, না হয় কোন গুহার মধ্যে, না হয় নদীর বালুচরে। সাধারণ লোক তাঁর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার

গূঢ় অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল বলে চিন্তাকুল হয়ে পড়তো। কেউ কেউ আশংকা করতো হয়তো বা তিনি হিমালয়ে চলে যাবেন বা কঠোর তপস্যায় শরীরপাত করবেন। অবতারের লীলা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। এমনকি আজও, এরা বলে যে তিনি নাকি পাহাড়ে যোগসাধনা করতে যেতেন। কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে, আত্মাকে উপলব্ধি করবার সঠিক পথে মনুষ্য-সমাজকে পরিচালিত করতেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে।

একবার, একদল ভক্তের সাথে গোরুর গাড়ী করে উরভকোণ্ডা যাবার পথে তিনি গাড়ী থেকে নেমে পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যান। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। সবার মন ভীষণ খারাপ। হঠাৎ সন্ধ্যে ৬টায় সহাস্যমুখে বাবা ফিরে এলেন—চেহারায় ক্লান্তির কোন ছাপ নেই। সবার মুখে আবার খুসির হাসি ফুটে উঠলো।

এই রকম, গোরুর গাড়ীতে ভ্রমণ নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল যার উল্লেখ, বাবা এখনো মজা করে করেন। মাঝে মাঝে, ভক্তদের থেকে দূরে, পাহাড়ের নির্জনে চলে যেতে ভালবাসলেও, তিনি কিন্তু সদা প্রাণবন্ত, আনন্দময় এবং কৌতুকপ্রিয় বালক ছিলেন। একবার প্রায় কুড়িজন ভক্তের একটি দল নিয়ে বাবা ধর্মাভরম যাচ্ছিলেন। জোছনা রাত—গোরুর গাড়ীর সারি সামনে চলেছে—পেছনে কয়েকজন তরুণ ভক্তের সাথে তিনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ সবার অলক্ষ্যে একেবারে সামনের গাড়ীটির কাছে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন এবং একটি ষোড়শী তরুণীর রূপ ধারণ করে গাড়ীর আরোহীদের, পায়ে ফোস্‌কা পড়ছে বলে গাড়ীতে তুলে নিতে খুব কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। বললেন যে ধর্মাভরমের হাসপাতালে তাঁর অসুস্থ স্বামীকে তিনি দেখতে যাচ্ছেন। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথে চোখের জল ফেলে বাবা এমন নিখুঁতভাবে অভিনয় করে গেলেন যে গাড়ীর মহিলা আরোহীরা এই দুঃখিনী 'মেয়েটির' ওপর দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিল। মাইলখানেক যাবার পর পেছন থেকে খবর এলো যে সাইবাবাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তৎক্ষণাৎ সব গাড়ী থেমে গেল। সবাই গাড়ী থেকে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। শেষ অবধি তাঁকে, প্রথম গাড়ী থেকে কয়েক হাত মাত্র দূরে, দেখতে পাওয়া গেল। বৃদ্ধযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন সাহস করে বাবাকে একটু ভৎর্সনাও করলেন—

গভীর রাতে অচেনা জায়গায় এইরকম লুকোচুরী খেলার জন্য। আবার যাত্রা শুরু হলো, কিন্তু এবার আর একজনের খোঁজ পাওয়া গেল না। সেই মেয়েটি কোথায় গেল, যে ধর্মাভরম হাসপাতালে তার অসুস্থ স্বামীকে দেখতে যাচ্ছিল? সে আর কোথায় যেতে পারে? গাড়ীগুলো থামিয়ে সবাই যখন সাইবাবাকে খুঁজতে ব্যস্ত ছিল, সেই ফাঁকে, মেয়েটি, অসুস্থ স্বামীর কাছে পৌছতে দেরী হয়ে যাবে বলে হয়তো আগেই চলে গেছে। কয়েকটি সাহসী যুবক দৌড়ে সামনের রাস্তা দেখে ফিরে এসে জানালো যে রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কোন জনপ্রাণী নেই। অবশেষে তারা বাবার শরণাপন্ন হলো, কারণ তারা জানতো যে হারানো লোকের খবর বাবা নিশ্চয়ই জানেন। একথা বলা বাহুল্য যে বাবা অবশ্যই সব কিছুই জানতেন। কারণ, স্বয়ং বাবাই তো মেয়েটির রূপ ধারণ করে তাদের সাথে মজা করছিলেন!

দিদি ভেঙ্কাম্মা বাবার কাছে শিরডি সাইবাবার একটি ছবি চেয়েছিলেন। বাবা কথা দিয়েছিলেন যে-কোন এক বৃহস্পতিবার তিনি দিদিকে ছবি দেবেন। কিন্তু সেই বিশেষ বৃহস্পতিবারের আগের দিন তিনি উরভকোণ্ডায় চলে গেলেন। বৃহস্পতিবার ছবি পাবার ব্যাপারে ভেঙ্কাম্মার কিন্তু একেবারেই খেয়াল ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে বাবা যখন কথা দিয়েছেন একদিন না একদিন ছবি তিনি নিশ্চয়ই পাবেন।

বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা পুট্টাপর্তীতে সবাই শুয়ে পড়েছে—এমন সময় সদর দরজার বাইরে কে যেন 'মা' 'মা' বলে ডাকছে শোনা গেল। ভেঙ্কাম্মা বিছানায় উঠে বসলেন। কিন্তু ডাকটা একটু পরেই থেমে গেল বলে আর উঠে গিয়ে দরজা খুললেন না। তিনি মনে করলেন তাঁদের প্রতিবেশীকে বোধহয় কেউ ডেকেছে। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর ঘরের ভেতরে একটা খস্‌খস্ আওয়াজ শুনতে পেলেন। মনে হলো শব্দটা একটা ধানের বস্তার পেছন থেকে আসছে। তিনি মনে করলেন কোন ইঁদুর বা সাপ ঢুকেছে। আওয়াজটি বেশ জোর আর ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছিল। তিনি আলো জালিয়ে খুঁজতে গিয়ে বস্তার পেছনে সাদা রঙের, গুটোনো একটা মোটা কাগজ দেখতে পেলেন। খুলে দেখেন— কি আশ্চর্য—শিরডি সাইবাবার সেই ছবি যা তিনি বাবার কাছে চেয়েছিলেন এবং বাবা তাঁর প্রতিশ্রুতি মত সেই বৃহস্পতিবারেই রহস্যজনকভাবে

দিদিকে উপহার দিলেন। অথচ বাবা কিন্তু তখন ছিলেন সেখান থেকে অনেক দূরে—উরভকোণ্ডায়। এখনও ভেঙ্কাম্মার কাছে ঐ ছবিটা যত্ন করে রাখা আছে।

সেই সময় একসাথে বেশী লোক বসতে পারে এরকম কোন জায়গা বাড়ীতে না থাকায়, বাবা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় নদীতীরে যেতেন এবং সেখানে বালির চরের ওপর বসে ভক্তদের সাথে ভজন গাইতেন।

সাইবাবা অসংখ্যবার বলেছেন যে তাঁর জীবনের প্রথম ষোল বছর প্রধানতঃ লীলাপ্রদর্শনের জন্য, পরবর্তী ষোল বছর অলৌকিক ক্রিয়াপ্রদর্শন এবং তার পরের বছরগুলো সদুপদেশ ও ধর্মশিক্ষা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তিনি আরো বলেছেন যে, যদিও লীলাপ্রদর্শনই তাঁর প্রথম পর্যায়ের কার্যকলাপের মুখ্য অঙ্গ হবে, তবুও এই লীলা, সেই পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তাঁর জীবনের অপর দুটি পর্যায়েও সেই লীলা দেখা যাবে। অলৌকিকত্ব এবং ধর্মশিক্ষাদানও সেইরকম নির্দিষ্ট পর্যায়েই বাঁধা থাকবে না। তাঁর এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়, নদীর ধারে বালির ওপর, সন্ধ্যাবেলা ভজনে বসে. সমাগত ভক্তদের সামনে, তাঁর অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের দ্বারা। এই সময়েই সেই তেঁতুলগাছটি "কল্পতরু" নামে বিখ্যাত হয়। চিত্রাবতী নদীর বাম তীরে. যেখানে রাস্তাটি নদীতে এসে মিশেছে, তার খুব কাছেই, পাহাড়ের চূড়ার ওপর, এই একটিই গাছ আছে। বাবা ভক্তদের এই গাছটির কাছে নিয়ে যেতেন এবং একই গাছের ভিন্ন ভিন্ন শাখা থেকে আপেল, আম, কমলালেবু, ন্যাসপাতি, আঙ্গুর ইত্যাদি নানাপ্রকার ফল পেড়ে পেড়ে খাওয়াতেন। বাবা বলেন, তিনি যে কোন সময়, যে কোন গাছকে কল্পতরুতে পরিণত করতে পারেন। কারণ, স্বয়ং তিনিই তো কল্পতরু।

তিনি পাহাড়ে খুব দ্রুত উঠতে পারতেন। কখনো কখনো সবাইকে বিস্মিত করে তিনি পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে যেতেন, অথচ তাঁর ওঠা কেউ দেখতে পেত না। হয়ত কোন এক মুহূর্তে দেখা যেত তিনি নদীর ধারে বালিব ওপর বসে ভক্তদের সাথে কথা বলছেন, পরমুহূর্তেই দেখা যেত, পাহাড়ের ওপর কল্পতরুর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ভক্তদের ডাকছেন। বৃদ্ধ এবং স্থূলকায় ভক্তদের তিনি পাহাড়ে উঠতে সাহায্য করতেন। এই ভক্তরা তাঁর হাত ধরলে তিনি এমনভাবে

এদের টেনে নিয়ে উঠতেন যে মনে হতো এরা যেন একেবারে হাল্কা, কোন ওজনই যেন নেই।

যে সব অতি ভাগ্যবান ভক্ত অশেষ পুণ্যের ফলে এইসব অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করেছেন তাঁরা আজও গল্প করার সময় আনন্দশিহরণ অনুভব করেন। পাহাড়ের ওপর, কল্পতরুর পাশে দাঁড়িয়ে, নীচের ভক্তদের উদ্দেশ্যে, আদেশের সুরে, স্পষ্ট উচ্চারণ করে বাবা বলতেন—"ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখো" এবং তারা অবাক বিস্ময়ে দেখতো, কখনো বাবার মস্তকের চারপাশে একটি ঘূর্ণায়মান আলোকচক্র, কখনো বা চোখধাঁধানো সুতীব্র আলোর রশ্মি তাঁর কপালের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসছে। কোন কোন ভক্ত এইপ্রকার অদ্ভুত দৃশ্য দেখামাত্র মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, এমন ঘটনার কথাও শোনা গেছে। সমতলের বালুচর থেকে ওপরে তাকিয়ে কোন কোন ভাগ্যবান দর্শন করেছে—অলৌকিক আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল শিরডি সাইবাবার চোখঝল্‌সানো এক অতিকায় রূপ। কেউ কেউ দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছে—পূর্ণচাঁদের মাঝখানে সত্য সাই বাবার শ্রীমুখ। কেউ বা দেখেছে জলন্ত আগুনের স্তম্ভ ইত্যাদি।

সেই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী এক কলেজের ছাত্র (সি. এন্. পদ্মা) বাবার ঐরকম পাহাড়ে চড়ার সময়ে একবার উপস্থিত ছিল। ছাত্রটি লিখছে—"পরদিন বাবা আমাদের নদীতীরের বালুচরে পুনরায় নিয়ে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে বাবা প্রতিদিনই বেরোতেন, কখনো নদীর অপর পারে একটি—উঁচু জলাশয়ের ধারে একঝাঁক ঘন গাছপালার মাঝে চলে যেতেন—এখান থেকে তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে ভালবাসতেন। যাই হোক, বালুচরে কথাবার্তা বলে কিছুক্ষণ কাটাবার পর, বাবা তাঁর সমবয়সী কয়েকটি তরুণ বন্ধুকে দৌড় প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে বললেন, নদীর ধার থেকে পাথুরে রাস্তা বেয়ে পাহাড়ের ওপরকার কল্পতরু পর্যন্ত—একদৌড়ে কে আগে উঠতে পারে।" সবাই দৌড় সুরু করলো, কিন্তু চোখের পলক ফেলার আগেই দেখা গেল বাবা, পাহাড়ের সেই ওপর থেকে মহা আনন্দে চীৎকার করে নীচের সাথীদের ডাকছেন। তাঁর আদেশে সাথীরা দৌড় থামালে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, "আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে থাকো—আমি তোমাদের জ্যোতি দর্শন করাচ্ছি।" সহসা কৃষ্ণপক্ষের ঘনতমসাবৃত সন্ধ্যাকাশ ভেদ করে সূর্যসদৃশ

এক প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের আবির্ভাব হলো। সেই প্রচণ্ড তেজের সামনে চোখ মেলাই যায় না—তাকিয়ে দেখা তো দূরের কথা। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে তিন চার জন ভক্ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ঘড়িতে সময় তখন ঠিক সন্ধ্যে সাতটা।

"সাহেব জলাশয়ের" ধারে একঝাঁক ঘন গাছপালার প্রসংগে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন বাবা গাছের শাখায় দোলনা ঝুলিয়ে জোরে দোল খেতে খেতে আনন্দ করছেন এবং সবাইকে আনন্দ দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "দেখ! দেখ!" মাটিতে উপবিষ্ট ভক্তরা সবিস্ময়ে ওপরদিকে তাকিয়ে দেখলো—নানারঙের ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো এক মনোহর ঝুলায় বৃন্দাবনের নয়নভোলানো রাখালবালক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসে দোল খাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখেও কয়েকজন সংজ্ঞা হারালেন এবং বাবা শূন্যে হাত ঘুরিয়ে কিছু আতপচাল সৃষ্টি করে তাদের ওপর ছিটিয়ে দেবার পর তারা জ্ঞান ফিরে পেল। তারপর তারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে সুরু করলো। বাবা বললেন, "শান্ত হও। উত্তেজিত হয়োনা। এই জন্যেই আমি তোমাদের বেশী কিছু দর্শন করাতে চাই না।"

কিছুকাল পরে মহীশূরে এক গৃহস্থের বাড়ীতে তাদের পুরোহিতকে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, বাবা নরসিংহরূপে দর্শন দেন। এই নরসিংহ অবতারকে সে সারাজীবন ধরে পূজো করে এসেছে। দর্শন করামাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংজ্ঞা হারালেন এবং বেশ কয়েকঘণ্টা পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। অনুরূপভাবে, এক অবসরপ্রাপ্ত হেল্থ্ ইন্স্পেক্টরের সাথে ঈশ্বর এবং অবতার প্রসংগে কথা বলার সময় বাবা তাঁর ললাটনির্গত আলোকরশ্মি তাকে দেখিয়েছিলেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শনে ইন্স্পেক্টরটি এমন অভিভূত হয়ে পড়েন যে ৭০ ঘণ্টা ধরে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন এবং তার ছেলেরা তাদের পিতাকে প্রায় মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাইবাবার ওপর দোষারোপ করেন।

কমলপুরম্ থেকে এক ভক্ত এসে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালো অলৌকিক কিছু তাকে দেখানোর জন্য। একদিন বাবা তাকে সপরিবারে ডেকে বিষ্ণুর দশ অবতার রূপ দর্শন করাবেন কথা দিলেন। মৎস্য, কূর্ম, এবং বরাহ অবতার দর্শন ভালভাবেই হলো, কোন কিছুই ঘটলো না। কিন্তু বাবা যখন নরসিংহের

ভয়ংকর মূর্তিতে দর্শন দিলেন তখন এরা, মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়লো মনে করে প্রচণ্ড ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। একসাথে চীৎকার করে তারা বলে উঠলো—"যথেষ্ট হয়েছে। আর দেখবো না।" সেখানে আরো অনেকে উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই দর্শন তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল না বলে তাদের চোখে এসব দৃশ্য ধরা পড়ছিল না। যাই হোক, এই পরিবারের দুর্গতি দেখে তারা বাবাকে আরতি করতে আরম্ভ করলো এবং এরপর বাবা স্বরূপে ফিরে আসেন। সুব্বাম্মার এক আত্মীয়কেও বাবা দশাবতার রূপে দর্শন দিয়েছেন। এই লোকটি পরে মারা যান। প্রকৃত ঘটনা হলো, লোকটি একটু রুগ্নপ্রকৃতির ছিল বলে দিব্যরূপ দর্শনের আনন্দাবেগ তার শরীর গ্রহণ করতে পারেনি এবং তাই সে প্রাণত্যাগ করে।

এই লোকটিকে বাবা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতর "তাঁর" প্রতিচ্ছবি দেখতে বলেন। লোকটি পরে বলেছিল যে, প্রথমে সে সত্যসাই বাবাকে দেখে; তারপর শুধুমাত্র তাঁর মস্তকের চারনাগের বৃত্তাকার কেশরাশি এবং এরপর পুরাণে যেভাবে বর্ণনা পরপর আছে সেইভাবে দশ অবতারের প্রত্যেকটি রূপ। দশম এবং শেষ, কল্কি অবতাররূপে বাবা স্বয়ং একটি সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে।

যে সব ব্যক্তি এইরূপ 'দর্শন' লাভের যোগ্যতার স্তরে পৌঁছেছে বাবা শুধু তাদেরই 'দর্শন' দিয়ে কৃপা করেন। কাকে দর্শন দিতে হবে, কি দর্শন দিতে হবে এবং কখন দর্শন দিতে হবে—এ সবের বিচারক একমাত্র তিনি। কোন পুণ্যবান ব্যক্তি যদি এইরূপ দর্শনের আনন্দ উত্তেজনা তার দুর্বল দেহে সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করে তবে ঈশ্বরের করুণালব্ধ সেই মৃত্যু হবে পরম গৌরবের।

মহীশূর সেক্রেটারিয়েটের কেরাণী কৃষ্ণমূর্তির ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করা যাবে, সাইবাবা কেন তাঁর এইসব 'দর্শন' দিতে কোন কোন সময় দ্বিধা করেন।

বাবা তখন বাঙ্গালোরে থাকতেন। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ধুতি আর হাফহাতা শার্ট পরা, সতের বছরের এক তরুণমাত্র। কৃষ্ণমূর্তি প্রায়ই বাবার কাছে আসতো এবং খুব উৎসাহের সাথে ভজনে যোগ দিত। বেশ কয়েকদিন ধরে সে বাবাকে গভীরভাবে লক্ষ্য এবং অনুসরণ

করছিল। একদিন সকাল আটটা নাগাদ সে বাবার সামনে এসে বেশ উত্তেজিত হয়ে বললো, "আমি জানি তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। আমাকে তোমার স্বরূপ দর্শন করাতেই হবে।" বাবা তাকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তিনি শিরডি সাইবাবার একটি ছবি সেই মুহূর্তে সৃষ্টি ক'রে তার হাতে দিলেন এবং ছবিটিকে দেয়ালে টাঙিয়ে ধ্যান করতে বললেন। "ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে"—এই আদেশ দান ক'রে তিনি অন্য ভক্তদের গৃহে কৃপাদর্শন দিতে চলে গেলেন।

সাইবাবা যখন ফিরলেন তখন ঘড়িতে বেলা ১২টা বাজে। তিনি ঘরের চৌকাঠ পেরোনো মাত্র কৃষ্ণমূর্তি অস্ফুট আওয়াজ করে ভেতরের ঘরে মূর্ছা গেল। জ্ঞান ফেরার পর তার সারাদেহ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। আর নিঃশ্বাসও জোরে জোরে পড়তে লাগলো। চোখ বন্ধ ক'রে সে বাবার পেছনে এঘর ওঘর ঘুরতে ঘুরতে কখনো স্বাভাবিক ভাবে, কখনো আদেশের সুরে বাবাকে বলতে লাগলো, "তোমার শ্রীপাদপদ্ম একটিবার স্পর্শ করতে দাও।" সে ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে বাবার উপস্থিতি বুঝতে পারছিল এবং বাতাসে ঘ্রাণ নিতে নিতে বাবার কাছে চলে আসছিলো। কিন্তু বাবা কিছুতেই কৃষ্ণমূর্তির ইচ্ছা পূর্ণ করলেন না। তিনি কখনো তাকে আলতোভাবে সরিয়ে দিলেন, কখনো বা স্বয়ং লুকিয়ে রইলেন, কখনো বা তাঁর শ্রীচরণ গুটিয়ে রাখলেন।

কৃষ্ণমূর্তিকে চোখ খুলতে বলা হলে, সে বললো, না, বাবার শ্রীচরণ স্পর্শ করার পূর্বে সে কিছুতেই চোখ খুলবে না। এই অবস্থায় তার কয়েকদিন কাটলো। সাইবাবা বললেন যে এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় যদি সে তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে তবে আর বাঁচবে না। বাবা তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে রাজী করালেন এবং বললেন যে তার বাড়ীতে তিনি তাকে দর্শন দেবেন।

বাবা এরপর সিভিল স্টেশনের এক বাড়ীতে উঠে এলেন। কৃষ্ণমূর্তি কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারছিলো না। তার চোখ এখনও বন্ধ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে সে ঠিক বুঝতে পারছিলো বাবা কোথায় অবস্থান করছেন। একটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে সে সোজা সেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। গাড়ী থেকে নেমে একদৌড়ে উঠোনে গিয়ে পড়লো এবং বাড়ীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে যে ঘরে সাইবাবা অবস্থান করছিলেন সেই ঘরের জানালায় ধাক্কা দিতে লাগলো। এইপ্রকার আনন্দে আত্মহারা হবার পরিণামে কৃষ্ণমূর্তির জীবনের

আশংকা রয়েছে—এ সম্বন্ধে বাবা পুনরায় সতর্ক করে দিলেন। আত্মীয়রা এসে কৃষ্ণমূর্তিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। তখনও তার চোখ বন্ধ এবং সে বাবার শ্রীচরণ স্পর্শাভিলাষী।

নিরম্বু উপবাসের ফলে সে এত দুর্বল হয়ে পড়লো যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলো। বাবা হাসপাতালে পাদোদক পাঠিয়ে দিলেন। এই চরণামৃত পান করার ফলে সে শরীরে শক্তি ফিরে পেল এবং তাকে বাড়ী আনা হলো। ঘরের ভেতরে একটি কোণায় খাটের ওপর সে শুয়ে আছে এবং তারই অনুরোধে আর সবাই ঐ ঘরে বসে বাবার ভজন গাইছে। ভজন শেষ হবার পর কৃষ্ণমূর্তি কিন্তু আর বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো না। কারণ এতদিনে সে যে ভগবানের চরণ ধরতে পেরেছে—নদী অবশেষে সাগরের বুকে আশ্রয় পেয়েছে। ঈশ্বরের অপার করুণা পাবার উপযুক্ত মহান, উন্নত আত্মাই বটে।

পরবর্তী কালেও, সাইবাবা এক ভক্তকে তার ইষ্টদেবতা রূপে দর্শন দেন। আরও অনেক ভক্তকে তিনি তাঁর নানাপ্রকার রূপে দেখা দেন। এইরকম কৃপালাভে যে সব ব্যক্তির জীবন সার্থক হয়েছে, তারা সেই পরম কৃপালাভের মুহূর্তকে স্মৃতির মণিকোঠায় সযতনে তুলে রেখেছে। বাবা অনেকবার বলেছেন যে ভগবানকে মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে আসতে হয় যাতে লোকজনের সাথে তাদের নিজস্ব ভাষায় তিনি কথা বলতে পারেন, ঠিক যেমন একটি নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে হ'লে উদ্ধারকারী সেই পুকুরে বা ইঁদারার ভেতরে ঝাঁপ দিতে বাধ্য। ঈশ্বর যদি কোন আকার ধারণ না করে, তিনি যেমনভাবে বর্তমান, সেইভাবে, তাঁর আলোর দীপ্তি অটুট রেখে অবতীর্ণ হন, তবে সেই অবতারের সাথে মানুষের ব্যবধান এত অধিক হবে যে, তার দ্বারা মানুষের কোন উপকার হবে না। সেইজন্যই ঈশ্বরকে এমন আকার ধারণ করতে হয় যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের আকারের কোন প্রভেদ নেই।

অন্য এক ঘটনায়, সাইবাবা কমলাপুর থেকে আসা কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন তারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনতে ইচ্ছুক কিনা। 'না' আর বলবে কে? তিনি সবাইকে বললেন, তাঁর বুকে কান পাততে এবং কি আশ্চর্য, তারা বাবার বুকে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবাঁশীর সুর স্পষ্ট শুনতে পেল, যে সুর শুনে একসময় যমুনার গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। জননী ঈশ্বরাম্মার মুখে আর একটি রোমাঞ্চকর

অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়। বাবা একবার বললেন, "শোন, শিরডি-বাবা এখানে এসেছেন।" ঈশ্বরাম্মা এবং সেই ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকে ভারী খড়মপরা পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দটা বাবার কাছে এসে থেমে গেলো। খড়মের শব্দ শুনে মা একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন, "খড়ম পরে ঘরের মধ্যে কে আসলো আবার?"—এমনই বাস্তব ছিল সেই অভিজ্ঞতা।

পিতা পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুও আর একটি ঘটনার কথা বলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা পেনুকোণ্ডা থেকে কিছু লোক পুট্টাপর্তী এলেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণামাচারী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। পুট্টাপর্তীতেই তাঁর আদিবাস ছিল, কিন্তু বহুদিন হলো তিনি পেনুকোণ্ডায় স্থায়ীভাবে থেকে আইনব্যবসা করছেন। তিনি এবং আরও কয়েক ব্যক্তি একাউন্টেন্টের বাড়ীতে এলে সুব্বাম্মা তাঁদের কফি খেতে দিলেন। স্বভাবতই আলোচনায় বাবার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা ওঠে এবং সেখানে উপস্থিত পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুকে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, যেসব কথা শোনা যাচ্ছে তার কতটা সত্য? ভেঙ্কাপ্পা বললেন যে তাঁর নিজের কাছেই এসব অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে হয় এবং তিনিও তাদের মতন এই ব্যাপারে অন্ধকারেই আছেন। এরপর বোধহয় সেই আইনজীবীটি ভেঙ্কাপ্পাকে প্রতারক বলে অভিযোগ করেন এবং বলেন যে তিনি নিরীহ গ্রামবাসীদের আজগুবী কথা বলে বিভ্রান্ত করছেন। এই কথায় ভেঙ্কাপ্পা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাবার কাছে গিয়ে দাবী করলেন বাবা যেন তাঁর দেবত্ব প্রমাণ করে দেখান যাতে এইসব সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তিদের মনে বিশ্বাস আসে এবং আইনজীবীর মত এরাও যাতে আর তাঁকে অহেতুক অভিযোগ না করতে পারে। বাবা প্রশান্তচিত্তে বললেন যাদের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে তাদের সবাইকে সোজা তাঁর কাছে নিয়ে আসা হোক।

পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুর বাড়ীতে বাবার কাছে সুব্বাম্মা এবং পেনুকোণ্ডা থেকে আসা জনটিকে আনা হলো। বাবা সুব্বাম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, শিরডি সাইবাবার পবিত্র সমাধি তিনি দেখতে চান কিনা। তিনি রাজী হওয়াতে বাবা তাকে ভেতরের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "তাকিয়ে ভাখো।" সেখানে সুব্বাম্মা পরিষ্কার দেখতে পেলেন ফুল দিয়ে ঢাকা এবং ধূপের গন্ধ ও ধোঁয়ায় ভরপুর সেই সমাধি—এক পাশে একটি ভক্ত বসে আপনমনে

মন্ত্রোচ্চারণ করছে। বাবা তাঁকে বললেন, "এদিকে চেয়ে দেখো হনুমানের মন্দির—ঐ দূরে দেখো সেই নিমগাছ।" সুব্বাম্মার মনে হলো তিনি যেন এক বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে শিরডির প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন —যে শোভা তাঁর দৃষ্টির সামনে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত হয়ে দূর দিগন্তে মিশে গেছে।

এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সুব্বাম্মা এবার কৃষ্ণামাচারীকে সেই ঘরে যেতে বললেন। বাবা একজন একজন করে সকলকে সেই ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঐ একই দৃশ্য দর্শন করালেন—দিগন্ত বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিতে শিরডির সমাধিমন্দির! পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজু সবার শেষে সেই ঘরে ঢুকলেন এবং সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি বলেন যে ঐ অভিজ্ঞতার পর তাঁর সব সন্দেহ নিবারিত হয়। পেনুকোণ্ডার বন্ধুরা তাঁদের অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তির জন্য ক্ষমা চাইলেন। তাঁরা বললেন ঠাণ্ডা মাথায় এই অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজলে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে এ রহস্য আমাদের গোচরের বাইরে—বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা চলে না। সেইদিন ঈশ্বরাম্মা এবং পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুর সব সন্দেহ চলে গেল। পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে তাঁদের ষোল বছরের সন্তান যথার্থই শিরডির সাইবাবার অবতার। ভেঙ্কাপ্পা নির্দেশ দিলেন তাঁর পরিবারের সবাই যেন এই সন্তানকে দৈবপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং কোনরকম ক্ষুদ্রতা, অবহেলা, অধৈর্য, ক্রোধ এবং সংকীর্ণতা নিয়ে কেউ যেন তাঁকে অকারণ বিরক্ত না করেন।

সেই তরুণ বয়সেই সাইবাবা সদুপদেশ প্রদান এবং ধর্মশিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। এর সুস্পষ্ট উদাহরণ মেলে ১৯৪১ সালে পুট্টাপর্তীতে আগত একটি দিগম্বর সাধুকে তাঁর কিছু উপদেশ দানের মধ্যে। এই সাধুটি হাঁটতে পারেন না, পঙ্গু, তাই তাঁকে একদল লোক কাঁধে বহন করে বেড়ায়—তিনি বসন ত্যাগ করে দিগম্বর হয়েছেন—এবং তিনি মৌনী—কোন কথা বলেন না। এইসব মিলিয়ে সাধারণ লোক মহাসাধকের মূর্তিমান প্রতীক বলে তাঁকে মনে করতো। সাধুটি যখন বুক্কাপটনম শহরে এলেন তখন সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। এইরকম

একজন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত সন্ন্যাসীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাইবাবার কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখবার জন্য সাধুর অনুরাগীদের প্রচণ্ড উৎসাহ। সাধারণ লোকের মনেও তীব্র কৌতূহল। দিগম্বর সাধুটি ভক্তদের কাঁধে চেপে সুব্বাম্মার বাড়ীর সামনে এলেন এবং সেখানে সেই অপরূপ ও অলৌকিক তরুণ যুবার সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার হলো। বাবা প্রথমেই সেই উলঙ্গ সাধুকে একটি বড় তোয়ালে পরিধান করতে দিয়ে এমন কিছু উপদেশ দান করলেন, যে উপদেশ অন্য কেউ কখনো সাধুকে দেয়নি।

বাবা বললেন, "তুমি দিগম্বর হয়ে দেখাতে চাইছ যে সমাজের সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছ—যদি তাই হয়, তবে সমাজ থেকে দূরে কোন অরণ্যমধ্যস্থ পর্বতগুহায় গিয়ে বাস করছো না কেন? কিসের ভয় তোমার? তাছাড়া তোমার যদি শিষ্যসংগ্রহের, নামযশের এবং শহরে লোকালয়ে খাওয়াদাওয়ার সুযোগসুবিধার প্রতি লোভ থাকে, তাহলে নিজেকে নিরাসক্ত বলে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করছো কেন?" তরুণ সাইবাবার মুখ থেকে এই কথাগুলি বের হতে সবাই বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত হলো।

দিগম্বর সন্ন্যাসীর মুখে কোন ভাষা নেই। তিনি মাথা নীচু করে বসে আছেন। এত বড় শিক্ষা তাঁর জীবনে, অতীতে, আর কখনো হয়নি। কারণ, প্রকৃতপক্ষে দিগম্বর এবং মৌনী হয়ে সাধনার উচ্চমান সম্পর্কে তিনি একেবারেই অকপট ছিলেন না। কিন্তু, সাইবাবার উদ্দেশ্য বিদ্রূপ করা নয়—বরং ঠিক তার বিপরীত। তিনি সাধুকে সাহায্য করতে, আশ্বাস দিতে এবং অভয়দান করতে চাইছিলেন। পঙ্গু সাধুটির পিঠে সস্নেহে হাত রেখে তিনি বললেন, "আমি জানি তোমার অসুবিধা কোথায়। তোমার সদা ভয়, লোকালয় ত্যাগ করে দূরে গেলে তোমার আহার আশ্রয় জুটবে না। তাই না? বেশ, আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, যে কেউ, যে কোনখানে ঈশ্বরের নাম মুখে নিয়ে চললে, আহার তার জুটবেই। আমি নিজে দেখবো তার আহার যাতে জোটে। তুমি হিমালয়ের শিখরে বা অরণ্যের গভীরে—যেখানেই বাস করো না কেন, সেই জায়গাতেই আমি তোমার নিত্য আহার জুগিয়ে যাবো। আর ঐসব জায়গায় বাস করার মত যথেষ্ট দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস যদি তোমার ভেতরে না থাকে, তবে তুমি এখানে বসেই অধ্যাত্মসাধনা করো। কিন্তু, সেক্ষেত্রে

"তোমার নগ্ন হয়ে থাকা চলবে না এবং তোমাকে এখানে ওখানে কাঁধে বহন করে নিয়ে যেতে এই লোকদের আর কষ্ট দিতে পারবে না।"

কি মহান সদুপদেশ। শুধু লোকে যদি এর মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারতো। এই হলো আপ্তবচন। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কার এই রকম অভয় দেবার শক্তি আছে?

আজও বাবা সব সাধককে এই প্রকার বরাভয় দান করে চলেছেন। ১৯৫৮ সালে স্বামী সচ্চিদানন্দ, বাবাকে দর্শন করতে এলে, বাবা তাঁকে যৌগিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করতে বলেন, প্রতিষ্ঠান গঠনের পেছনে সেই শক্তি ও সময়ের অপচয় করতে বারণ করেন। ৭০ বছরের বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পিঠে হাত রেখে বাবা বলেছিলেন, "তুমি হিমালয়ের গুহায় বসে যোগাভ্যাস করলেও সেই যোগলব্ধশক্তি গুহার পাষাণপ্রাচীর ভেদ করে সারা পৃথিবীর মংগলসাধন করতে পারে। হিমালয়ের নির্জনে চলে যাও। তুমি যেখানেই অবস্থান করো না কেন আমি স্বয়ং তোমার আহার আশ্রয়ের ভার নেব।" সেই এক আপ্তবাক্য—অবতারের দিব্যবাণী—যে বাণীর অমোঘ শক্তি, দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জগতের সমস্ত অধ্যাত্মপথের সাধককে বরাভয় দিয়ে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে পরম লক্ষ্যের পানে।

পুট্টাপর্তীতে, শিরডি সাইবাবার রূপপরিগ্রহের সংবাদে চতুর্দিক থেকে ভক্তরা দলে দলে আসতে থাকে। বাবা ব্যস্ত থাকেন তাদের শরীর ও মনের ব্যাধি দূর করতে। তিনি বলেন, রোগনিরাময়ও তাঁর উদ্দিষ্ট কর্মের একটি অংগ, কারণ শরীর মনে রোগের বোঝা থাকলে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আগ্রহ জন্মাতে পারে না। তাই এই বৈদচূড়ামণির কাছে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে নানাপ্রকার রোগে জর্জরিত মানুষের দল—পুরাতন ব্যধিগ্রস্ত, উন্মাদ, মূর্ছারোগী, ভূতে ভরকরা রোগী ইত্যাদি ইত্যাদি। শিরডিসাইবাবার যারা উপাসক তারাও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাদের গুরুর নবরূপায়ণকে পরীক্ষা করতে সমবেত হয়। অনেকে বাবার কাছে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করে, তাদের দেশে পদার্পণের জন্যে। বাবাও বাঙ্গালোর, মির্জাপুর, কোলাপুরম্, পীঠাপুরম্, সন্দুর, মাদ্রাজ এবং আরো অন্যান্য শহরে ভক্তগৃহে গমন করেন। মহীশূর রাজপরিবারের আত্মীয়দের মধ্যে অনেক ভক্তও তাঁকে দর্শন করতে আসেন। বাঙ্গালোরে

সাইবাবা একটি 'ডিওডোনাল আলসার' রোগীকে অপারেশন করে সম্পূর্ণ নিরাময় করেন। এই অপারেশনের সব যন্ত্রপাতি তিনি রহস্যজনকভাবে সৃষ্টি করেছিলেন।

তীর্থযাত্রীর স্রোত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এর ফলে আরো বড় একটি মন্দির নির্মাণের প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়লো—যেখানে বাবা নিজে থাকবেন এবং ভক্তদেরও স্থান সংকুলান হবে। এইভাবে বাঙ্গালোরের থিরুমলরাও ও অন্যান্যরা ১৯৪৫ সালে প্রথম মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। গ্রামের কাছেই, সত্যাম্মা এবং গোপালকৃষ্ণ মন্দিরের মাঝখানে, এই মন্দিরের স্থান নির্বাচন করা হলো। এই জায়গাতেই কয়েক বছর ধরে দশেরা এবং অন্যান্য উৎসবের সময় ভক্তদের থাকবার জন্য বড় বড় তাঁবু আর চালাঘরের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল।

পবিত্র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য বাবা কর্তৃক নির্দিষ্টস্থানে যখন ভৃত্য গুণী ভেঙ্কাট্টা মাটি খুঁড়ছিল, তখন অনেকগুলি শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ গৌরীপট্ট আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু, আশ্চর্যের ব্যাপার অনেকগুলি গৌরীপট্ট পাওয়া গেলেও প্রচুর অনুসন্ধান করে একটিও শিবলিঙ্গ দেখা গেল না। সকলে এর কারণ জানার জন্য বাবার শরণাপন্ন হওয়ায় তিনি রহস্যের সুরে তাঁর পেটে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "হারিয়ে যাওয়া সব শিবলিঙ্গ এর মধ্যে আছে।" যেসব ভাগ্যবান ব্যক্তি মহাশিবরাত্রির উৎসবে স্বচক্ষে বাবার মুখ থেকে লিঙ্গোদ্ভব হতে দেখেছে তারা বাবার এই কথার মর্ম বুঝতে পারবে। যাদের সে সৌভাগ্য হয়নি তাদের এই সান্ত্বনা নিয়ে তৃপ্ত হতে হবে যে আমাদের ধ্যানধারণা, বুদ্ধি-বিবেচনার সীমা দিয়ে ঈশ্বরের কার্যকলাপ পরিমাপ করা যায় না।

মন্দির তৈরী শেষ হলে বাবা সুব্বাম্মার বাড়ী ছেড়ে এখানে উঠে আসেন এবং সামনের বারান্দায় বাঁহাতে একটি আটফুট লম্বা আর ছয়ফুট চওড়া মাপের ছোট্ট ঘরে বাস করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে বাবা মাদ্রাজে গিয়ে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে দর্শন দিয়ে এসেছেন। তিনি মসুলিপট্টম্ পর্যন্তও গিয়েছিলেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সর্বত্র সকলকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়ে মনে শান্তি দান করেছেন। অভয় দিয়ে বলেছেন যে তিনি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন এবং রক্ষা করবেন।

একদিন মসুলিপট্টমের কাছে সমুদ্রসৈকতে ভক্তদের সাথে বেড়াবার সময় বাবা সোজা সমুদ্রবক্ষে নেমে গেলেন। উপস্থিত ভক্তরা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই আকস্মিকভাবে ব্যাপারটি ঘটে গেল। তারপর একটি কণ্ঠস্বর শুনে তারা সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পায়। তারা দেখলো—তরঙ্গশীর্ষে শেষনাগের ওপর ভগবান হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। পলকের মধ্যে বাবা পুনরায় ভক্তদের পাশে সমুদ্রসৈকতে এসে উপস্থিত হ'লেন। তারা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলো যে বাবার পরিচ্ছদ জলে সিক্ত হয়নি। আর একদিন, বাবা সমুদ্রের একেবারে কিনারায় চলে গিয়ে একটি রূপোর কাপ সমুদ্রের বুকে ছুঁড়ে দিলেন। সবাই এর কারণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো। পরমুহূর্তেই একটি মস্ত ঢেউয়ের মাথায় চড়ে কাপটি ফিরে এল। বাবা কাপটি তুলে নিলেন এবং তার ভেতরকার লবণাক্ত জল প্রত্যেক ভক্তের হাতে কয়েক ফোঁটা ক'রে দিলেন ভক্তিসহকারে মুখে দেবার জন্য। ভক্তরা এর অপূর্ব আঘ্রাণ এবং মধুর স্বাদে বিমোহিত হয়ে গেল। অনন্ত সমুদ্র বাবাকে অমৃত অর্ঘ দিয়েছে, ঠিক যেমন এই ঘটনার অনেক বছর পরে সে বাবার শ্রীপাদপদ্মে এক-ছড়া মুক্তার মালা নিবেদন করেছিল।

যাঁরা বাবার এইসব লীলা দর্শন এবং অমৃত পান করেছিলেন, তাঁরা ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পুট্টাপর্তীর প্রশান্তি-নিলয়মের অধিবাসী হন।

এইসব ঘটনা থেকে অনুমান করা ভুল হবে যে নিকটস্থ লোকজনদের মনে প্রভাব বিস্তার করবার উদ্দেশ্যে বাবা নানাভাবে তাঁর দেবত্ব প্রকাশ করতেন। অলৌকিকত্ব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর লীলারহস্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের সীমিত জ্ঞানের মধ্যে নেই। আমাদের জানা গণিত, পদার্থ বা রসায়নবিদ্যা দিয়ে এর নাগাল পাওয়া যাবে না। প্লেটো বলেছেন সীমাবদ্ধ ইহজগতের সাথে সীমাহীন পরজগতের পরস্পর কি প্রকৃতির সম্পর্ক তা অনুসন্ধান করার বিদ্যার নাম অতীন্দ্রিয়বিদ্যা। সাইবাবার কোন কর্মই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়। তিনি অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন কারণ একমাত্র তিনিই তাঁর তুলনা। কোন বাসনা, উদ্দেশ্য বা অভাব থেকে এর উৎপত্তি হয়নি, কারণ তাঁর কাছে কাম্য বা প্রার্থনীয় কি থাকতে পারে?

তখনকার দিনে যে কেউ তাঁর দিব্য সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হ'লে বাবা সেই মুহূর্তেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন এবং উপদেশ, পরামর্শ, শ্লেষ, বিদ্রূপ এবং এমনকি তিরস্কার করেও তাকে ধীরে ধীরে একটি বিনয়ী, শান্ত, ধার্মিক এবং সেই সাথে সুদক্ষ ও উৎসাহী নাগরিকে পরিণত করতেন। এই হ'লো তাঁর দিব্যস্পর্শের যাদু। ভক্তদের কাছে ভাষণ দেবার সময় তিনি প্রতি ব্যক্তির অন্তরশুদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দিতেন। সবাইকে তিনি বলতেন নির্ভীক হতে এবং নির্ভীকতা লাভ করা যায় একমাত্র বিশ্বাস দ্বারা—ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি এবং অপার করুণার ওপর বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস। এ বিষয়ে যদি কারো সন্দেহ থাকে তবে তার, শুধু বাবাকে দর্শন ক'রে, তাঁর দৈবশক্তি এবং অসীম কৃপার আস্বাদ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক।

তাঁর অপার করুণা প্রসংগে বাঙ্গালোরের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তখন বাবার কিশোর বয়স। সিভিল স্টেশনের রাস্তার একধারে একটি মুচি বসে প্রতিদিন জুতো সেলাই করে। রাস্তার ঠিক ওপারেই একটি বড় বাংলো। একদিন কাজ করতে করতে সে সেই বাংলোয় অনেক গাড়ীর সমাগম দেখলো। বহুলোককে দেখলো ফলফুলের ডালা নিয়ে বাংলোয় প্রবেশ করতে এবং বাংলো থেকে যারা বাইরে আসছে তাদের চোখমুখ আনন্দ আর তৃপ্তিতে উজ্জ্বল, এও সে লক্ষ্য করলো। তারা বলাবলি করছে যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতার ভগবান সত্য সাইবাবা ঐ বাংলোয় এসে উঠেছেন। বুকে সাহস সঞ্চয় ক'রে সেই মুচিও গেট পেরিয়ে ভেতরে গেল এবং ভয়ে ভয়ে হলঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে সাইবাবাকে দেখতে পেল। বাবা একটি বিশেষ চেয়ারে বসে আছেন—একধারে পুরুষ এবং অন্যধারে মহিলা ভক্তরা বসে। মুচির চোখ বাবার দিকে পড়তে. সেই মুহূর্তে বাবার সাথে তার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। বাবা তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে, মুচি যেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল, সেইখানে এলেন, তার হাতে ধরে থাকা শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মালা, সে বাবাকে দেবার আগেই, দুহাতে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার আছে কিনা তামিল ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। মুচি কিন্তু তামিল ছাড়া আর কোন ভাষা জানতো না। মনের ইচ্ছাকে অতগুলি শব্দের সাহায্যে গুছিয়ে প্রকাশ করার দুঃসাহস তার কখনোই হতো না যদি না বাবা স্বয়ং কৃপা করে

এই অস্পৃশ্য ও অবহেলিত বৃদ্ধ মুচিকে সেই শক্তি যোগাতেন। নইলে, যে বিস্ময়কর অনুরোধ তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল তার আর অন্য কোন ব্যাখ্যা হয় না। পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে, উপস্থিত সকলকে বিস্মিত ক'রে সে নিঃসংকোচে বললো "কৃপা ক'রে আমার কুটিরে পদার্পণ ক'রে কিছু গ্রহণ করুন।" বাবা সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বললেন, "ঠিক আছে, আমি আসবো।" এই বলে বাবা হলের অপর প্রান্তে তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন।

মুচি বাবাকে তার বাড়ীর ঠিকানা জানাবার জন্যে এবং বাবা কখন আসবেন জানবার জন্যে সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তাহ'লে বাবাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখতে পারবে। কিন্তু, জিনিসপত্র ফেলে উঠে এসেছে বলে সে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলো না। দর্শনার্থীদের ভীড়ে গুঁতোগুঁতি আর ধাক্কাধাক্কির মধ্যে সে ফুটপাথে ফিরে গেল। বাবা তার কুটিরে পদার্পণ করবেন ব'লে তাকে কথা দিয়েছেন—তার এই কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইলো না। মুচি চাইছিল এদের মধ্যে কেউ বাবার কাছ থেকে তাঁর আগমনের সময়টা জেনে আসুক। তার কথা সবাই হেসে উড়িয়ে দিল। কেউ বলল লোকটার আস্পর্ধা কম নয়, কেউ বলল লোকটা মাতাল নয়তো উন্মাদ। কয়েকদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে বাবা ঐ বাংলো ত্যাগ ক'রে অন্যান্য ভক্তদের গৃহে দিন কাটাতে লাগলেন। মুচিও বাবাকে পুনরায় দর্শনের আশা ত্যাগ করলো।

একদিন হঠাৎ একটি মস্ত ঝকঝকে মোটর এসে ফুটপাতে ঠিক তার সামনে থামলো। সে ভয় পেয়ে ভাবলো এ নিশ্চয়ই পুলিস বা কর্পোরেশনের কোন গাড়ী হবে, তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে, ফুটপাতে বসে ব্যবসা করার অপরাধে। কিন্তু তা তো নয়—এ যে স্বয়ং সাইবাবা। বাবা মুচিকে গাড়ীতে তুলে নিলেন। মুচি এমন হতভম্ব হয়ে গেছে যে ড্রাইভারকে সে মুখ ফুটে বলতেই পারলো না তার বাড়ী কোনদিকে। কিন্তু সাইবাবা মনে হলো তার বাড়ী ভালভাবেই চেনেন। ঠিক জায়গায় এসে গাড়ী থামিয়ে বাবা নেমে পড়লেন এবং পাথর বাঁধানো সরু গলির ভেতর দিয়ে দ্রুতপদে গিয়ে বস্তির মধ্যে মুচির ঘরের সামনে ঠিক এসে দাঁড়ালেন। মুচি দৌড়ে ভেতরে গেল খবর দিতে আর কাছের দোকান থেকে কয়েকটি পাকাকলা কেনার ব্যবস্থা করতে।

বাবা কিছু ফল আর মিষ্টি সৃষ্টি ক'রে মুচির পরিবারের লোকদের প্রসাদ দিলেন এবং দেয়ালের ধারে একটি তক্তার ওপর বসলেন। বৃদ্ধ মুচির দুচোখ বেয়ে তখন আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বাবা তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং তার হাত থেকে কয়েকটি কলা গ্রহণ ক'রে উঠে পড়লেন। বস্তির এই ছোট্ট কুটিরটি পরে ঐ অঞ্চলের সকলের কাছে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়। সাইবাবার প্রেমের মহিমা এমনই।

কিছু অর্বাচীন নির্বোধ ব্যক্তি বাবাকে বিষপ্রয়োগের অপচেষ্টা করেছিল। এই ঘটনায় বাবার দেবত্বের একাধিক দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। একথা আজও বাবা কাউকে বলতে দেন না যে বিষপ্রয়োগে তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। যেহেতু তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য ধ্রুবসত্য, তাই এই অপচেষ্টাকে এইরকমভাবেই গ্রহণ করা যাক যে বিষপানের পরও তিনি বেঁচে থাকেন কিনা দেখার জন্য কিছু ব্যক্তি এই জঘন্য পরীক্ষা করেছিল এবং এর পেছনে কুমতলব যত না ছিল তার চাইতে বেশী ছিল সন্দিগ্ধ মনের বিকার।

ব্যাপারটা এই। সেদিন পুট্টাপর্তীতে কোন একটা উৎসব ছিল। বাবা দুজন ভক্তের সাথে কয়েকটি গৃহে পদার্পণ করেন। প্রতি গৃহেই ভক্তরা তাঁকে কিছু না কিছু খাদ্য নিবেদন করে এবং তিনিও যৎসামান্য গ্রহণ করেন। যে গৃহে এই মারাত্মক খাদ্য প্রস্তুত হয়েছিল, অতঃপর বাবা সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে আরও বেশী পরিমাণে ঐ বিশেষ খাদ্য দিতে বলেন। কিন্তু সাথে সাথে নজর রাখছিলেন যাতে তাঁর সঙ্গী ভক্তরা ঐ সাংঘাতিক বিষাক্ত খাবার না খেয়ে ফেলেন। বাড়ী ফিরে এসে বাবা ঐ বিশেষ গৃহে কেন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার আসল রহস্য কয়েক ব্যক্তির কাছে গোপনে প্রকাশ ক'রে বলেন যে এই ঘটনা কিছু নিতান্ত মূর্খ এবং অর্বাচীন ব্যক্তির নিষ্ফল প্রয়াস। এই বলে তিনি প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি সম্পূর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন ক'রে ফেলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ ভক্তরা সেই উদগীর্ণ খাদ্য গোপনে পরীক্ষা করেন এবং প্রমাণিত হয় যে তার ভেতর মারাত্মক বিষ মেশানো ছিল!

আমরা, সাধারণ মানুষরা, যে সব কাজ করতে আতংকে শিউরে উঠি, সাইবাবা ঠিক সেইসব কাজ করতে ভীষণ আনন্দিত হন। উদাহরণ—

সর্পাঘাতের রাত। এই ঘটনার কথা "হস্ত সঞ্চালন" পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। সেই রাত্রে, বাবাকে সাপে কামড়ালে, এক কবচ প্রয়োগের ফলে তিনি সুস্থ হন। একজন ঘনিষ্ঠ ভক্তকে, সর্পাঘাতে মুহ্যমান, বাবা হস্ত সঞ্চালন করতে বলেন এবং তাঁরই সংকল্পে সেই ভক্তের শূন্য হাতে এই কবচ সৃষ্টি হয়। এরপর সবাই তাঁকে অনুনয় ক'রে বলে রাত্রে কোন খাদ্য গ্রহণ না করতে, কারণ তাহলে বিষক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু বাবা কারো কথা না শুনে একরকম জোর ক'রেই স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশীই সেদিন আহার করলেন। বয়স্কব্যক্তিরা তাঁকে ঠাণ্ডাজল স্পর্শ করতে বারণ করা সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছে ক'রে পুকুরের ঠাণ্ডাজলে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে স্নান করলেন। এমনিভাবেই মানুষের সহজাত ভীতি এবং সতর্কতাকে তিনি বিফল করতেন।

বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হতেন সুব্বাম্মা। পুট্টাপর্ত্তীতে যে শত শত তীর্থযাত্রীর সমাগম হতো তাদের থাকাখাওয়ার ব্যাপারেও সবচেয়ে বেশী চিন্তা করতেন সুব্বাম্মা। বাবা আজও বলেন, ভক্তদের নিবেদিত অজস্র নারকোলের রাশি দিয়ে অগণিত অতিথি ভক্তদের সেবার উদ্দেশ্যে চাট্‌নি তৈরীর জন্য সুব্বাম্মার বাড়ীর শিলনোড়ার এক মুহূর্তও বিশ্রাম ছিল না। ভাত এবং অন্যান্য খাবার রান্না করা ছাড়াও সুব্বাম্মা দৈনিক প্রায় আট ঘণ্টা ধরে নারকেল পিষতেন। ভগবানে তাঁর অগাধ ভক্তি এবং ভালবাসা ছিল। বাবা কথা দিয়েছিলেন যে সুব্বাম্মার মনের একটি সাধ তিনি পূর্ণ করবেন— অন্তিম মুহূর্তে এই পরম ভক্তিমতী মহিলাকে দর্শন দিয়ে ধন্য করবেন। সেই অন্তিম মুহূর্ত এবং তাঁর দর্শন দেবার কাহিনী—বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর।

সুব্বাম্মার অসুখ হ'লে তাঁকে বুক্কাপটনম্ হাসপাতালে ভর্তি করা হ'লো। কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও একদিন তিনি গোরুর গাড়ী চড়ে প্রশান্তি-নিলয়ম্ দেখতে এলেন। "প্রশান্তি-নিলয়ম্" তখন তৈরী হচ্ছে। সুব্বাম্মা এসেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং তাঁর চলবার শক্তিও লোপ পেল। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হ'লো। বাবা তখন বাঙ্গালোরে। বিকারের ঘোরে সুব্বাম্মা বলে চলেছেন বাবার কথা, সিরডি সাইবাবার কথা (যাকে অলৌকিক-ভাবে দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল)। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য লীলার কথাও বলছেন, যে সব লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। জ্ঞান ফিরে এলেও তাঁর

মুখে ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি। বাড়ীর লোকজনের তাঁর প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। তাদের ধারণা ছিল যে এই অদ্ভুত বালকের ওপর তাঁর গভীর ভালবাসার জন্যই তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনকে ভুলে গেছেন। তাই, সুব্বাম্মার এইসব ভাবাবেশ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তারা সুব্বাম্মাকে বললো যে তাঁর বাবা এখন একশো মাইল দূরে আছেন, কাজেই এই শেষ সময়ে সুব্বাম্মা নিজের সংসারের লোকজনের প্রতি মনোযোগ দিলেই তাঁর পক্ষে মংগলের হবে। কিন্তু সাইবাবার ওপর সুব্বাম্মার দৃঢ় বিশ্বাসকে একচুলও টলানো গেল না।

ইতিমধ্যে বাবা বাঙ্গালোর ত্যাগ ক'রে তিরুপতি যাত্রা করেছেন। সুব্বাম্মার আত্মা যে নশ্বর দেহের জাল ছিন্ন ক'রে উর্দ্ধগামী হবার জন্য তীব্র সংগ্রাম ক'রে চলেছে এবং তিনি যে বুক্কাপটনমে মৃত্যুর দিন গুণছেন—বাবার এসব কথা অজানা ছিল না। এদিকে সুব্বাম্মার মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত ব্যক্তিরা সুব্বাম্মার মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করলো। কিন্তু সুব্বাম্মার মুখমণ্ডলে এক অদ্ভুত জ্যোতি দেখে সৎকার করার জন্য শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতে সবাই ইতস্তত করতে লাগলো। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাড়াহুড়ো ক'রে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার জন্য আত্মীয়দের তিরস্কার করলেন। এঁরা মাথা নেড়ে বললেন যে প্রাণবায়ু এখনো বেরোয়নি। দেহপিঞ্জরের দরজা খোলা থাকলে কি হবে, প্রাণপাখী যে উড়ে চলে যেতে পারে না, যতক্ষণ না বাবা এসে তাঁকে প্রতিশ্রুত দর্শন দিচ্ছেন।

ওদিকে বাবাও সুব্বাম্মার অন্তিম শয্যাপাশে পৌছবার জন্য ভীষণ ত্বরা করছেন। মোটরযোগে তিরুপতি ত্যাগ ক'রে পুট্টাপর্ত্তী হয়ে যখন বুক্কাপটনম্ পৌছলেন, তখন সুব্বাম্মার মৃত্যু ঘোষণার তিন দিন পার হয়ে গেছে। সুব্বাম্মার চোখের জ্যোতি অন্তর্হিত। তাঁকে মেঝেয় নামানো হলো। উপস্থিত ব্যক্তিদের মুখে এক অস্বস্তিকর অধৈর্যের ছাপ। বাবা সুব্বাম্মার পাশে বসলেন এবং মৃদুস্বরে মাত্র দুবার ডাকলেন 'সুব্বাম্মা, সুব্বাম্মা'। যারা সেখানে ভীড় ক'রে ছিল তাদের সবাইকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে সুব্বাম্মা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন, তাঁর শীর্ণহাত অতি ধীরে বাবার হাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে দৃঢ়ভাবে তা চেপে ধরলো এবং তিনি পরমস্নেহভরে সেই হাতে হাত বুলোতে

লাগলেন। বাবা সুব্বাম্মার মুখের ওপর তাঁর আঙুল রাখলেন, মুখ ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল—যেন সুব্বাম্মা পূর্ব-থেকেই জানতেন যে বাবা তাঁর আত্মার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কিছু পান করাবেন। বাবা তাঁর দিব্য অঙ্গুলি থেকে সামান্য পরিমান জল সৃষ্টি ক'রে সুব্বাম্মার মুখে ঢেলে দিলেন। বাবা ব'ললেন, এই জল পবিত্র গঙ্গাজল। সুব্বাম্মাও বিমুক্ত আত্মার অনন্তস্রোতে মিলিয়ে গেলেন!

এই সময়ে পাশের গ্রামের কয়েকজন মুসলমান, তাদের গ্রামে এক মারাত্মক ব্যাধিতে লোকসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে বলে, বাবার সাথে দেখা করতে আসেন। মহরম মাসে পীরের পূজো এ অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে অভিষেক, উপাসনা, আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা এবং বিসর্জন—উৎসবের সব অঙ্গই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পালন করতো। হাতের পাঞ্জার আকৃতি বিশিষ্ট, পিতল এবং অন্যান্য ধাতুদ্বারা নির্মিত এই পীরা কারবালার ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রে হাসান এবং হোসেনের জীবনদানের পবিত্র স্মারক চিহ্ন। সাইবাবা মুসলমানদের বললেন, শত শত বছর ধরে তাঁদের গ্রামে পীরের অভিষেক হয়ে আসছিল, কিন্তু সম্প্রতি এই প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি তাদের আবার পূজো আরম্ভ করতে বললেন। একটি জায়গার নাম ক'রে বললেন যে ঐখানে মাটি খুঁড়লে আগেকার পূজো করা অনেক পীর পাওয়া যাবে। মাটি খুঁড়ে সেগুলি পাওয়া গেল। সর্বদর্শী বাবার কথায় এই পবিত্র পীর এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়ায় তারা বিস্ময়ে এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে সেগুলি তুলে আনতে গর্তের মধ্যে নামার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছিল। বাবা স্বয়ং গর্তে অবতরণ ক'রে সেগুলি বের ক'রে আনলেন। সবশুদ্ধ চারটি পীর সেখানে রাখা ছিল। এগুলি মাদুরে জড়িয়ে যত্ন ক'রে মন্দিরে তুলে রাখা হলো এবং সেই থেকে বহুবছর ধরে তা রক্ষিত ছিল। মহরমের উৎসবের সময়েই শুধু তা গ্রামবাসীদের দেওয়া হতো, উৎসবান্তে আবার তুলে রাখা হতো।

মুসলমানরা যখন সাইবাবার হাত থেকে পীরগুলি গ্রহণ ক'রে মন্দির ত্যাগ ক'রে যাত্রা করছিল, তখন লেখক একটি অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন। "পীর" বহনকারী ব্যক্তিটি এমন ভাব করছিল যেন তার ভর হয়েছে এবং ঐ ভর হওয়া লোকটিকে দেখবার জন্যে বেশ ভীড় জমে গেল। পবিত্র কোরাণ থেকে

আবৃত্তি করতে করতে লোকটি ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছিল। ঐ অবস্থায় বাবার কাছে ফিরে এলে বাবা তাকে বললেন, "এখন যাও এবং উৎসব শেষ ক'রে আবার এসো।" লোকটিও ভাবের ঘোরে পীর নিয়ে নাচতে নাচতে সামনের দিকে ছুটে গেল। যাদের এইসব ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, একমাত্র তারাই সাইবাবার অলৌকিকত্বের অন্ততঃ সামান্য কিছুও ধারণা করতে পারবে।

সেই সময় সব জায়গা থেকে পুট্টাপর্তীতে ভক্ত সমাগম হতো। প্রত্যেক ব্যক্তির আগমনের পেছনে এমন সব ঘটনা কাজ করতো যার কোন প্রকার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আশ্রমে পৌছণার পর, বাবার সর্বজ্ঞতা এবং সর্ব সর্বশক্তিমত্তার আভাস পেয়ে এরা মনে প্রশান্তি লাভ করতো। উদুমলপেট থেকে একদল তীর্থযাত্রী আসছিল। একব্যক্তি এই দলে যোগ দিতে প্রথমে আপত্তি করে। পরে সে অন্যদের বিশেষ অনুরোধে এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পুট্টাপর্তী আসে। এসে, আর সবাই-এর দেখাদেখি বাবাকে মাল্য নিবেদন করতে যায়। বাবা মালা গ্রহণ না ক'রে বললেন, "তুমি তো আসতেই চাইছিলে না।" এই একটি মন্তব্য এই অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে বাবার আরও কাছে টেনে আনে।

মাদুরাই থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। ভেলোরে তাঁর বোনের একটি অপারেশন হওয়ার কথা, কিন্তু বোনটি ডাক্তারকে জানিয়েছেন সাইবাবা যদি অপারেশনের প্রয়োজন আছে বলেন তবেই তিনি তাতে মত দেবেন। প্রথম কয়েকদিন কেটে গেল। বাবা কিছুই বলছেন না। অবশেষে বাবা লোকটিকে শুধু বললেন সে যেন পরের বাসেই ভেলোরে রওনা হয়। ওদিকে ভেলোরের ডাক্তার ভীষণ ক্ষেপে গেছে। এমন রুগী তিনি দেখেননি। অপারেশনের যত দেরী হচ্ছে তত তার জীবন বিপন্ন হচ্ছে অথচ সে জিদ করে বসে আছে যে কোন্ এক বালক যিনি নাকি তার গুরু এবং ভগবান—তাঁর সম্মতি না পেলে অপারেশন করাবে না! পুট্টাপর্তী থেকে ভাই ফিরে এলো। রুগীকে আবার পরীক্ষা করা হ'লো। কিন্তু অবাক কাণ্ড! দেখা গেল অপারেশনের আর কোনো দরকার নেই। ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন 'এই রুগী কি সেই একই রুগী?'

'পুট্টাপর্তীতে প্রথম আপনি কেন এসেছিলেন এবং কেমন ক'রে পৌছেছিলেন ?"—ভক্তদের কাছে যদি এই প্রশ্ন করা হয় এবং তাদের উত্তর সংগ্রহ ক'রে যদি একটি বই প্রকাশিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে সেটি একটি উপাদেয় পুস্তক হবে, এবং সেই বইতে কুর্গের কফি বাগানের বিখ্যাত মালিক শ্রীমতী স্বক্কাম্মার'কাহিনী একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে স্থান পাবে। এই ভদ্রমহিলা নামকরা সমাজসেবী ছিলেন এবং তিনি মহীশূরের মহারাজার কাছ থেকে 'ধর্মপরায়ণা' উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর কথা এই বইতে স্থান লাভের যোগ্য এই কারণে নয় যে তিনি বিরাট ধনী ছিলেন বা ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। সাইবাবার কাছে ধনী দরিদ্র উভয়ই সমান ; তিনি ধনদৌলত দিয়ে কাউকে বিচার করেন না। ব্যাঙ্কে যত টাকাই মজুত থাক না কেন তিনি মূল্য দেন শুধুমাত্র চরিত্রের সম্পদের ওপর, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং আত্মার ঐশ্বর্যের ওপর। পরলোকগতা স্বক্কাম্মা প্রায়ই তাঁর এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতেন। একদিন কুর্গের সোম্মারপেটে তাঁর বাংলোয় তিনি পূজো ক'রতে বসেছেন, এমন সময় চাকর এসে জানালো যে গাড়ী ক'রে এক ভদ্রলোক এসেছেন এবং ভীষণ জিদ করছেন যে এক্ষুনি স্বক্কাম্মার সাথে তিনি দেখা ক'রতে চান। স্বক্কাম্মা বিরক্ত বোধ ক'রলেও বেরিয়ে এলেন এই দেখতে যে অসময়ে কোন আগন্তুক তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট ক'রতে এসেছে। তিনি এসে দেখলেন গাড়ীর মধ্যে মৃগচর্মের ওপর এক সৌম্যদর্শন শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ বসে আছেন। তাঁর দীর্ঘদেহ ভস্মাচ্ছাদিত। দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। ভদ্রমহিলা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য ক'রলেন যে মালিক বা আরোহীর বয়সের সংগে সংগতি রেখে গাড়ীটির বয়সও বেশ প্রাচীন। গাড়ীর চালককে দেখেও তিনি বিস্মিত হ'লেন। চালকটি রোগামতন একটি অল্পবয়সী কিশোর। ছেলেটি গাড়ী চালাবার লাইসেন্স পেল কি ক'রে বা তার আদৌ কোন লাইসেন্স আছে কি না ভেবে তিনি অবাক হ'লেন। গাড়ীর সামনে একটি ফলকে লেখা 'কৈলাস কমিটি'। স্বক্কাম্মা বৃদ্ধকে সসম্ভ্রমে বাড়ীর অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে সদ্য আহরিত একটি গোলাপ ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম ক'রলেন। কিছু ফল নিবেদন করায় বৃদ্ধ বললেন, তিনি খাবেন না কারণ যখন তখন যেকোন স্থানে খাবার ব্যাপারে তিনি রসনাকে প্রশ্রয় দেন না। তাঁর ভাষায় একে

'জিহ্বা চাপল্য' বলে। তিনি সুকামাকে অনুরোধ ক'রলেন কৈলাস সমিতিকে একহাজার টাকা চাঁদা দিয়ে সমিতির সভ্যা হ'তে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন। সুকামা রাজী হয়ে একটি কাগজে সই ক'রলেন। এতে তাঁর নাম ও টাকার অংক আগে থেকেই লেখা ছিল। সুকাম্মা টাকাটা দিতে চাইলে বৃদ্ধ ব'ললেন, 'টাকাটাও তোমার কাছে এখন রেখে দাও। আমি পরে এসে সংগ্রহ করবো।' এই বলে সই করা কাগজটা টেবিলে রেখে দিয়ে তিনি গাড়ীতে উঠলেন এবং সেই কিশোর চালকটি চটপট গাড়ী চালিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে চলে গেল।

কয়েক বছর পর, একটি গৃহে বাবাকে দর্শন ক'রে ভদ্রমহিলার প্রথমে মনে হল তিনি যেন কুর্গের সেই রহস্যময় গাড়ীর কিশোর চালক, আবার পরক্ষণেই মনে হলো তিনি যেন সেই পলিত কেশযুক্ত বৃদ্ধ যিনি অত কষ্ট স্বীকার ক'রে সেখানে গিয়ে তাঁকে কৈলাস সমিতির জন্য এক হাজার টাকা দিতে রাজি করান এবং সেই টাকা আবার তাঁর কাছেই রেখে দিতে বলেন। সাইবাবা তাঁকে দেখে প্রথমেই বললেন, 'কই, সেদিন যে এক হাজার টাকা দেবে বলেছিলে, সেটা কোথায়?' বাবা তারপর পুরো ঘটনাটা হুবহু বলে গেলেন, কোন খুঁটিনাটি বাদ গেল না। ভদ্রমহিলা তো বিস্ময়ে হতবাক!

একবার দীপাবলী উৎসবের সময় সাইবাবা মহীশূরে, মহারাজার এক ভক্তের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি পুট্টাপর্তীর ভক্তদের কাছে নাগরূপে দর্শন দেন। সিরডি সাইবাবার ভক্তদের এবং কোয়েম্বাটুর ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের কাছে নাগরূপ খুবই পরিচিত। এই ঘটনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো পুট্টাপর্তীতে ভক্তরা যতক্ষণ এই দৃশ্য দর্শন করছিলেন, ঠিক ততক্ষণ মহীশূরে, বাবা তাঁর স্থূল দেহ ত্যাগ করে অন্যত্র বিচরণ করছিলেন। বাবা পুট্টাপর্তীর বাইরে থাকলেও, পুরোনো মন্দিরের প্রধান দরজার সামনের সিঁড়ির ওপর, বাবার একটি ছবি সাজানো থাকতো। দুধারে দুটি প্রদীপ দিবারাত্র জ্বলতো এবং এইখানেই ভজন অনুষ্ঠিত হতো। দীপাবলীর পরের দিন খুব ভোরবেলায় কয়েকজন ভক্ত কর্ণাটনাগপল্লীর পেছনের পাহাড়ের বাঁকে মোটরের আলো এগিয়ে আসছে দেখতে পায়। পরে অবশ্য জানা যায় যে অল্পকয়েকজনের মনে এইরকম একটা ধারণা

হয়েছিল। যাইহোক গাড়ীর আলো দেখে তারা দৌড়ে নদীতীরে যায় এবং মন্দিরে ফিরে এসে শোনে যে সেই অস্থায়ী বেদীর ওপর রাখা বাবার ছবিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে একটি গোখরো সাপ অবস্থান করছে। শত শত ব্যক্তি সেদিন বিকেল তিনটে পর্যন্ত এই দৃশ্য দেখতে পায়। সাপটিকে প্রসন্ন করবার জন্য তারা নারকেল ভেঙ্গে পূজা দেয় এবং দুপুরে নিয়মিত ভজন অনুষ্ঠান করে। কিন্তু সাপটি ঐ জায়গা ছেড়ে একটুও নড়ে না। এতে সাহস পেয়ে মহিলারা ভগবানের নাম উচ্চারণ এবং সত্য সাইবাবার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে করতে সাপটির দেহে কুমকুম নিক্ষেপ করেন। তার সামনে দুধের বাটি রাখা হয়। সাপটি শুধু তার ফণা তুলে এপাশ-ওপাশ দুলতে থাকে। একটি ভক্তিমতী মহিলা নারকেলের দু'টি মালা পূজো দেন। পরে প্রসাদ ক'রে সে দু'টি তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হলে তিনি প্রতিবাদ ক'রে বলেন যে তাঁর দেওয়া নারকেল আরো বড় ছিল। ছোটটি তিনি গ্রহণ করবেন না। তৎক্ষণাৎ সাপটি সজোরে ফোঁস ফোঁস ক'রতে ক'রতে মহিলাটির দিকে তেড়ে এল। দেখে মনে হলো সে এতক্ষণ যেন সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। মহিলাটি বেজায় ভয় পাওয়ায় সবাই হেসে ওঠে। বেলা তিনটের সময় সাপটি নেমে এলো এবং ২।১ গজ যেতে না যেতেই কোথায় যে লুকোলো আর তাকে দেখা গেল না। ওদিকে মহীশূরে ঠিক সেই মুহূর্তে সাইবাবাও তাঁর দেহে পুনরায় প্রবেশ করলেন এবং সকলের মন আনন্দে ভরিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন।

মহীশূরের পর সাইবাবা হায়দ্রাবাদ গেলেন। সেখানে চিন্‌চোলির রাণী নিঃসংশয় হন যে সাইবাবা স্বয়ং শিরডি বাবার অবতার। কারণ সাইবাবা অনেক জায়গা দেখে চিনতে পারেন এবং বলেন যে এগুলি তাঁর পূর্বেই দেখা ছিল। সেখান থেকে বাবা কুপ্পাম্, কারুর এবং ত্রিচিনপল্লী যান। সর্বত্র ভক্ত এবং নাগরিকবৃন্দ তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। ত্রিচিনপল্লীতে এক বিরাট শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরোভাগে ছিল একটি সুসজ্জিত হস্তী—তার পেছনে পবিত্র জলভরা রূপোর কলসী কাঁধে নিয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে চলেছিল বিভিন্ন দল। সব জায়গায় তিনি জনসাধারণকে উপদেশ দিলেন "আজ থেকে তোমাদের হৃদয় পবিত্র করো, এবং তাকে দেবতার অধিষ্ঠানের যোগ্য মন্দিরে পরিণত করো। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে

পাপের গভীরে তলিয়ে যেও না। নির্ভীক হও। ঈশ্বর তোমার ভেতরেই অবস্থান করছেন। তিনিই তোমার নিকটতম আত্মীয়। তাঁর ওপর আস্থা রাখো।"

ত্রিচিনপল্লীর রাস্তায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বাবাকে নিয়ে যে গাড়ীর সারি যাচ্ছিল তার একটি গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে ছোট্ট একটি বালক গুরুতর আহত হয়। সাথে সাথে ভীড় জমে যায়। বালকটিকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় কাছের একটি বাড়ীর বারান্দায় শোয়ানো হয়। পুলিশ তদন্ত ক'রতে আসে। কিন্তু তার আগেই বাবা এসে বালকটিকে স্পর্শ ক'রেছেন। পুলিশ এসে দেখলো বালকটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সে ছুটোছুটি ক'রে প্রত্যেককে বলে বেড়াচ্ছে কেমন ক'রে সাইবাবার একটুমাত্র স্পর্শে সে ভাল হয়ে গেছে। পুলিশের অভিযোগের আর কিছুই রইল না। বাবা সে স্থান ত্যাগ ক'রে চলে যাওয়ার পরে ছেলেটিকে সবাই আদর ক'রে খাওয়ালো। তার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তারা ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আর একটি বালককেও ঐভাবে জনতা সমাদর ক'রেছিল। সেই বালকটি সম্ভবতঃ আজও কৃতজ্ঞচিত্তে বাবার কৃপার কথা স্মরণ করে। ত্রিচিনপল্লীর কাছে, বাবার সম্মানার্থে একটি জনসভা আহ্বান করা হ'লে সেই সভায় এক ব্যক্তি বাবার দেবত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে। সভামঞ্চের ওপর থেকে ব্যাপারটা আঁচ ক'রে বাবা তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির কাছে বসা একটি মূক ও বধির বালককে ডাকেন ও তাকে মঞ্চে উঠে আসতে বলেন। বাবা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার নাম কি ?' সেই মূক বালকটি হাজার হাজার দর্শকের কানে বাবার করুণায় তার কথা বলবার সগুলব্ধ শক্তির পরিচয় পৌছে দিল মাইকে তার ভেঙ্কটনারায়ণ নাম ঘোষণা করে। আর যে লোকটি সন্দেহ ক'রেছিল সে লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে কোন কথা না বলে বসে রইলো। এই ঘটনার জের টেনে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং বাবা মাঝে মাঝে হাস্যচ্ছলে তার উল্লেখ করেন। পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল বাবার বাসস্থানের সামনের রাস্তা মূক ও বধির লোকে ভরে গেছে। অব্যক্ত যন্ত্রণার সে এক করুণ চিত্র। ত্রিচিনপল্লীতে যে এত মূক ও বধির বাস করে তা এর আগে কারুর জানা ছিল না। অলৌকিক উপায়ে এদের সারাবার দাবীতে আত্মীয়দের কোলাহল এড়াবার জন্যে বাবাকে সেই স্থান ত্যাগ ক'রতে হ'লো।

কারুর এবং ত্রিচিনপল্লী শহরের ভক্তবৃন্দ প্রতিযোগিতা করে তাদের বাড়ী-ঘর, রাস্তা এবং সম্বর্ধনা সভা সাজাতেন। কিন্তু এইসব আড়ম্বর সাইবাবাকে স্পর্শও করতো না। তিনি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সমানভাবে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো কখনো ধনীদের চাইতে দরিদ্রদের মধ্যেই তিনি বেশী ক'রে ঘুরতেন। অহঙ্কারস্ফীত এবং লোভ কলুষিত হৃদয় অপেক্ষা তিনি অধিক পছন্দ করেন প্রার্থনা ব্যাকুল এবং অনুতপ্ত হৃদয়। নানা রঙের ফুল দিয়ে এমন চিত্তগ্রাহী ও বর্ণময় ক'রে তাঁর বসার আসন এবং মণ্ডপ তৈরী হতো যে তা ললিতকলা নৈপুণ্যে অভিনব ছিল। সাইবাবা অজস্রবার জনসাধারণকে বলেছেন যে, পবিত্র হৃদয়স্বরূপ ফুল এবং সৎকর্মস্বরূপ ফল অর্পণকেই তিনি অধিক মূল্য দেন।

একবার মহীশূরে একটি ফুল দিয়ে সাজানো মণ্ডপে বসে বাবা এক ভক্ত পরিবারের পূজার্ঘ গ্রহণ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ যেন শূন্য থেকে একটি গোখরো সাপ এসে তাঁর চরণে অর্ঘ দেওয়া ফুলের স্তূপের ভেতরে ঢুকে পড়লো। একটু পরে আর একটি সাপও ঢুকলো। বাবা আশ্বাস দিয়ে বললেন যে ভয় পাবার কিছু নেই। সাপ দুটিও যেমন এসেছিল, তেমনি রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইসব অলৌকিক ঘটনাবলীর সাহায্যে ভক্তদের মনে শুধুমাত্র বিশ্বাস সঞ্চারিত হলেই বাবা পরিতৃপ্ত হন না। তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির, কাজ বুঝে নেওয়া শিক্ষক। পূর্ণমাত্রায় সততা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য অকপট প্রয়াস থাকলেই তিনি সন্তুষ্ট হন—এর একচুল কমে নয়। এর দ্বারাই বোঝা যায়, যেসব অসংখ্য নরনারী তাঁর অলৌকিক শক্তির কাহিনীতে আকৃষ্ট হ'য়ে, তাঁর কাছে গিয়ে, বহু অতীন্দ্রিয় ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁর দেবত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়, তাদের মধ্যে অনেকে তার থেকে দূরে চলে যায়। এর কারণ, বাবা যে জিনিষগুলি তাদের কাছে আশা করেন সেগুলি নিষ্ঠা নিয়ে তারা পালন করতে পারে না। এগুলি হ'লো চরিত্র সংশোধন, স্বার্থত্যাগ, আধ্যাত্মিক অনুশীলন, নামস্মরণ এবং ধ্যান। বাবা, তাঁর প্রথম জীবনেও এই কথা জোর দিয়ে বলতেন যে, তিনি যে শরীরের বিপদ কাটিয়ে দেন, কঠিন অসুখ সারিয়ে তোলেন এবং ব্যথিত মনে সান্ত্বনা ও শান্তি দান করেন, এসব হলো আধ্যাত্মিক

অনুশীলনের প্রথম সোপান। তাঁর দিব্যরূপ দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করার পর আপনা থেকেই তো এই আধ্যাত্মিক অভ্যাস পালন করবার প্রেরণা আসা উচিত। বহু সাধু ও তপস্বীর, ধনী এবং প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকের মন পাবার ব্যগ্রতায় পদস্খলন হয়েছে। কিন্তু বাবা, যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন সাধু সজ্জন এবং মহর্ষিদের আধ্যাত্মিক পথ আলোকিত করতে, তাঁর নিকটস্থ ব্যক্তিদের দোষক্রটি সংশোধন ক'রতে চাইলে, কখনও স্পষ্ট কথা বলতে ছাড়তেন না। তাঁর করুণা এমনই শক্তিশালী যে তা কখনো বয়স, পাণ্ডিত্য বা দীর্ঘসান্নিধ্যের বাধা গ্রাহ্য করে না। প্রত্যেক ব্যক্তির উপযুক্ত মূল্যায়ন ক'রে সংশোধন ক'রবার জন্যই তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন। তাঁর দৈব ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, একমাত্র সেই পথেই প্রত্যেকে পূর্ণ এবং মুক্ত হবে।

পুট্টাপর্তীতে দশেরা উৎসব অচিরেই বিখ্যাত হয়ে উঠলো। এমনকি বাবাকে মাদ্রাজ, ত্রিচিনপল্লী বা মসুলিপট্টমে অন্যান্য উৎসবে যোগদান করতে যেতে হলেও, তিনি দশেরার সময় পুট্টাপর্তীতে উপস্থিত থাকবেনই। সুব্বাম্মা ও অন্যান্য ভক্তরা বহু বছর ধরে এই মাতৃ উৎসবের ব্যবস্থাপনা করতেন এবং তাঁরা এই দায়িত্বকে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতেন। বাবা স্বয়ং জগন্মাতা—তিনি একাধারে বিদ্যাদেবী সরস্বতী, ঐশ্বর্যদেবী লক্ষ্মী, বসন্ত ঋতুর দেবী শারদা, অন্ন দেবী অন্নপূর্ণা এবং এমনকি শক্তি ও আত্মশুদ্ধির দেবী কালী। বাবা বলেন যে মানব জাতির দিব্যজননী হলো সনাতন ধর্ম। সনাতন সারথিরূপে বাবা আনয়ন করেছেন তাঁর সত্য, ধর্ম, শান্তি ও প্রেমের বাণী—আধ্যাত্মিক জীবনের যে চারটি হলো মৌলিক নীতি।

বাবার ভক্তরা তাঁকে তাদের জননীরূপেই বেশী আপন ভাবেন। পুট্টাপর্তীর দশেরা উৎসব সেরা উৎসবে পরিণত হবার বিশেষ কারণ এইখানেই। বাবা বহু ভক্তের কাছে জননীরূপে দর্শন দিয়ে তাদের কৃপা করেছেন। এমনকি একজন ভক্ত তাঁকে শিবা এবং শিবশক্তি নামে ডাকতে ভালবাসেন—শিবা মানে জননী—শিবজায়া দুর্গাদেবী, আর শিবশক্তি ঈশ্বরের সেই চূড়ান্ত রূপকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে তিনি একই সাথে পিতা ও মাতা—পুরুষ ও প্রকৃতি।

শিশুদের সংগে সময় কাটাতে বাবা খুব আনন্দ পান। অত্যন্ত দুরন্ত শিশুও

তাঁর কাছে এলে শান্ত হয়ে যায়। তিনি তাঁর দিব্যৈশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে নানা রকম খেলা দেখিয়ে, মজা করে, তাদের খুশি করেন। হাতের আঙুল দিয়ে মুদ্রা ক'রে দেয়ালে তার ছায়া ফেলেন আর শিশুর দল অবাক হয়ে দেখে সাপ, পাখী, ঘোড়া, হরিণ, কুকুর, ময়ূর, কাক, বেড়াল, মোষ সব মহানন্দে লাফাচ্ছে। এই দেখে বাচ্চারা খুব মজা পায়। হাত ঘুরিয়ে কত-রকম মিষ্টি সৃষ্টি ক'রে এদের আদর ক'রে খেতে দেন। শিশুর সামনে এক মুঠো বালি নিয়ে বলেন 'লাড্ডু নাও'। লাড্ডু শিশুদের খুবই প্রিয়। শিশুটি তার কচি হাত বাড়ায় সেই লাড্ডু ধরতে। শিশুর হাতে পড়ামাত্র বালির দলা অবিশ্বাস্যভাবে সুগন্ধি লাড্ডুতে পরিণত হয়। বাবা বলেন, শিশুরা বাস্তবিকই ভাগ্যবান কারণ বয়স্কদের তুলনায় অনেক আগেই তারা বাবার দর্শন পেয়েছে এবং তারা ধন্য এই দিক দিয়ে যে ভবিষ্যতে বহু বছর ধরে তারা বাবাকে শিক্ষক, রক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং অভিভাবক হিসাবে পাবে। ভক্তদের সন্তানদের নাম-করণে সম্মত হলে বাবা তাদের যে নাম রাখেন সেই নামের মধ্যেও বাবার করুণা এবং মহিমার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি শিশুদের অক্ষর পরিচয় বা হাতেখড়িও সম্পাদন করান এবং শিশুদের কচি আঙুল নিজের হাতে ধরে তিনি মধু, দুধ বা চালের মধ্যে অক্ষরগুলি লেখান।

অক্ষরের আর এক অর্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। বাবা যখন শিশুদের অক্ষর ভাষ্য শেখান বা অক্ষর পরিচয় করান, তখন সেই সাথে তাদের ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষাও শুরু করেন। প্রত্যেক শিশুকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়—'ওম্ নমো নারায়ণায়' বা 'ওম্ নমো শিবায়' বা 'ওম্ শ্রীনিবাসায়' বা তার বংশের প্রথানুযায়ী নির্দিষ্ট অন্য কোন মন্ত্র। এই ভাবে চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছবার চাবিকাঠি শিশুটির হাতে বাবা তুলে দেন। সাইবাবাকে সাইমাতা বলা হয়েছে একটি তামিল ভজনে—যে মাতা সন্তানকে জ্ঞানদুগ্ধ পান করান। অক্ষর পরিচয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাগ্যবান শিশুটি সেই জ্ঞানদুগ্ধ পান করার সুযোগ লাভ করে। বাবা দশেরা উৎসব উজ্জ্বল ক'রে রাখেন সাহিত্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক এবং অন্নদাতা ও পালন কর্তারূপে। সেই জন্য অবতারত্ব ঘোষণার শুরু থেকেই দশেরা উৎসব এমন স্মরণীয় হয়ে আছে। এই উৎসবে ভক্তরা সানন্দে ধর্মালোচনা, সঙ্গীতসভা, নাট্যানুষ্ঠান উপভোগ করে এবং পেট

ভরে সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণ করে। প্রতি সন্ধ্যায় একটি শোভাযাত্রা গ্রামের সংকীর্ণ পথ পরিভ্রমণ করতো। একটি পুষ্পসজ্জিত শিবিকায় বাবা বসে থাকতেন এবং আগ্রহী ভক্তরা পালা ক'রে তা বহন করতো। নিত্য নতুন সাজে সেই শিবিকা সাজানো হতো। লেখক ঐ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ক'রে স্বচক্ষে দেখেছেন বাবা তাঁর গলার পুষ্পমাল্য থেকে ফুল ছিঁড়ে হাতভর্তি পাপড়ি জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং পাপড়িগুলি যখন পড়ছে তখন টুং-টাং শব্দ হচ্ছে, কারণ এগুলি ইতিমধ্যে সব ছোট ছোট পদকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পদকের এক পিঠে বাবা এবং অন্যপিঠে শিরডি বাবার ছবি আঁকা। আবার এমনও হয়েছে যে পাপড়িগুলি পিপারমিণ্ট লজেন্সে পরিণত হয়ে শিবিকার চারপাশে জনতার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। ভক্তেরা দেখেছেন বাবার দেহের ভেতর থেকে বিভূতি বেরিয়ে তাঁর কপাল ছেয়ে থাকতো। কখনো কুমকুমের ফোঁটাও দেখা যেতো।

এই মন্দিরটিতেও ভক্তদের স্থান সংকুলানে অসুবিধা দেখা দিতে লাগলো। শিরডি সাইবাবা পুট্টাপর্তী গ্রামে মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন খবর পেয়ে, তাঁর বহু ভক্ত সেখানে ছুটে এলো। অনেক ভক্ত যথারীতি শিরডিতে তীর্থভ্রমণে গিয়ে যেন তাদের অন্তরের ভেতর থেকে নির্দেশ পায় পুট্টাপর্তী যাবার জন্য। অন্যেরা স্বয়ং সত্য সাইবাবার কাছ থেকেই শিরডিবাবার কথা শোনেন। চার প্রকার মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বরের স্মরণ নেয়—বিপন্ন, জিজ্ঞাসু, ধনার্থী এবং জ্ঞানী। কিন্তু ঈশ্বর সকলকেই ভালবাসেন এবং কৃপা করেন। আর্তের বেদনা তিনি দূর করেন। তাঁর প্রদত্ত বিভূতি শত শত ভাগ্যহীনের জীবনে জাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। অশুভ শক্তির ছায়া তাদের স্পর্শ ক'রতে পারে না। যারা ছিদ্রান্বেষী, অনুসন্ধিৎসু, সন্দিগ্ধ, নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদী, তাদের তিনি সন্তুষ্ট করেন, কাছে টানেন এবং তাঁর প্রতি অনুরাগী ক'রে তোলেন। যারা জাগতিক সুখের পেছনে ছোটে তাদেরও তিনি আশীর্বাদ করেন, তবে শুধু এই সর্তে যে তারা আধ্যাত্মিক চর্চা এবং ঈশ্বরের ধ্যানে তাঁর প্রদত্ত এই মানসিক শান্তি উপযুক্তভাবে কাজে লাগাবে। নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা যাঁরা সংশয়মুক্ত এবং পবিত্র হয়েছেন, সেই সব জ্ঞানী, বাবার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং তাঁর অনন্ত মহিমাসহ তাঁদের কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। উপরোক্ত

সব শ্রেণীর লোকেরাই পুট্টাপর্তীতে আসতো এবং বলাবাহুল্য, এদের মধ্যে বিপন্ন এবং ধনাকাঙ্ক্ষীরাই বিপুল সংখ্যায় আসতো। তাঁর দিব্য সান্নিধ্যে যারাই এসেছে তিনি তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

একদল ডাকাত কিভাবে ডাকাতি ছেড়ে ধর্ম পথে আসে এবং চাষবাস সুরু করে—সেই কাহিনী উল্লেখ করবার মত। চিত্রাবতী নদীর ওপারের এক পাহাড়ে, এক রাত্রে বাবা হঠাৎ একদল ডাকাতের সম্মুখীন হন। ডাকাতেরা তখন লুঠের মাল নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করছিল। কিন্তু বাবাকে দর্শন করে এবং তাঁর হাত থেকে বিভূতি নিয়ে তারা বুঝলো বাবা অন্তর্যামী এবং তাঁর চোখ এড়িয়ে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। সেই সতেরটি দুরাত্মার সাথে বাবা কথা বললেন এবং তাঁর অলৌকিক মহিমায়, নিকৃষ্ট পরিণত হ'লো উৎকৃষ্টে। তারা বাবার সাথে পুট্টাপর্তী এলো এবং সেই থেকে সৎভাবে জীবন-যাপন ক'রতে লাগলো।

দর্শনার্থীর সংখ্যা সামনে বৃদ্ধি পেতে থাকায়, কয়েক বছরের মধ্যে, মন্দিরের সামনে, একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত লম্বা এক চালাঘর নির্মিত হ'লো। কিন্তু এতেও জায়গা কম পড়লো। তখন মন্দিরের পেছনে একটি শোবার ঘর ও একটি স্নানের ঘরসহ পৃথক একটি বাড়ী তৈরী করা হ'লো। এই ঘরের মধ্যেই বাবা ডাঃ পদ্মনাভনের ভ্রাতার হার্ণিয়া অপারেশন করেছিলেন। মন্দিরের সামনের চালাঘরে একটা পর্দা টাঙিয়ে বাবা পুট্টাপর্তী গ্রামের আপ্পিয়ার দেহে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন করেন। মন্দির এবং নতুন বাসস্থানের মধ্যেকার খোলা জায়গায়, এক রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় বাবা ঘোষণা ক'রলেন যে তাঁর দানকরা একটি মাদুলি একজন ভক্ত হারিয়ে ফেলেছে এবং মাদুলিটি বাবার কাছে পুনরায় ফিরে এসেছে। গ্রন্থকারের এখনো স্মরণ আছে যে, বাবা বললেন, সেই ভক্তের হাতে মাদুলিটি বেঁধে দিয়ে আসার জন্য তাঁকে তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজ যাত্রা ক'রতে হবে। কিন্তু উপস্থিত সকলে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালো যে, একজন ভক্ত তো পরদিন মাদ্রাজ যাচ্ছেই, তার হাতে মাদুলি পাঠিয়ে দিলেই হবে। মিছিমিছি অতরাত্রে বাবার স্থূল দেহ ত্যাগ ক'রে মাদ্রাজ যাওয়া এবং আবার ফিরে এসে সেই দেহে প্রবেশ করা—এর কোন প্রয়োজন নেই। বাবা এই প্রস্তাবে রাজী হ'লেন। অনেকদিনের পুরোনো

ভক্ত শ্রীশেষাগিরি রাও-এর হাতে মাদুলিটি দিয়ে বাবা বললেন, "সাবধান, যেন না হারায়। এটি বেশ শক্ত করে একটা গামছায় বাঁধো, আর গামছাটি তোমার কোমরে কষে বাঁধো।" শেষাগিরি রাও বাবার আদেশ অনুসারে মাদুলিটি কোমরে শক্ত ক'রে বেঁধে শুয়ে পড়লেন। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে বাবার উচ্চকণ্ঠে হাসির আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম বাবা বিছানায় উঠে বসে আছেন। মজায় যোগ দেবার জন্য আমরাও বাবার কাছে এগিয়ে এলাম। শেষাগিরি রাও-এর ঘুম ভাঙেনি। সে কিছুই জানে না কি হচ্ছে। বাবা তার ঘুম ভাঙালেন এবং তার কাছে মাদুলিটি ফেরত চাইলেন। সে কোমর থেকে গামছা খুলে মাদুলি বের ক'রতে গিয়ে দেখে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাবা তাকে খুব একচোট কৃত্রিম ধমক দিলেন এবং শেষে প্রকাশ করলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই মাদ্রাজ গিয়ে সেই অসুস্থ ভক্তের হাতে মাদুলী বেঁধে ফিরে এসেছেন। সময় নষ্ট করা সম্ভব ছিল না, কারণ সর্বক্ষণ তাকে রক্ষা করার জন্যে মাদুলিটি অপরিহার্য ছিল। সত্যসত্যই বাবা মাদ্রাজে গিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসেছিলেন।

পুরোনো মন্দিরের স্মৃতি ভক্তদের মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। কারণ বাবা সেখানে সবসময় ভক্তদের মধ্যে বিচরণ ক'রতেন। এইখানে অবস্থানকালে বাবা ঈশ্বর প্রেমের ওপর অনেক ভজন এবং স্তোত্র রচনা করেন এবং গভীর ভালবাসা ও যত্ন নিয়ে সেগুলি ভক্তদের শেখান। ভজন শেখার ভক্তসংখ্যা খুব বেশী ছিল না ব'লে তাদের নিয়ে তিনি প্রায়ই চলে যেতেন চিত্রাবতীর বুকে বালির ওপর, অথবা কাছাকাছি পাহাড়ে, অথবা নদীর ওপারের বাগানে। এইসব জায়গায় রান্নাবান্না ক'রে খাওয়া হ'তো এবং যারা রান্নায় নিযুক্ত থাকতো তাদের তিনি কৃপা ক'রতেন তাঁর দেবত্বের নানা চিহ্ন এবং অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়ে।

ভক্তদের দুঃখ কষ্ট প্রসঙ্গে শিক্ষামূলক উপদেশ প্রদানকালে তিনি বলতেন যে তাদের অতি অবশ্য ভগবানের নামজপের ওপর জোর দিতে হবে। মনে শান্তি পেতে হলে এইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। একবার তিনি এক মহিলা ভক্তকে হঠাৎ ব'ললেন, "তুমি নামজপ করছো না?" মহিলাটি উত্তরে কিছু ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাবা তো শোনার অপেক্ষা না করেই ব'লে চললেন, "ওহো, তুমি

তো তোমার জপমালা হারিয়ে ফেলেছো। কি, হারাওনি ?" এইকথা বলার পর বাবা সহসা বালির ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটি জপমালা বের করলেন। তারপর মহিলাকে ব'ললেন, "এই যে এটা নিয়ে যাও।" মহিলাটি সসম্ভ্রমে উঠে হাত জোড় ক'রে এগিয়ে এলেন বাবার কাছ থেকে জপমালা গ্রহণ করবার জন্যে। বাবা তাকে থামতে ইঙ্গিত ক'রলেন, এবং দিব্য হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে বললেন, "দাঁড়াও। আচ্ছা, আগে বলতো এ জপমালাটি কার ?" মহিলা জপমালাটির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "আমার···বাবা··· মানে·· আমার মায়ের।" এই জপমালাটি ঐ মহিলাকে তাঁর মা মৃত্যুশয্যায় দিয়েছিলেন, তাই সেটি ফিরে পেয়ে তিনি খুবই খুশী হলেন। অতঃপর বাবা আমাদের সবাইকে, মহিলার মায়ের ঈশ্বরানুরাগ, তার ভাই-এর কঠোর তপশ্চর্যা এবং মহিলাটির নিজের সাধনার কথা প্রশংসার সাথে বললেন। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন আগে জপমালা হারিয়েছিল। মহিলার উত্তর শুনে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। জপমালাটি নাকি তিনি চার বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে হারিয়েছিলেন।

যত দিন যায় ভক্ত সমাগমও বাড়তে থাকে। পুরোনো মন্দিরে জায়গা হয় না, তাছাড়া বালির চরেও প্রতিদিন মিলিত হওয়া সম্ভব না। বাবার নিজের থাকবার ঘরও এত ছোট যে নড়াচড়া করা কষ্টকর। এছাড়া চারপাশের গোলমাল ধূলো বালির মধ্যে বাবাকে বাধ্য হয়ে বাস করতে হচ্ছিল। মন্দিরের চারধারেও এমন কিছু বেশী জায়গা নেই যেখানে উৎসবের সময় সমাগত ভক্তবৃন্দ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে থাকতে পারে। এইসব কারণে ভক্তেরা একযোগে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালো যাতে তিনি নতুন প্রশস্ত বাড়ী নির্মাণের অনুমতি দেন। বাবা স্বয়ং এই নবনির্মিত গৃহটির নামকরণ করেন "প্রশান্তি-নিলয়ম্" বা শান্তির আলয়।

প্রশান্তি-নিলয়ম্

"প্রশান্তি-নিলয়ম্"। ভগবানের বাসগৃহের কি সুন্দর প্রাণ জুড়ানো নাম। নামটির গভীরে কি অপূর্ব ব্যঞ্জনা। নামটি স্মরণ হ'লেই, শান্ত নির্জন পবিত্রতায় শীতল সমীরণের স্নিগ্ধ পরশ অনুভূত হয়। নিলয়মকে মাঝখানে রেখে তার চারদিক ঘিরে যে পাহাড়গুলি বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দেখে মনে হয় যেন কোন ধ্যানমগ্ন শুভ্র জটাজুটধারী ঋষির দল। মাথার ওপরের বিশাল উন্মুক্ত আকাশ যেন কানে কানে বলছে—অজানা অসীমকে জানো, তার ধ্যান করো। পাহাড়ের সানুদেশে বিক্ষিপ্ত শিলাসনগুলি যেন বলছে—এসো, এইখানে ব'সে ধ্যানে ডুবে যাও।

নিলয়মের পেছনে, পাহাড়ের ধারে তপশ্চর্যার জন্য বাবা একটি তপোবন রচনা ক'রেছেন। তার ভেতরে যে বটবৃক্ষটি আছে সেটিকে সাধকরা পবিত্রতম বলে মনে করতে বাধ্য। বটগাছ—বটবৃক্ষ এবং ন্যগ্রোধ নামে ভারতীয় পুরাণে ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, মহাপ্রলয়ে বিশ্বচরাচর প্লাবিত হলে স্থিতির অধীশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণু বট-পত্রের ওপর নিদ্রামগ্ন ছিলেন। দক্ষিণামূর্তি বা গুরুরূপী শিব বটবৃক্ষের নীচে যোগাসনে ব'সে মহামৌনের মাধ্যমে শিষ্যবর্গকে জ্ঞান বিতরণ ক'রেছেন। এই বৃক্ষকে সনাতন ধর্মের প্রতীক বলা চলে, কারণ এর শাখা-প্রশাখা সর্বদিকে প্রসারিত হয়ে, সমস্ত রকমের ধর্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে পুষ্টিলাভ করে। সংস্কৃতে এর অপর নাম বহুপাদ, কারণ এর অসংখ্য শাখা থেকে বহু শেকড় বের হয়ে মাটির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ ক'রে শাখাগুলি, মূল কাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল না হয়েই বেঁচে থাকে। সেই জন্যই এই বৃক্ষ অমর। ভারতবর্ষে এমন কয়েকটি বটবৃক্ষ আছে যেগুলি হাজার হাজার বছর ধরে পূজিত হয়ে আসছে, যেমন প্রয়াগের ত্রিবেণীস্থিত বটবৃক্ষ এবং গয়ার 'অক্ষয়বট'।

প্রশান্তি-নিলয়মের এই বটবৃক্ষটির একটি নিজস্ব মাহাত্ম্য আছে। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে, চিত্রাবতীর বুকে বালির ওপর, ভক্তদের সাথে ব'সে বাবা বুদ্ধদেব, বোধিবৃক্ষ এবং সাধকরা যে তাঁদের তপস্যার সুবিধার জন্য বিশেষ অনুকূল স্থান খুঁজে খুঁজে বের ক'রে থাকেন, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা ক'রছিলেন। এই আলোচনা ক'রতে ক'রতেই তিনি বালির ভেতর থেকে ১৫″ × ১০″ মাপের একটি পুরু তাম্রফলক বের ক'রলেন। এতে রহস্যময় গোপন সংকেত লিপিসমেত কিছু অজ্ঞাত এবং জ্ঞাত অক্ষর খোদিত ছিল। তিনি জানালেন যে, সাধকরা যে সব বৃক্ষের নীচে ব'সে কঠোর তপস্যায় রত থাকেন, সে তপস্যায় মনের একাগ্রতা এবং ইন্দ্রিয় দমনে সাহায্য ক'রবার জন্য, সেই সব বৃক্ষের নীচে, মাটির মধ্যে এই ধরনের গোপন সঙ্কেতলিপি তামা বা পাথরের ফলকের ওপর খোদাই ক'রে পুঁতে রাখা হয়। বাবা ঘোষণা ক'রলেন যে, তপোবনে তিনি যে বটবৃক্ষের চারা রোপণ ক'রবেন বলে স্থির ক'রেছেন সেখানে মাটির নীচে এই তাম্রফলকটি পুঁতে রাখা হবে। ১৯৫৯ সালের ২৯শে জুলাই এই সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত হয়। বাবা আরো ঘোষণা করেন যে সাধনমার্গের বিশেষ স্তরে উন্নীত যোগীরা আপনা থেকেই এই বটবৃক্ষ এবং তার নীচে প্রোথিত তাম্রফলকের সন্ধান পাবেন এবং এই ফলকের রহস্যময় শক্তি দ্বারা আকর্ষিত হ'য়ে তপোবনে উপস্থিত হবেন এবং তখনই তপোবন নামকরণ পুরোপুরি সার্থক হবে।

১৯৫০ সালের ২৩শে নভেম্বর, ভগবান সত্য সাইবাবার ২৫তম জন্মদিনে প্রশান্তি-নিলয়মের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এটির নির্মাণকার্যে দু'বছর সময় লাগে। ব'লতে গেলে বাবাই স্থপতি হ'য়ে এর নক্সা প্রস্তুত করেন এবং ইঞ্জিনীয়ার হ'য়ে যাবতীয় নির্মাণ কার্য পরিচালনা করেন। নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বাবা যেসব মতামত দিতেন পাস করা ইঞ্জিনীয়াররা সেগুলি গ্রহণে বাধ্য হতেন, কারণ তাদের চাইতে বাবার মতামতই অধিক উৎকৃষ্ট বলে তারা বুঝতে পারতেন। তারা দেখেছিলেন, পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞানে এবং সৌন্দর্য বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর দৃষ্টিকোণে বাবার দখল অনেক বেশী। কাজ ঠিকমত বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হলেও বাবার দয়ারও শেষ ছিল না। তাঁর করুণায় কঠিন কঠিন সব বাধা অপসারিত হয়ে গেছে। যেমন প্রধান প্রার্থনা কক্ষের জন্যে বিরাট বিরাট

অত্যন্ত ভারী কড়িকাঠ, ত্রিচিনপল্লীর কাছ থেকে ট্রেনে ক'রে পেন্নুকোণ্ডায় আনা হয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে বাকী ষোল মাইল ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়ে—যার সপ্তম মাইলে আবার বালুকাময় নদী পার হতে হবে—এগুলি কিভাবে আনা হবে? কোন লরীর পক্ষে, এই লম্বা লম্বা কাঠ বোঝাই ক'রে (যে কাঠ আবার লরীর পেছনে অনেকটা বেরিয়ে থাকবে) নবম মাইলে, গ্রামের ভেতরের একাধিক তীক্ষ্ণ বাঁক পার হ'য়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বুক্কাপট্টনমের পর তিন মাইল রাস্তাকে, ভদ্রতার খাতিরেই শুধু রাস্তা বলা চলে। তার পরেই তিন ফার্লং চওড়া চিত্রাবতী নদীর বালির চড়া। এছাড়া পথে কয়েকটি ভগ্নপ্রায় ব্রীজ এবং কয়েক জায়গায় পাঁকও রয়েছে। যদিও বা এসব বাধা পেরিয়ে কোনক্রমে মালগুলি এসে জায়গামত পৌছতে সক্ষম হয় এরপর উঁচু দেয়ালের ওপর সেগুলি তোলা হবে কি করে? ইঞ্জিনীয়াররা গ্রাম পর্যন্ত কড়িকাঠ আনার সব আশা ছেড়ে দিলেন এবং বাবাকে ব'ললেন ছাদ তৈরীর জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা নিতে।

একদিন গভীর রাতে, অনন্তপুরে, প্রধান ইঞ্জিনীয়ারের ঘুম ভেঙে গেল, তাঁর বাড়ীর সামনে যন্ত্রের বিকট আওয়াজ শুনে। অন্ধকারে উঁকি দিয়ে "তুঙ্গভদ্রা বাঁধ সংস্থার" একটি ক্রেনকে অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। ছুটতে ছুটতে তিনি পুট্টাপর্ত্তী গিয়ে বাবাকে ব'ললেন যে যদি ক্রেনটাকে কোনমতে চালু করা যায় তবে ওর মালিককে পেন্নুকোণ্ডায় যেতে রাজী করিয়ে কাঠগুলো আনার একটা উপায় হয়। বাবা সামান্য বিভূতি সৃষ্টি ক'রে ইঞ্জিনীয়ারের হাতে দিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ারটি অত্যন্ত ভক্তিভরে ক্রেনের ইঞ্জিনের ওপর সেই বিভূতি ছড়িয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে স্টার্ট দিতে ব'ললেন। দু'একবার ঘোঁত ঘোঁত করার পর ইঞ্জিন চালু হ'লো, চাকা ঘুরলো এবং যন্ত্রদানব এগোতে লাগলো কড়িকাঠের গাদার দিকে। দৈত্যের মত বাহু দিয়ে সেগুলি তুলে হেলতে দুলতে ক্রেনটি কোনক্রমে ভাঙাচোরা ব্রীজ পার হ'লো, গ্রামের বাঁকগুলো ঠিকমত পেরিয়ে গেল, ভাঙ্কাপেরুর পাঁকের জায়গা থেকে ট'লতে ট'লতে উদ্ধারলাভ ক'রলো এবং কর্ণাট-নাগ পল্লীর পাহাড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলো। এখানে পৌছবার পর ইঞ্জিনীয়ার ব'ললেন, ক্রেনের দম ফুরিয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে অত ভার নিয়ে বালির ওপর দিয়ে কিছুতেই

এগোতে পারবে না। তখন বাবা স্বয়ং ড্রাইভারের পাশে ক্রেনের ওপর উঠে বসলেন এবং নিজ হাতে ক্রেন চালিয়ে কাজের জায়গায় এসে পৌছলেন। অতঃপর সব কড়িকাঠগুলো ক্রেন থেকে একে একে খালাস করা হ'লো।

এই সাফল্যে ইঞ্জিনীয়ারের দল কিন্তু সন্তুষ্ট হ'লো না, বরং তাদের অসন্তুষ্টি আর একমাত্রা বেড়ে গেল। তারা প্রশ্ন তুললো, "কড়িকাঠগুলো মনুষ্যশক্তির সাহায্যে দেয়ালের ওপর তোলা যখন কিছুতেই সম্ভব না, তখন এত কষ্ট ক'রে কি লাভ?" মনুষ্যশক্তির অসাধ্য, বুঝলাম, কিন্তু ভুললে চলবে না, যেখানে ভগবানের ইচ্ছাশক্তি কাজ ক'রছে সেখানে উপায়ও নিশ্চয়ই আছে। তুঙ্গভদ্রা বাঁধে কর্মরত লোকজন আনা হ'লো, তারপর কড়িকাঠে দড়ি বেঁধে কপিকলের ভেতর দিয়ে তাকে ঢুকিয়ে শত শত ভক্ত সমস্বরে গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো, "জয় সাইরাম"। বাবা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। এই জয়ধ্বনি দিয়ে দড়িতে টান দেবার সাথে সাথে ভারী কড়িকাঠ যেন হাল্‌কা হ'য়ে ওপরে উঠে এলো এবং এইভাবে এক এক করে সবগুলো কাঠ ওপরে তোলা হ'লো, ঠিক ঠিক জায়গায় বসানো হ'লো এবং সব কাজ বাধাহীনভাবে চলতে লাগলো।

নিলয়মের প্রধান আকর্ষণীয় অংশ হ'লো এই ভজন হল। এর দু'ধারে দু'টি বেদী আছে। পশ্চিমধারের বেদীর ওপর শিরডি সাইবাবা এবং সত্য-সাইবাবার দু'টি পূর্ণাঙ্গ তৈলচিত্র রাখা। ছবি দু'টির মাঝখানে শিরডি সাইবাবার একটি রৌপ্যমূর্তি এবং তার নীচে সত্য সাইবাবার একটি ছোট প্রতিকৃতি। নামজপ এবং ধ্যানে সহায়ক হিসেবে এই ছবিগুলি রাখা হয়েছে। মন্দিরের মত এখানে নিয়মিত কোন পূজোর ব্যবস্থা নেই, শুধু সকালে এবং সায়ংকালে, দিনে দু'বার ক'রে, ভজন হয়। কোন বিশেষ পূজোর দিনে নির্দিষ্ট কোন বিধিমত পূজার্চনা বা আচার অনুষ্ঠান পালন ক'রতে হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এমনকি, শিরডি সাইবাবার মূর্তি রাখতে হবে বলেও কোন নিয়ম নেই। বিশাল হলঘরটি শুধুমাত্র প্রার্থনা এবং ভজনের জন্যই নির্দিষ্ট এবং এই হলের দেয়ালে বিভিন্ন অবতার, নানা ধর্মের মহাসাধক এবং মহর্ষিদের ছবি সাজানো আছে।

একতলার ঘরগুলি প্রধানতঃ বাসনপত্র এবং অন্যান্য জিনিষ রাখার জন্য

ব্যবহার করা হয়। যে সব ভক্তদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা বাবা মঞ্জুর করেন তাদের সাথে কথা বলার জন্য ছ'টি আলাদা ঘর আছে। বাবা দোতলায় থাকেন। দোতলায় একটি বড় বারান্দা আছে, সেখান থেকে বাবা নীচের অগণিত ভক্তকে প্রত্যহ দর্শন দেন। এই জায়গাতেই বাবা বিভিন্ন উৎসবের দিনে দিব্য ভাষণ দান করেন। বারান্দার ওপরকার ছাদের ঠিক মাঝখানে মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের মার্বেল পাথরের তৈরী একটি অপরূপ মূর্তি আছে। এই মূর্তির অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাদে উঠলে দেখা যাবে, ছাদের ঠিক মাঝখানে, রাস্তার মুখোমুখি, পতাকাদণ্ডের সামনে, একটি উঁচু বেদীর ওপর বাবার আবক্ষ মূর্তি। পতাকা উত্তোলনের দিন বাবা এই জায়গা থেকে তাঁর অভয় হস্তের ভঙ্গীমায় দাঁড়িয়ে নীচের প্রাঙ্গণস্থিত বিশাল জনতাকে আশীর্বাদ করেন। নিলয়মের ঠিক সামনের খোলা জায়গায় একটি বৃত্তের মধ্যে বাবা একটি প্রতীক চিহ্ন সৃষ্টি করেন। এই প্রতীক চিহ্নই পতাকার ওপর অঙ্কিত আছে।

সমকেন্দ্রিক কয়েকটি বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে একটি স্তম্ভ আছে—এটি যোগসাধনার প্রতীক হিসাবে স্থাপিত। এই স্তম্ভ আবার অনেকগুলি বলয় নিয়ে গঠিত। বলয়গুলি যোগসাধনার বিভিন্ন স্তরের পরিচায়ক। যোগসাধনা দ্বারা হৃদয়কমল প্রস্ফুটিত হয়, তাই সেই কমলের বিকশিত পাপড়িগুলির আকারে স্তম্ভের উপরিভাগ নির্মিত। ভক্তির চরম অবস্থায় হৃদয়পদ্ম বিকশিত হবার পরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই স্তম্ভের শীর্ষভাগ জ্ঞানাগ্নির প্রতীক বহন করছে। সমকেন্দ্রিক বৃত্তগুলির বাইরের দিক থেকে প্রথম ছ'টি বৃত্তের মধ্যবর্তী ভূমি বালুকাময়, অনাবৃত। এটি হলো কামনা বাসনার মরুভূমি—অনিত্য বস্তুর পেছনে বৃথা ছুটোছুটি করা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৃত্তের মধ্যবর্তী ভূমি এক-ধরনের গুল্মে ভর্তি—এই ছোট গাছের ঝাড় খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেয়ে ঘন ঝোপে পরিণত হয়, তাই মাঝে মাঝে কেটে ছেঁটে ছোট ক'রতে হয়। এইটি হ'লো ক্রোধের ভূমি, যে ক্রোধ নির্মূল করা ভীষণ কঠিন, কেটে ফেলার সাথে সাথে আবার গজিয়ে ওঠে। এরপর রক্তবর্ণ ছুটি ধাপ, একটি অপেক্ষা অপরটি সামান্ত উঁচু। এটি বিদ্বেষের বা ঘৃণার প্রতীক। সাধককে এই বিদ্বেষও জয় করতে হবে। ঈপ্সিত বস্তু না পাওয়ার ব্যর্থতায় মনে এক ধরনের ঘৃণার জন্ম হয়।

আর একপ্রকার বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় যখন অপরের কোন কার্যের দ্বারা মনে আঘাত লাগে। কামনা, ক্রোধ এবং বিদ্বেষ—এই তিন শত্রুকে পরাজিত ক'রলে দেখা যাবে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো একটি বৃত্তাকার ভূমি—যে শ্যামলিমায় নয়ন জুড়িয়ে যায়—সন্তোষ ও সাফল্যে মন ভরে ওঠে—এই ভূমি ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতীক। এই সেই ভূমি যেখানে পৌঁছলে সাধকের মন ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়, কারণ পূর্বেই তার মন কামনা, ক্রোধ এবং বিদ্বেষমুক্ত এবং সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়েছে—দিব্য প্রেমের যেটা মূল ভিত্তি। সবুজ ঘাসের পর বসার জন্য কিছুটা খোলা জায়গা—প্রশান্তির মুক্তক্ষেত্র। সাধক এখানে যতক্ষণ খুসি অবস্থান ক'রে সাধনালব্ধ ফল উপভোগ ক'রতে পারেন। এইসব সাধনায় সফল হয়ে সাধক একটার পর একটা স্তর ভেদ ক'রে উচ্চে আরোহণ করেন যতক্ষণ না হৃদয়কমল বিকশিত হয় এবং সবশেষে দিব্যজ্যোতি দর্শন হয়। বৃত্তের পরিধিতে ফুলের গাছসহ আটটি রঙীন টব সাজানো আছে। বাবা বলেন এই টবগুলি আটটি সিদ্ধির প্রতীক যারা প্রহরী হয়ে যোগীকে রক্ষা করে।

'প্রশান্তি পতাকা' উত্তোলন অনুষ্ঠানে ভাষণ দান কালে বাবা সাধারণতঃ এই বৃত্ত এবং পদ্মের মর্মার্থ এবং পতাকার মধ্যে সেই প্রতীক গ্রহণ করবার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। তিনি ভক্তবৃন্দকে উপদেশ এবং আদেশ দিয়ে বলেন যে তারা যেন নিজেদের মনের মধ্যে এই পতাকা চিরউড্ডীন রাখে এবং এই পতাকার অন্তর্নিহিত ভাব সর্বক্ষণ ধ্যান করে। ভজন হলে প্রবেশ পথে তিনটি তোরণ দ্বারের গভীর অর্থও বাবা ব্যাখ্যা ক'রেছেন। আশ্রম এলাকায় প্রবেশের সর্বপ্রথম যে তোরণটি চোখে পড়ে তার ওপরে লেখা আছে—'প্রশান্তি-নিলয়ম'। এই তোরণটি তমোগুণের প্রতীক। এটি অতিক্রম ক'রে ভেতরের খোলা জায়গায় প্রবেশ করা যায়। সাধকের লক্ষ্য ঈশ্বর সন্দর্শন। এই তীর্থযাত্রাপথে তমোগুণের তোরণ পার হবার অর্থ—তমসা, অজ্ঞানতা এবং নিষ্ক্রিয়তাকে জয় ক'রে এগিয়ে চলা। ঈশ্বর সান্নিধ্যে আগমনের পবিত্র চিন্তায় সাধকের মন পূর্ণ, তাই তার মন থেকে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হ'য়েছে—মন অন্ধকারে ডুবে থাকলে তো এই পবিত্র সীমানার ভেতরে প্রবেশ করার কৌতূহল পর্যন্ত সেই মনে জাগবে না। পরের তোরণ রজোগুণের প্রতীক। পদ্ম ও বৃত্তকে ঘিরে বাগানটি এখান থেকে শুরু হ'য়েছে। এখানে এসে, সুন্দর

অট্টালিকা, অত্যুজ্জ্বল আলোর সমারোহ, রঙীন আলোর ঝাড় এবং ঝোলানো ফুলের টব দেখে সাধক মুগ্ধ। এর অর্থ যাদের মধ্যে রাজসিক ভাব বিদ্যমান, তাদের মন এইসব আড়ম্বরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব ক'রবে। এর পরেই ভজন হলে প্রবেশ করবার দরজা এবং এইটি হ'লো সত্ত্বগুণের প্রতীক। একে অতিক্রম ক'রে সাধক এসে উপস্থিত হয় প্রশান্তি-নিলয়মের অভ্যন্তরে।

নিলয়মের সামনের উদ্যানটি যেন ভক্তদের আন্তরিক ভক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভক্তরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে, নিলয়মের পেছনের কুয়ো থেকে জল তুলে এবং সেই জল হাতে হাতে বহন ক'রে গাছের গোড়ায় ঢেলে ফুলের মুখে আনন্দ ফোটায়। এই বাগানকে বাবা একটি সত্যিকারের বোটানিকাল উদ্যানে পরিণত ক'রেছেন—দেশের নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফুলের গাছ এনে লাগিয়েছেন এবং যেসব গাছ এখানকার বিশেষ 'জলবায়ুতে সাধারণতঃ জন্মায় না, যেমন অস্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপ্টাস, সিলভার ওক, কমলালেবু এবং কফিগাছ—এগুলোও এই বাগানে আছে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে, ভোর সাড়ে চারটায়, ভজন হলে ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে প্রশান্তি-নিলয়ম্ জেগে ওঠে। এই সময় ভক্তরা ধ্যান ও নাম জপের জন্য প্রস্তুত হন। ৪-৪৫ মিনিটে আধ ঘণ্টাকাল স্থায়ী ওম্‌কারম্ শুরু হয়। এর পর সকাল ৬টা পর্যন্ত অবিরাম মানস জপ—নীরবে ভগবানের নাম স্মরণ। উপনিষদে ওঁ ধ্বনিকে ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক প্রতীক বলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। অ, উ এবং ম—এই তিনটি মাত্রার সমষ্টি ওম্। যেখানে কোন শব্দের অস্তিত্ব নেই সেই অখণ্ড নীরবতা থেকেও ওঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হয়। ধ্যানের এই স্তরে পৌঁছলে সাধক ব্রহ্মকে উপলব্ধি ক'রতে পারেন। কারণ ওম্‌কার মন্ত্রের ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করার অর্থ শুদ্ধাত্মাকে উপলব্ধি করা। জাগ্রতাবস্থায় আত্মা স্থূল দেহে যুক্ত এবং তমোগুণ প্রধান—এই অবস্থা 'অ' অক্ষর দ্বারা সূচিত। স্বপ্নাবস্থার আত্মা সূক্ষ্ম দেহে যুক্ত এবং রজোগুণ প্রধান—এই অবস্থার নির্দেশক 'উ' অক্ষর। সুষুপ্তাবস্থায় আত্মা সত্ত্বগুণ প্রধান—এই অবস্থার নির্দেশক 'ম' অক্ষর। জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থা বিলীন হয় সুষুপ্তাবস্থায়। আত্মার চতুর্থ অবস্থা ওম্‌কারের অ, উ, ম বিহীন মাত্রাশূন্য মাত্রা—এই অবস্থায় সাধক পরমাত্মার সাথে একাত্মতা বোধ করেন।

ওম্‌কারের নিগূঢ় তত্ত্ব বাবা প্রায়ই সাধারণ সভায় এবং ব্যক্তিগত সম্ভাষণের সময় ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। প্রতি ভজন অনুষ্ঠানের প্রথমে ও শেষে ওম্‌কার একাধিকবার উচ্চারিত হয়, কারণ ওম্‌কার ঈশ্বরের এক শ্রেষ্ঠ, অসাম্প্রদায়িক, সর্বগুণান্বিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রতীক।

সাধারণ অত্যাবশ্যক অংগ হিসেবে নাম জপের সাথে ধ্যানের ওপর বাবা বারংবার জোর দেন। প্রত্যেক আগ্রহী ভক্তকে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত নির্দেশ এবং উপদেশ দেন। সেই জন্য প্রশান্তি-নিলয়মে বহু ভক্ত আছেন যাঁরা প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ধরে নামস্মরণ এবং ধ্যান করেন। প্রশান্তি নিলয়মে অবস্থান কালে বাবা সারাক্ষণ ভক্তদের আশীর্বাদ এবং তাঁকে দর্শন, স্পর্শন এবং তাঁর সাথে সম্ভাষণের দুর্লভ সুযোগ দানে ব্যস্ত থাকেন। দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তি যে খাদ্য গ্রহণ করে তিনিও তদনুরূপ সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করেন। নিলয়মের ভক্তরা ভক্তিভরে সেই খাদ্য প্রস্তুত করে। মেঝের ওপর পাতা বিছানায় তিনি শয়ন করেন। হলের পশ্চিমে স্থাপিত একটি চেয়ারে সাধারণতঃ তিনি ভজনের সময় বসেন এবং ঘরের সকলকে দর্শন দেন। ভজনের সময় যখনই তিনি নীচে নেমে আসেন, সকলকেই তাঁর শ্রীপাদস্পর্শের অনুমতি দেন।

বেদমন্ত্রের উদাত্তকণ্ঠের আবৃত্তিতে নিলয়মের সকালের প্রহরগুলি মন্দ্রিত হয়। ভজন হলে শিবলিঙ্গের অভিষেক এবং ভগবানের সহস্রনাম পাঠসহ পূজার সময়ও এই বেদমন্ত্র আবৃত্তি করা হয়। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে এই উদ্দেশ্যেই চিত্রাবতীর বালুচর থেকে এই বিশেষ শিবলিঙ্গটি বাবা সৃষ্টি করে-ছিলেন। বছরের অধিকাংশ সময় সন্ধ্যাবেলা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা ক'রে শোনান।

প্রশান্তি-নিলয়মে আগত প্রত্যেকেই পুট্টাপর্তী ত্যাগ করার পূর্বে বাবার সংগে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের (ইণ্টারভিউ) দুর্লভ সুযোগ লাভ করে—একা এলে এককভাবে, সপরিবারে এলে একত্রে। সম্ভবতঃ অন্য কোন অবতার মানুষের ওপর এমন অজস্র কৃপা বর্ষণ করেননি। বাবা হলেন দৈব চিকিৎসক। সাক্ষাৎপ্রার্থীর চরিত্রে বা আচরণে কোন দোষত্রুটি থাকলে বাবার চোখে তা ধরা পড়বেই। বাবা গভীর সহানুভূতির সাথে তার মন্দ ভাগ্যের কারণ নির্ণয়

করেন এবং তাঁর অপার করুণার স্নিগ্ধ প্রলেপে তাকে ভাল ক'রে তোলেন। প্রশান্তি-নিলয়মের এই বিখ্যাত ইণ্টারভিউ—কক্ষটির ভেতরে, ভক্তদের দেহের ও মনের রোগ নিরাময়ের অসংখ্য কাহিনী ইতিহাস হয়ে আছে। এই ছোট্ট পবিত্র ঘরে বাবার সান্নিধ্যে এসে কত মানুষের আমূল পরিবর্তন হয়েছে, কত লোকের মনে বিশ্বাসের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে, আস্থাহীন ব্যক্তির মনে আস্থা দৃঢ় হয়েছে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ভাল হয়ে গেছে, রাগী লোকের মেজাজ বদলে গেছে, বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি বিদ্বেষ বর্জন করেছে, দুঃখে নিমগ্ন কত মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং কত বিচ্ছিন্ন হৃদয়ের পুনর্মিলন হয়েছে—এ সংখ্যার শেষ নেই। বাবার সাথে ইণ্টারভিউ শেষ ক'রে কোন ব্যক্তিকে শুকনো চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে খুব কম দেখা যায়। সাহস, বিশ্বাস, আশা, নিশ্চয়তা, সন্তোষ এবং সান্ত্বনা দিয়ে বাবা প্রত্যেকের মন ভরিয়ে তোলেন। তিনি বলেন, "আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্পণ করো। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। তোমাকে রক্ষার সব ভার আমার।"

প্রার্থনা কক্ষে ভজনের সময় মন উচ্চভাবে ভরে যায়, কারণ তখনকার পরিবেশ হয় ভাবগম্ভীর, ভক্তিরসাপ্লুত। সাধারণতঃ বাবা স্বয়ং ভজনের সময় উপস্থিত থাকেন। কদাচিৎ, তাঁর ইচ্ছা হ'লে, তিনি ভক্তদের সাথে বসেন এবং মনোরম ভঙ্গীতে, ভজন গাইবার বিভিন্ন প্রণালী তাদের শেখান।

বাবা বলেন, "পিতা পি. এইচ. ডি. (Ph. D.) হ'লেও ছেলের অক্ষর পরিচয় করানোর সময় তাকেও শ্লেট পেন্‌সিল নিয়ে নিজের হাতে অ, আ, ক, খ লিখতে হয়। তাই বলে কি কেউ ধরে নেবে যে তিনি নিজেই অ, আ, ক, খ শিখছেন।" সব ভজন কিন্তু সত্য সাইবাবা অথবা তাঁর পূর্ব শরীর শিরডি সাইবাবা সম্পর্কে নয়। এই সব ভজনে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতি গাওয়া হয় এবং যুগ যুগ ধরে যত অবতার এসেছেন—তাঁরা যে সব সত্যের বাণী প্রচার করেছেন সেই সমুদয় ভাবও বিভিন্ন ভজনে নিহিত আছে। তেলেগু, তামিল, কানাড়া, হিন্দী, সংস্কৃত ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় এই ভজনগুলি গাওয়া হয়। গানগুলিতে আত্মনিবেদনের ভাব এবং ব্যাকুলতার ওপর জোর দেওয়া হয়। ভক্তরা সমবেত কণ্ঠে এবং সঠিক তালে ভজন পরিবেশন করেন। সাইবাবা

বলেন যে একসাথে, উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরেব নাম গান করলে অপরের সেবা করা হয়। গাছের ওপর থেকে কাকের দলকে হাততালি দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার সাথে তিনি ভজনের সময় তাল রাখতে যে করতালি দেওয়া হয়, তার তুলনা ক'রে বলেছেন, "ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ভজন গাইবার সময় জোরে জোরে করতালির সাহায্যে মনের ভেতরকার কামনা, বাসনা, বিদ্বেষরূপী বিরক্তিকর কাকের দলকে বিতাড়িত করা যায়।" তিনি সকলকে ঈশ্বরের নামকীর্তন করার জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁর মতে, যার কাছে যে নাম ভাল লাগে সেই নাম অন্য যে কোন নামের মতই সুন্দর ও সমান ফলদায়ক।

ভক্তদের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য বাবা স্বয়ং অনেক ভজন রচনা করেছেন। তেলেগু, কানাড়া বা তামিল ভাষায় সহজভাবে রচিত এই সব গানের মধ্যে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষকে আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হবে যাতে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। যেমন, একটি গানে মানুষকে ডেকে বলা হয়েছে সত্য, ধর্ম, শান্তি আর প্রেমকে নিত্যসঙ্গী ও পথপ্রদর্শক ক'রে মানুষ যেন জীবনের তীর্থ পরিক্রমায় কঠোর পরিশ্রম ক'রে এগিয়ে চলে। "উদ্যম নিয়ে কর্ম করা মানুষের কর্তব্য। সাফল্য বা পরাজয় নির্ভর করে ঈশ্বরের অনুগ্রহের ওপর। স্বয়ং ভগবান তোমার পাশে সব সময় সশরীরে উপস্থিত আছেন, এই কথা মনে রেখে তোমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে সেই কাজ প্রতিদিন করে যাও। অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়োনা, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে ফেলবে। জীবনের গহন অরণ্যে দৃঢ়ভাবে তাঁর নামকে ধরে থাকো, এতেই সব হবে। তোমার হৃদয় হলো চাষের জমি, ভালভাবে এই জমিতে চাষ করো। বিবেকের কষাঘাতে, তমঃ রজঃ সত্ত্ব এই তিন গুণরূপী বলদকে তোমার মনের লাঙ্গলে' জুড়ে হৃদয়ের এই জমিতে চাষ শুরু ক'রে দাও। নির্ভীকতা হলো উৎকৃষ্ট সার এবং ভগবানের প্রতি প্রেম হ'লো বীজ। বারিধারা হ'লো ভক্তি। উচ্ছ্বাস উত্তেজনা হলো আগাছা। ফসল হলো আত্মোপলব্ধি।" প্রশান্তি নিলয়মের ভজন সভা প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রাণ ভক্তদের সম্মিলন। ভক্তরা সোজাসুজি বাবার কাছ থেকে নির্দেশ এবং এইসব ভজনের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে নিজেদের মনের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পবিত্র হয়।

পূর্বে সাইবাবা ভক্তদের নিয়ে চিত্রাবতী নদীর বুকে বালির ওপর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গিয়ে বসতেন এবং সেখানে ভজন হতো তারাভরা আকাশের নীচে। চার পাশের পাহাড় যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ভজন শুনতো আর চিত্রাবতীর জল কুলু কুলু ধ্বনি তুলে সেই ভজনে সাড়া দিতো। এখনো বাবা মাঝে মাঝে এইরকমভাবে ভজন করেন। এইখানে বসে বাবা ভক্তদের নতুন নতুন ভজন শেখান, সেগুলো তাদের আত্মিক উন্নতির জন্যে তিনি স্বয়ং রচনা করেছেন। তাঁকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন করতে তিনি ভক্তদের উৎসাহিত করেন এবং তার উত্তর দিয়ে তাদের সংশয় দূর করেন।

একবার ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে সকাল সাড়ে ৯টার সময়, লেখক পুট্টাপর্ত্তী পৌঁছে দেখেন যে চারিদিকে বেশ খুসি খুসি ভাব। প্রশান্তি-নিলয়ম্ নির্মাণ তখনো শেষ হয়নি। প্রত্যেকের মুখে এক কথা, বাবা আজ সন্ধ্যায় নদীর ধারে যাবেন। সময়মত এসে পৌঁছনোতে লেখকের ভাগ্যে অনেক ধন্যবাদ জুটে গেল। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাবা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং একদল ভক্তের পুরোভাগে ক্ষিপ্রপদে চলতে লাগলেন—তাঁর দিব্য সান্নিধ্যের আনন্দ চারিদিকে ছড়াতে ছড়াতে এবং আমোদ, কৌতুক আর কুশল জিজ্ঞেস করতে করতে।

চিত্রাবতী নদী বছরের এই সময় শীর্ণ হয়ে যায়। সেই শীর্ণ জলধারা পার হয়ে বাবা বালির ওপর বসার জন্য একটি পরিষ্কার শুকনো জায়গা খুঁজতে লাগলেন। প্রায় দুশো গজ গিয়ে একটি পছন্দসই জায়গা পাওয়া গেল এবং সবাই সেখানে, মন্দিরে যেমনভাবে বসা হয়—একদিকে পুরুষ ও আর একদিকে মহিলা—সেইভাবে তাঁকে ফিরে বসে পড়লো। যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃদ্ধ এবং দুর্বল ভক্তরা এসে পৌঁছলেন, এবং আরাম করে বসলেন, ততক্ষণ বাবা শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এরপর শুরু হলো ধর্মালোচনা। এজন ভক্ত প্রশ্ন বরলেন, 'মোক্ষলাভের জন্য কি কর্ম ত্যাগ করতে হবে?' এর উত্তরে বাবা সরল এবং মধুর ব্যাখ্যা সহযোগে বললেন যে, সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করার মনোভাব নিয়ে যদি কর্ম করা হয় তবে ফল ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দূব হয় এবং আসক্তির বাঁধন

আলগা হয়ে আসে—যে আসক্তি থেকে আসে দুঃখ এবং পুনর্জন্ম। নিষ্ক্রিয় ভক্তি—বা কর্মবিহীন প্রেম, যে কর্মের মাধ্যমে ভক্তি বা প্রেম প্রকাশিত হয়—এ যেন দেয়ালহীন ঘর। আবার ভক্তিশূন্য কর্ম যেন শুধু দেয়াল, ভেতরে ঘর নেই। বাবা আরও বলেছিলেন 'আমি সর্বজনের সেবক। তোমরা আমাকে যে কোন নামেই ডাকো না কেন, আমার সাড়া পাবে, কারণ সব নাম তো আমারই নাম। কিংবা আমার কোন বিশেষ নামই নেই। তোমরা আমাকে যদি ত্যাগও করো, আমি কিন্তু তোমাদের সাথে থাকবো। আমার দৃষ্টিতে নাস্তিক বলে কেউ নেই। ঈশ্বরকে সবাই বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং ঈশ্বরের জন্যই সবাই বেঁচে আছে। সূর্যকে অস্বীকার করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায় না।'

এই ভাষণের পর, বাবা কয়েকটি ভজন শেখালেন। তারপর এক ভক্তের একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। বাবার পূর্বদেহ শিরডি সাইবাবার প্রসঙ্গে। শিরডি সাইবাবার যেসব প্রতিকৃতি সচরাচর দেখা যায় বাবা উপহাসচ্ছলে বললেন সেগুলি তাঁর আসল চেহারার ব্যঙ্গচিত্র। এই কথার পর তিনি শিরডি বাবার প্রকৃত চেহারার বর্ণনা দিলেন। বাবা যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন তাঁর আঙুলগুলো বালির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতে সৃষ্টি হলো একটি সুন্দর ছবি। সবাইকে ছবিটি দেখিয়ে বললেন যে এই ছবিটিই শিরডি বাবার প্রামাণ্য প্রতিকৃতি। উপস্থিত এক ভক্তকে তিনি ছবিটি দান করলেন। আলোচনা স্বভাবতই মোড় নিল দত্তাত্রেয় প্রসঙ্গে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তিন মস্তকবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ দেবতা দত্তাত্রেয়ই যে সাইবাবারূপে অবতীর্ণ হয়েছেন ভক্তরা একথা বলায় বাবা পুনরায় বালির ভেতর হাত ঢোকালেন এবং দত্তাত্রেয়র ধাতুনির্মিত একটি অপরূপ মূর্তি তাঁর হাতে সৃষ্টি হলো। উত্তেজনার আনন্দে সবাই বাবার আরো কাছে সরে এলো। প্রত্যেকে তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে আনন্দিত চিত্তে প্রত্যাবর্তন করুক বাবার মনে এই ইচ্ছা জাগলো। সুতরাং তিনি বালির ভেতর থেকে একটি মিছরির থালা সৃষ্টি করে, সেটা ভেঙ্গে এক টুকরো স্বহস্তে উপস্থিত প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে বিতরণ করলেন (তিনি বললেন অন্য কেউ ভাগ করলে সকলের কুলোতো না)। তারপর একমুঠো বালি নিয়ে তিনি

একটি প্লেটে ঢালতেই, তা বিভূতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এই বিভূতিও তিনি সবাইকে বিতরণ করলেন।

খোলা জায়গায় ভজন এবং ধর্মালোচনা বাবার এত প্রিয় যে ধারে কাছে নদী বা সমুদ্র থাকলে, তিনি ভক্তদের নিয়ে সেখানে চলে যান। তিনি এই প্রকার ভজন এবং ধর্মশিক্ষার আসরের আয়োজন করেছেন গোদাবরী, কৈবল্য, স্বর্ণমুখী, বৈগাই, গঙ্গা, ঝিলাম, যমুনা ইত্যাদি অনেক নদীর তীরে। মাদ্রাজ, ট্রাঙ্কুভার, মসুলিপট্টম, কন্যাকুমারী এবং কোভালামের সমুদ্রতীরেও তিনি ভক্তদের নিয়ে বসেছেন এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে বালিকে পরিণত করেছেন ছবি, মূর্তি, বিভূতি, বা তাঁর সংকল্পিত অন্য যে কোন বস্তুতে।

সাধারণতঃ বাবা ভক্তদের নদীচরে নিয়ে যান উৎসবের দিন। জন্মাষ্টমী বা তার আগের দিন; বাবা নদীচরে গিয়ে বালির মধ্যে থেকে যে কৃষ্ণমূর্তি সৃষ্টি করেন, সেই কৃষ্ণমূর্তি জন্মাষ্টমীর দিন ভজন হলে রাখা হয়। পরে কোন ভক্তকে তার বাড়ীতে নিত্য পূজোর জন্য মূর্তিটি দান করা হয়। সেইরকম, রামনবমী বা তার আগের দিন নদী বা সমুদ্রের ধার থেকে—এটা নির্ভর করে তাঁর স্থান বিশেষে অবস্থানের ওপর,—তিনি সৃষ্টি করেন রাম মূর্তি। কালাহস্তীর কাছে স্বর্ণমুখী নদীতীর থেকে তিনি স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় আকারের এই ধরনের সব মূর্তি সৃষ্টি করেছিলেন। সেগুলি বর্তমানে ভেঙ্কটগিরির মন্দিরে নিত্য পূজার জন্য রাখা আছে। বৈকুণ্ঠ একাদশীর দিন সন্ধ্যাবেলা বহু বছর ধরে কোন নদীচরে বা সমুদ্রতীরে, ভজন বা ধর্মালোচনা চলাকালীন, বাবা নিয়মিতভাবে অমৃত সৃষ্টি ক'রে ভক্তদের বিতরণ ক'রে আসছেন। ১৯৫৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর, বাবা কেরালা পরিভ্রমণকালে ত্রিবান্দ্রম থেকে ৭ মাইল দূরে কোবালম-এর সমুদ্রতীরে ভক্তদের নিয়ে যান। সমুদ্র-স্নান ক'রবার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে মাইলখানেক দূরে একটি নিরিবিলি স্থানে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে বসে বাবা প্রথমে কয়েকটি ভজন গাইলেন। তারপর সাধারণ ভজন অনুষ্ঠিত হ'লো। ভজনের মধ্যে বালির ভেতর থেকে বাবা চন্দনকাঠের একটি অনিন্দ্যসুন্দর বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্তি সৃষ্টি ক'রলেন। কয়েক মিনিট পর একটি সোনার আংটি সৃষ্টি ক'রলেন, এর ওপর কৃষ্ণমূর্তি

খোদাই করা রয়েছে। সকলে অমৃতের প্রত্যাশায় রুদ্ধশ্বাসে সময় গুণছে। বাবা তাদের নিরাশ করেননি। কারণ ভজন চলাকালীন, রাত্রির শান্ত বাতাসের ভেতর দিয়ে, তাদের নাকে অমৃতের অপার্থিব সুমিষ্ট সৌরভ ভেসে এলো, এ সৌরভ কোথা থেকে আসছে কেউ বুঝতে পারলো না। ভজনে হাত দিয়ে তাল দেবার সময় বাবার করকমল ভিজে ভিজে মনে হ'লো, যেন সিরাপ ঢালা হয়েছে হাতে। তখন সবাই বুঝলো যে দিব্য ঘ্রাণের উৎস ঐ করকমল। বাবা হাত দুটি অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে একটি রৌপ্য পাত্রের ওপর ধরলেন এবং ঘন অমৃতধারা তাঁর হাত থেকে নির্গত হ'য়ে পাত্রটিতে পড়তে লাগলো। তিনি স্বহস্তে প্রত্যেককে সেই অমৃত বিতরণ ক'রলেন। কয়েকটি জেলে ভজন শুনতে এসেছিল, তারাও এই অমৃত-প্রসাদ গ্রহণে বঞ্চিত হ'লো না। অমৃতের স্বাদ এবং ঘ্রাণ বর্ণনার অতীত এবং উপস্থিত ভক্তদের অভিজ্ঞতারও অতীত।

তেলুগু নববর্ষের দিন, বাবা সাধারণতঃ চিরাচরিত প্রথামত তিক্ত-মধুর নিম রস বিতরণ করেন। পোঙ্গল উৎসবের দিন প্রশান্তি-নিলয়মের গবাদি পশুকে সুসজ্জিত ক'রে শোভাযাত্রা বের করা হয়। আখ মাড়াইয়ের মরশুম শুরু হ'লে গ্রামবাসীরা মন্দিরে পূজো দিতে আসে। প্রশান্তি-নিলয়মের অভ্যন্তরে, বাবার সম্মুখে উপনয়ন, বিবাহ বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি পেলে ভক্তরা ভীষণ আনন্দিত হন। ভজন হলের পূর্বদিকের বেদী সাধারণতঃ এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়।

দীপাবলীর দিন বাবা বাজী পোড়ানোতে আনন্দ পান। নিলয়মের ভক্তদের ছেলেমেয়েদের এবং গ্রামের ছেলেমেয়েদের তিনি স্বহস্তে বাজী ও রঙ্গিন দেশলাই উপহার দেন। :লা জানুয়ারী ভাগ্যবান ভক্তদের কাছে তিনি নববর্ষের উপদেশ ও আশ্বাসের বাণী প্রেরণ করেন। তাঁর নিজের জন্মদিনেও তিনি প্রায়ই ভক্তদের আশীর্বাদ পাঠান।

পুট্টাপর্তীতে প্রতি বৎসর তিনটি উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষে দূর দূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎসবগুলি হ'লো দশেরা, মহাশিবরাত্রি এবং বাবার জন্মদিন। বাবার জন্মদিন প্রতি বছর ২৩শে নভেম্বর পালন করা হয়।

অবতারত্ব ঘোষণার সময় থেকে দশেরা উৎসব পালিত হ'য়ে আসছে। প্রথম দিকে প্রতিদিন পূজা ও ভজন হ'তো এবং বাবাকে আংটি, নেকলেস, মুকুট ইত্যাদি নানাবিধ অলংকারে ভূষিত ক'রে প্রতিদিন নতুনভাবে সজ্জিত শিবিকায় বসিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে বহন করা হ'তো। উৎসবের পরিসমাপ্তি হ'তো বিজয়াদশমীর দিন। কয়েক বছরের মধ্যে বাবা মাতৃপূজার ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই থেকে উৎসবের চেহারাও নতুন রূপ গ্রহণ করে। এই মাতৃপূজার অংগ হিসেবে নতুন সংযোজন হ'লো—মহিলা ভক্তদের দ্বারা দিনে দুবার পূজা এবং সঙ্গীত, কবিতা, নাটক ইত্যাদির অনুষ্ঠান।

এই উৎসব উপলক্ষে মুদ্রিত এবং ভক্তদের কাছে প্রেরিত প্রোগ্রামে চোখ বুলোলে এই উৎসব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ—১৯৫৮ সালের দশেরা উৎসব শুরু হয় সকালে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। ভক্তবৃন্দ পবিত্র চিত্তে নীরবে পদ্মচক্র ঘিরে সমবেত হন এবং ঘণ্টা ধ্বনির মাধ্য বাবা পতাকা উত্তোলন করেন। নিলয়মের সামনে এবং পতাকার গায়ে যে পদ্মের প্রতীক আছে তার মর্মার্থ বাবা বহু ভাষণে উল্লেখ করেছেন। দ্বিপ্রহরে মহিলা ভক্তদের দ্বারা পূজা আরম্ভ হয়। এই পূজা প্রতিদিন দুবার করে দশ দিন ধরে চলে। দ্বিতীয় দিন ভক্তদের সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের জন্য নির্দিষ্ট—এই দিন নিলয়মের সামনের রাস্তা এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য নির্দিষ্ট স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। সন্ধ্যাবেলা সাইবাবা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ সমাজ-সেবকদের ভাষণ শোনেন ভক্তেরা—এই ভাষণে ভক্তিপূর্ণ মন নিয়ে সেবাকর্ম সম্পাদন করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলা হয়। তৃতীয় দিন, শিশুদিবস। এইদিন শিশুদের খেলাধূলা, রকমারী পোষাকে সাজসজ্জা করা, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদি হয়। বাবা তাঁর আদর ভালবাসা দিয়ে প্রতিটি শিশুকে আনন্দে

মাতিয়ে রাখেন, পাঠ ভুলে গেলে তাদের মুখে কথা ধরিয়ে দেন, স্নেহ দিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন। অংশগ্রহণকারীরা প্রতিটি বালক বাবার কাছ থেকে উপহার লাভ করে এবং এগুলি সেই পরিবারের গর্বের বস্তু হয়। চতুর্থ দিন—বাবার উপস্থিতিতে কবি সম্মিলন। সব জায়গা থেকে কবিরা আসেন এবং তেলুগু, তামিল, সংস্কৃত, কানাড়া এবং ইংরেজী ভাষায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এঁরাও পুরস্কার গ্রহণ করে নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন। এই পুরস্কারগুলির মূল্য অসীম, এই কারণে যে যিনি কৃপা করে স্বহস্তে এই উপহার দিচ্ছেন সেই বাবা স্বয়ং কবিশ্রেষ্ঠ। দশেরা উৎসবের মধ্যে বাবা দুদিন কি তিন দিন তাঁর অমৃত ভাষণ দিয়ে ভক্তদের আশীর্বাদ করেন। হাজার হাজার ভক্ত এই আশীর্বচন মাথায় করে নিজের নিজের গৃহে ফিরে যান দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকবার নতুন প্রেরণা নিয়ে। ষষ্ঠ এবং অষ্টম দিবস ভজনের জন্ম নির্দিষ্ট। সপ্তম দিবসে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয় এবং অনাথ ও পঙ্গুদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। একজন বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল—"আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই রকম এতবড় একটা অনুষ্ঠানের খবর,—যেখানে ৪/৫ হাজার লোককে ধুতি-শাড়ী বিতরণ করা হয়—কোন সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পায় না কেন?" বাবার উত্তর ছিল "ছাপা হলেই বরং আশ্চর্য্যের ব্যাপার হতো। তোমার নিকট আত্মীয়স্বজন তোমার বাড়ীতে এলে তুমি যখন তাদের খাওয়াও তখন কি তুমি এ খবর কাগজে বের করার জন্যে প্রেসের লোকজন ডেকে আনো?"

দরিদ্রনারায়ণ সেবার দিন বাবার কাছে সবচাইতে খুশির দিন এবং ব্যস্ততম দিনও বলা চলে। রান্না থেকে শুরু করে বসার জায়গার ব্যবস্থা পর্যন্ত সব তিনি নিজে তদারক করেন। প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির পাতে তিনি স্বহস্তে নীচু হয়ে পরিবেশন করেন। দরিদ্রনারায়ণদের

সারির ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যেসব দুঃস্থ বস্ত্র পাবার অধিকারী তাদের তিনি নিজে বাছাই করেন। এদের হাতে প্রথমে টিকিট দেওয়া হয় এবং পরে নাম ডাকা হয়। এক এক করে তারা উঠে আসে এবং বাবার হাত থেকে বহু আকাঙ্ক্ষিত দান গ্রহণ করে ধন্য হয়। বস্ত্রদানের এই অপূর্ব দৃশ্য দেখলে মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়। প্রত্যেকের সাথে বাবা মিষ্টি করে কথা বলেন। অন্ধ, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ এবং অসমর্থদের প্রতি বাবা বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন এবং এদের হাত ধরে সাহায্য করতে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ দেন। অন্ধকারে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে তাদের উপদেশ দেন এবং অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে এদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। বাবার কৃপায় এই মুহূর্তগুলি প্রত্যেকের জীবনে অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে।

একবার দশেরার সময় প্রথম ৩/৪ দিন খুব বৃষ্টি হওয়ায় প্রশান্তিনিলয়মের প্রধান তোরণের সাজ-সজ্জা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাবা বললেন যে দরিদ্র-নারায়ণ সেবার আগেই যেন এগুলি পুনর্সজ্জিত করা হয়, কারণ "দরিদ্রনারায়ণ আমাদের মহামান্য অতিথি। এঁদের আগমনের সময় মন্দির যেন সাজ-সজ্জায় আনন্দে ভরপুর থাকে।" দরিদ্রনারায়ণের প্রতি এইরূপ মনোভাব গ্রহণ করবার জন্য তিনি ভক্তদের শিক্ষা দেন।

দশেরা উৎসবের অন্য দিনগুলিতে আবৃত্তি, কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত এবং অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠান হয়। উৎসবে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পেয়ে বাবার আশীর্বাদ লাভ করার জন্যে সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। বাবা স্বয়ং সঙ্গীতবিদ্যায় মহাপারদর্শী। তাঁর মনোরম ভঙ্গীর সঙ্গীত শুনলে মুগ্ধ হতে হয়।

বিজয়া দশমীর দিন, শিরডি সাইবাবার রৌপ্যমূর্তির অভিষেক হয়। এইদিন বাবা সাধারণত একটি রত্ন সৃষ্টি করেন এবং অভিষেকের পূর্বে

মূর্তির ললাটে সেই রত্ন স্থাপন করেন।

তামিল ভাষায় মহাদেবের অপর একটি নাম আছে, তার অর্থ "যিনি মাতৃরূপও ধারণ করেছিলেন।" কিংবদন্তী আছে—একবার একটি রমণীর প্রসববেদনা উপস্থিত হলে, বন্যার ফলে কাবেরী নদীতে প্লাবনের জন্য অপর তীর থেকে সময়মত ধাত্রী এসে পৌছতে পারেনি। তখন স্বয়ং শিব ধাত্রীরূপ ধারণ করে প্রসূতির শয্যাপার্শ্বে ঠিক সময়ে উপস্থিত হন এবং প্রসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সাইবাবা অসংখ্যবার মাতৃরূপ ধারণ করেছেন, নিজদেহে প্রসববেদনা গ্রহণ করেছেন এবং স্থূল দেহ ত্যাগ করে প্রসূতির শয্যাপার্শ্বে ধাত্রীরূপে উপস্থিত হয়েছেন। বহু দূরবর্তী স্থানের প্রসূতি বাবার এইরূপ দিব্য উপস্থিতি অনুভব করেছে এবং পুট্টাপর্তীতে বসে বাবা প্রকাশ করেছেন বেদনাহীন প্রসবের জন্য তিনি গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান ঠিক করে দিয়ে এসেছেন।

একটি মহিলার শিশু ভূমিষ্ঠ হবার ৬ দিন পর হাসপাতালে মারা যায়, কারণ নাড়ী ঠিকমত কাটা হয়নি। ক্ষত বিষাক্ত হয়ে ওঠায় গর্ভফুল মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে প্রসূতির অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠলো। তাকে বাঁচাবার সব আশা পরিত্যাগ হলো। ভক্তের এই সমূহ বিপদে ঘটনাস্থল থেকে ২৫০ মাইল দূরে পুট্টাপর্তীতে বাবা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে একঘণ্টা বাইরে রইলেন। এদিকে হাসপাতালে গর্ভফুল মুক্ত হলো, জর নেমে গেল এবং প্রসূতির অবস্থা ভালর দিকে ফিরলো। নিজদেহে ফিরে এসে বাবা জানালেন, তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং রোগিনীকে তাঁর অভয়হস্তের দিব্যদর্শন দিয়ে এসেছেন। তিনদিন পর রোগিনীর কাছ থেকে বাবার দিব্যদর্শনের বর্ণনা এবং আরোগ্যলাভের সংবাদ বহন করে চিঠি এসে পৌছল।

১৯৫০ সালে, লক্ষ্মীপূজার দিন, ব্রতউদ্‌যাপনকারী মহিলাদের কাছ

থেকে বাবা পূজা এবং অর্ঘ গ্রহণ করেছিলেন। যে সব মহিলারা এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরা বলেন. যে বাবা, এক সমুজ্জল মাতৃ-মূর্তিতে তাঁদের দর্শন দেন এবং সত্যসত্যই বাবার পরণে শাড়ী ব্লাউজ ছিল এবং সর্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কারে তিনি ভূষিতা ছিলেন।

দশেরা উৎসবের দশদিন ব্যাপী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ললিতা এবং অন্যান্য দেবীর পূজায় যে হাজার হাজার মানুষ পুট্টাপর্ত্তী ছুটে আসে, এতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই ; কারণ স্বয়ং সাইমাতা যে সেখানে পরম কল্যাণময়ী, মহাবরদাত্রীরূপে বিরাজমানা।

মহাশিবরাত্রিও সমান গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। ভক্তরা বাবার দিব্য উপস্থিতিতে সারারাত জেগে ভজন করেন। তাঁর দিব্যসান্নিধ্য স্বয়ং মহাদেবের কথা তাদের মনে করিয়ে দেয়। বাবার কপাল, মুখ, হাত, পা থেকে সমানে বিভূতি নির্গত হতে থাকে এবং দোষত্রুটিময় মনুষ্য সমাজকে তিনি উদারভাবে বিভূতি দিয়ে মঙ্গলাশীর্বাদ করেন। ১৯৫০ সাল থেকে পুট্টাপর্ত্তীতে শিবরাত্রি উৎসব পালিত হয়ে আসছে কিন্তু অবতারত্ব ঘোষণার সময় থেকেই বাবার দেহের অভ্যন্তরে প্রতি বছর শিবলিঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছিল। বাবা বলেন যে তাঁর দেহের ভেতরে এই শিবলিঙ্গ সৃষ্টিকে বাধা দেওয়া বা স্থগিত রাখা, তাঁর কাছে সময় সময় অত্যন্ত দুরূহ বলে মনে হয়। শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যাবেলা ভজনের সময় বাবা দর্শন দেন এবং ঘণ্টাখানেক পর তাঁর অমৃত ভাষণ শুরু হয়। ভাষণ দেবার সময় তাঁর পেটের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক আক্ষেপসহ এমন প্রচণ্ড যন্ত্রণা হতে থাকে যে তাঁর ভাষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ সত্ত্বেও তিনি ভাষণদানে বিরত থাকেন না। কিন্তু তীব্র যন্ত্রণা এর পর দেহের ওপর দিকে উঠতে থাকে এবং যখন বুক ছাড়িয়ে গলার কাছে পৌঁছায় তখন বাবা আর ভাষণ দিতে পারেন না। এই সময় বাবাকে দেখে মনে হয়, তাঁর সমগ্র দেহের ওপর দিয়ে যেন

এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তারপর, অকস্মাৎ, হাজার হাজার ভক্তের আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্দীপনার মুহূর্তে বাবার শ্রীমুখ থেকে নির্গত হয় একাধিক শিবলিঙ্গ। প্রথমে শিরডি সাইবাবার মূর্তির ওপরে সাধারণত এই শিবলিঙ্গগুলি স্থাপন করা হয়। পরে উৎসব সমাপ্ত হলে কোন ভাগ্যবান ভক্তকে বাবা দান করেন বিধিমত পূজা করবার জন্যে। ষোল বছরের ওপর বাবার মুখনিঃসৃত এই শিবলিঙ্গগুলি নিষ্ঠাভরে পূজিত হয়ে আসছে। শিবলিঙ্গগুলি সংখ্যায়, আয়তনে এবং গঠনে কোন বছর কখনো একই প্রকার হয় না। কোন কোন বছর মাত্র একটিই নিঃসৃত হয় এবং এর উপাদান হয় কখনো স্ফটিক বা সোনা অথবা রূপা। কখনো একাধিক লিঙ্গ সৃষ্ট হয়—তিন, পাঁচ, সাত বা নয়টি। দৈর্ঘ্যে সাধারণত এক বা দেড় ইঞ্চি হয় এবং শিবলিঙ্গগুলি প্রতিটি গৌরীপট্ট সমেত থাকে। প্রত্যেক লিঙ্গের গায়ে বিভূতির প্রতীক হিসাবে তিনটি লম্বালম্বি দাগ থাকে। এই লিঙ্গ সৃষ্টি বাস্তবিকপক্ষে, দৈব সংকল্পের এক অপরূপ এবং অলৌকিক প্রকাশ।

দৈব সংকল্পের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে সেই সংকল্পের মূর্তরূপ স্বয়ং বাবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনে যেন কোন ভুল না হয়। বাবাই স্বয়ং 'প্রশান্তি-নিলয়ম'। যেখানেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, যে কোন স্থানে বসেই তাঁর নামস্মরণ, ভজন বা উপাসনা করা হোক না কেন সেই স্থানই 'প্রশান্তি-নিলয়ম'। মাদ্রাজে গোখেল হলে একবার বাবার ভাষণের পর এক ভক্ত সমবেত শ্রোতাদের পুট্টাপর্তী গিয়ে প্রশান্তি-নিলয়মের অপূর্ব ভজন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অনুরোধ করলে, বাবা সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংশোধন করে বলে উঠলেন "না, না। তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমিই তোমাদের কাছে আসবো। সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করার কোন প্রয়োজন নেই

তোমাদের। আমাকে ডাকলে আমি ঠিকই তোমাদের কাছে চলে আসবো।” মধ্যযুগের এক কানাড়া কবির গানে আছে—“ভগবান আমাদের কাছ থেকে ঠিক ততদূরেই আছেন যতদূরে আমাদের ডাক পৌঁছতে পারে।” তাঁর ওপর অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে সমানে ডেকে যাও। তিনি ঠিক সাড়া দিয়ে বলবেন “এই যে আমি এখানে।” তাঁর নানা নামের ভেতর থেকে যে কোন একটি বেছে নিয়ে সেই নামেই তাঁকে ডাকতে পারা যায়।

১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে নিলয়মের পেছনের পাহাড়ে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে পুরুষদের ও মহিলাদের জন্যে ৬টি করে শয্যা, অস্ত্রচিকিৎসা ও প্রসূতি-পরিচর্যার যাবতীয় উপকরণ এবং এক্স-রে সরঞ্জামযুক্ত পৃথক ঘর আছে। এ হাসপাতাল থেকে চারপাশের পাহাড়গুলির শোভা অতি অপরূপ লাগে, পাহাড়গুলি যেন ধাপে ধাপে নেমে একেবারে চিত্রাবতীর কোলে এসে মিলে গেছে। ইঞ্জিনিয়ারদের আপত্তি সত্ত্বেও বাবা এই স্থান নির্বাচন করেন। তিনি বলেছিলেন যে চোখের সামনে ঈশ্বরের অপরূপ সৃষ্টিলীলা দেখতে পেলে রোগীরা প্রেরণা পাবে। বুলডোজার আনিয়ে পাহাড়ের কঠিন ধারকে কেটে সমান করে বাবা তিনটি সমতল চাতাল নির্মাণ করেন এবং একেবারে ওপরের চাতালে হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবার সময় বাবা বলেছিলেন যে, কি ধনী কি দরিদ্র, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, ধার্মিক কি অধার্মিক—রোগ কাউকেই রেহাই দেয় না। কাছাকাছি কয়েক মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল না থাকায় এবং তার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বয়ং ভগবানকে মানুষের সেবা করতে দেখে, ভগবানের কৃপা পাবার জন্য যাতে মানুষের মনে সেবার প্রেরণা জেগে ওঠে—তারই দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি পুট্টাপর্তীতে হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। তিনি আরো বলেছিলেন, যেসব ব্যক্তি এই হাসপাতালে তাদের শরীরের ব্যাধি সারাতে আসবে তারা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশান্তি-নিলয়মের প্রতিও আকৃষ্ট হবে তাদের আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভের জন্য।

হাসপাতাল নির্মাণের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাবা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করেছেন। পাহাড়ের ঢালে ভক্তরা বাবার উপস্থিতিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এক হাত থেকে আর এক হাতে বহন করেছে পাথর, লোহা, ইট, জল, মশলা, কাদা ইত্যাদি—নির্মাণের যাবতীয় উপকরণ এবং এইভাবে বাবার কৃপায় ভক্তদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচল ভক্তি এবং অবিশ্রান্ত উৎসাহের ফলে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে মনোরম প্রাকৃতিক শোভার বুকে সুন্দর এই হাসপাতালটি। প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার যখন তাঁর ভাষণে বাবার কৃপায় অলৌকিক ভাবে আরোগ্যলাভের বহু ঘটনা বিবৃত করছিলেন, তখন বাবা বলেন যে প্রেম আর সেবার মনোভাবই আরোগ্যলাভের জন্য দায়ী যে মনোভাব এই ভবনের প্রতিটি ইট পাথরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় বাবা রোগীদের ওষুধ খেতে, ইন্‌জেক্‌সন নিতে বা অস্ত্রোপচারে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজী করান। তাঁর মিষ্টি কথা এবং রোগ নিরাময়কারী স্নিগ্ধ দৃষ্টির ফলে রুগী দ্রুত ভাল হয়ে ওঠে। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককেও তিনি অনেক কিছু শিক্ষা দেন, কারণ তিনি স্বয়ং মহাচিকিৎসক ও 'সার্জন'। জপ-ধ্যানের সাহায্যে দেহ-মনের শান্তি ও সুস্থতা বজায় রাখার সম্বন্ধে বাবা ব্যবহারিক শিক্ষা দেন এবং বলেন যে এই জপ-ধ্যান সমগ্র ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য ঠিক রাখে।

প্রশান্তি-নিলয়ম্ থেকে প্রকাশিত সনাতন সারথি পত্রিকায় রোগ সংক্রান্ত যে সব ঘটনার কথা প্রকাশিত হয় সেগুলি চিকিৎসা জগতের পক্ষে

এক অমূল্য সম্পদ। কারণ এইসব ঘটনায় জানা যায় দুরারোগ্য সব ব্যাধি কেমন করে বাবার অপার করুণায় ভাল হয়ে গেছে। কিছু একনিষ্ঠ ভক্ত আছেন যাঁরা তাঁদের শরীরকে বাবার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন। আবার কেউ আছেন যারা ভাল হবার জন্য বাবার নির্দেশানুযায়ী বিভূতি গ্রহণ করেন বা ওষুধপত্র খান। কারণ বাবা বলেন সবার জন্য একই চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি করেন না। একই ধরনের পেটব্যথার জন্য চারটি বিভিন্ন রুগীর ক্ষেত্রে ডাক্তার যেমন চার প্রকার ওষুধের ব্যবস্থা করেন, সেই রকম বাবাও বিভিন্ন রুগীর জন্য বিভিন্ন চিকিৎসার নির্দেশ দেন। বাস্তবিকই বাবা চিকিৎসক শিরোমণি।

প্রশান্তি-নিলয়মে বাম এবং দক্ষিণ দিকে উদ্যান এলাকার বাইরে কয়েকটি বাড়ী আছে, যেখানে ভক্তরা থাকেন। আবাসিকরা অন্যত্র গমন করলে, এই সব ঘর পুট্টাপর্তীতে আগত দর্শনার্থীরা ব্যবহার করতে থাকেন।

এখানকার প্রতিটি বিষয়ের পরিচালক বাবা স্বয়ং এবং ভক্তরাও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে।

মোটরযোগে ভ্রমণকালে প্রাতরাশ বা মধ্যাহ্ন আহারের জন্যে নিরিবিলি জায়গা সন্ধানের সময় বাবা এমন স্থান বেছে বেছে বের করেন, যেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব। যেমন নীলগিরি বা কোডাইকানাল পর্বতমালার সানুদেশে ইউক্যালিপটাসের বনের মধ্যে, কাশ্মীর উপত্যকায় দেবদারু সারির ভেতরে, বেলারীর রুক্ষ সমতল ভূমিতে, শ্রীরঙ্গপট্টমের শ্যামল প্রান্তরে, কেরালার সমুদ্রতীরবর্তী নারিকেল বাগানে, তিন্নেভেল্লীর তালবীথিকায়, সামালকোটের খালের ধারে অথবা রায়চুরের আগ্নেয় শিলাময় প্রান্তরে। অরুণোদয়ের সৌন্দর্য্য, অস্তাচলগামী সূর্য্যের শোভা, জ্যোৎস্নারাতে চন্দ্রমণ্ডলের আলো, আকাশের বুকে দল বেঁধে মেঘের খেলা—এইরকম সব দৃশ্য চোখে পড়লেই বাবা তৎক্ষণাৎ সেদিকে সঙ্গীদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তেলুগু কথা 'অন্দমে আনন্দম্' তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যায়। এর অর্থ 'সৌন্দর্যই আনন্দ'।

গবাদি গৃহপালিত পশুর প্রতি তাঁর অসীম মমতা। প্রশান্তি-নিলয়মের গোশালা আশপাশের গ্রামের কৃষকদের কাছে আদর্শস্বরূপ। গরুদের স্বহস্তে খাওয়ানো এবং পরিচর্যায় তিনি অনেক সময় ব্যয় করেন। এদের সাজাবার জন্যে তাঁর কাছে রকমারি চকচকে সব অলঙ্কার আছে। সে সব দিয়ে পোঙ্গল উৎসবের দিন এদের সুসজ্জিত করা হয়। ঘোড়া, হরিণ, ময়ূর ও খরগোসও তিনি কিছুকাল পুষেছিলেন। বাবার যত্ন আর আদরের স্পর্শ পেয়ে এরাও ধন্য হয়েছিল।

বাবার কাছে কয়েকটি পোষা কুকুরও ছিল। কুকুরদের কাহিনীর মধ্যে ভগবানের দয়ার এক সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম উটকামণ্ড থেকে জ্যাক আর জিল নামে দুটি পমেরেনিয়ান জাতের কুকুর আনা হয়েছিল। বাবা বলেন যে এই কুকুর দুটি প্রতি বৃহস্পতিবার কিছু খেতো না—মনে হতো যেন কোন ব্রতপালনের জন্যে উপবাস করছে। এদের হাজার চেষ্টা করেও মাংস খাওয়ানো যায়নি। জ্যাক ঘুমোতো বাবার বিছানার মাথার দিকে আর পায়ের দিকে জিল। বাবার সান্নিধ্যে তিন বছর কাটিয়ে জ্যাক বাবার কোলে মাথা রেখে প্রাণত্যাগ করে। তার জীবনের মত মরণের মুহূর্তেও সে বাবার পরম কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়নি। আগের দিন রাত্রে জ্যাক একটি মোটরের পেছন পেছন গিয়ে নিলয়ম্ থেকে বেশ কিছুটা দূরে নদীর ওপারে মোটরটিকে রাত্রির জন্যে রাখা হলে তার তলায় চুপচাপ শুয়ে থাকে। খালি মোটর গাড়ী রাত্রে নিজে থেকেই পাহারা দেওয়া তার একটা স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। তার গলার ডাক শুনলে গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা কাছে আসতে সাহস পেত না। এদিকে গাড়ীর আরোহীরা কিছুই জানে না যে গাড়ীর নীচে জ্যাক শুয়ে আছে। ভোরবেলায় গাড়ী

চালানোর সময় জ্যাক চাপা পড়ে এবং মারাত্মকভাবে জখম হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় সে অতিকষ্টে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নদী পার হয়ে নিলয়ম্ে পৌঁছেই বাবার কোলে লুটিয়ে পড়ে। বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এবং আনন্দে অতি ধীরে লেজ নাড়তে নাড়তে বাবার আশীর্বাদধন্য এই কুকুরটি স্বল্পকালের পার্থিব জীবন ত্যাগ করে। জিলও সঙ্গী হারিয়ে বেশীদিন বাঁচলো না—কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেও মারা গেল। এদের সমাধির ওপরে একটি তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। এরপর আরো কয়েকটি পমেরিয়ান কুকুর পোষা হয়েছিল—চিট্টি, বিট্টি, লিল্লি আর বিল্লি। তারপর এলো ককার স্প্যানিয়াল—মিন্নি, মিকি, হানি আর গোণ্ডি। বাবা এদের নিজের কাছে কিছুদিন রেখে ভক্তদের দিয়ে দেন। কিন্তু এখনও এদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেন। বাবা কয়েকটি এ্যালসেশিয়ান কুকুরও রেখেছিলেন—প্রথমে রোভার, রিটা পরে টমি ও হেনরি। এই মূক পশুরা বাবার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে আদর ভালবাসা লাভ করেছিল। পশুদের জগৎ আমাদের থেকে স্বতন্ত্র বলে আমাদের মধ্যে যাদের ধারণা, বাবার এই ভালবাসা থেকে তাদের এই শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য যে, খাদ্যের প্রয়োজনে বা মজা দেখার মনোবৃত্তি নিয়ে কখনও পশুদের ওপর নির্যাতন করা উচিত নয়, এবং সমগ্র প্রাণীজগৎ যে একই পরিবারভুক্ত সেকথা সর্বদা মনে রাখা উচিত।

বাবা বলেন যে যদি কোন পশু বা মানুষ তাঁর কৃপা লাভ করে থাকে তবে সেটা তার অদৃষ্ট বা প্রারব্ধের ফল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, তাঁর কৃপা অর্জন করা যায়, আধ্যাত্মিক সাধনা বা সংযমী জীবনযাপন দ্বারা, আত্মসংযম দ্বারা এবং সবাইকে নারায়ণ জ্ঞানে নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা। পরীক্ষক যেমন ছাত্রের উত্তরপত্র বিচার করে নম্বর দেন, ঠিক তেমন করে ভগবানও আমাদের কার্যাকার্যের মান নির্ধারণ করেন।

উত্তরপত্রের লেখার ভেতরে যদি এমন দেখা যায় যে, ছাত্রটি যথেষ্ট খেটে পড়া তৈরী করেছে বা বিষয়টির ওপর তার বেশ দখল আছে অথবা উত্তরের নিয়মকানুন সম্বন্ধে ভাল ধারণা আছে, কিন্তু ঠিকমত গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারেনি, তবে পরীক্ষকের পক্ষে ছেলেটির মান বিচারে কোন অসুবিধে হয় না।

এরকম ঘটনা কিছু ভক্তের জীবনে ঘটেছে যে সব ব্যবস্থা করেও, কোন অজ্ঞাত কারণে তারা শেষ পর্যন্ত পুট্টাপর্তী যেতে পারেনি। আবার এও দেখা গেছে যে যাবার ইচ্ছা মনে জাগামাত্র সবকিছু সহজ হয়ে গেছে। ছুটি, টাকাকড়ি, সঙ্গী সবকিছুর ব্যবস্থা অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে গেছে এবং সবরকম বাধা আপনাআপনি দূর হয়েছে। বাবা বলেন যে তাঁর কাছে পৌছানো তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাঁর ইচ্ছা না হলে কেউ পুট্টাপর্তী যাত্রাই করতে পারে না।

বাবার সঙ্গে, সেই ছোট্ট ঘরে, ইণ্টারভিউ-এর পর এই অভিজ্ঞতা নিয়েই প্রত্যেকে বেরিয়ে আসে যে বাবা সর্বান্তর্যামী এবং সর্বত্র বিদ্যমান। প্রত্যেকের নাড়ী-নক্ষত্র এবং ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান তাঁর নখদর্পণে। মনে করো, তুমি দশটি বিষয়ে বাবার পরামর্শ চাইবে বলে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলে, কিন্তু তুমি কিছু বলবার আগেই বাবা ঠিক সেই দশটি বিষয়ে তোমার সংশয় দূর তো করলেনই, এমনকি এর ওপরে আরো কিছু বলে তোমাকে নিশ্চিন্ত করলেন। তুমি যদি স্বপ্নে কখনো বাবার দর্শন পেয়ে থাকো এবং সেই সময় বাবার কিছু কথাও শুনে থাকো তবে ইণ্টারভিউ-এর সময় বাবা তোমাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত এবং তুমি তাঁর কাছে কি কথা শুনেছিলে অবিকল তা বলে দেবেন। তোমার জীবনের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ঘটনাসমেত সমগ্র ইতিহাস তিনি তোমার সামনে খুলে ধরবেন এবং যেখানে ছিল বেদনা, যেখানে ছিল দুর্বলতা সেখানে আনবেন আনন্দ,

সেখানে দেবেন শক্তি।

অধ্যক্ষ এইচ, এস, রাও বলেন "করুণা প্রদর্শনের ব্যাপারে বাবা কখনো ক্লান্ত হন না। বাবার উপদেশ শুধু সান্ত্বনাই দান করে না—আত্মচেতনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়—চরিত্রের চাপাপড়া সদ্‌গুণ প্রকাশিত হয়, হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। তাঁর করুণায় সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করে, দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে তার সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের দোষ নিজের চোখেই ধরা পড়ে। মমতা মাখা চোখে পিঠে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে সহজ সরল ভাষায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে তিনি তোমার মধ্যে এই পরিবর্তনের ঢেউ জাগিয়ে তোলেন। তাঁর উচ্চারিত বাক্যের প্রবল শক্তি, প্রত্যয়ের দৃঢ়তা এবং গভীরতার পরিচয় পেয়ে তুমি নির্বাক হয়ে যাবে। যখন তুমি দেখবে যে তোমার একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা এবং প্রয়োজন তাঁর অজানা নয়, তখন অবাক বিস্ময়ে তুমি মনে করবে যে সাক্ষাৎ ভগবানের সামনে বসে আছি।"

এইভাবে প্রশান্তি-নিলয়মে বাবার শিক্ষায় এবং তাঁর উপস্থিতিতে মানবজাতি নবরূপে রূপায়িত হয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

কন্যাকুমারিকা থেকে খিলান-মার্গ

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভেঙ্কটগিরিতে সর্বভারতীয় দিব্যজীবন সম্মিলনের নবম অধিবেশন, ভগবানের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে এক বিখ্যাত ঘটনা। বাবা এই সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক নবজীবন লাভের জন্যে। দিব্যজীবন সমিতির শাখাসমূহের সাংগঠনিক সম্পাদক স্বামী সচ্চিদানন্দ পরে স্বীকার করেছিলেন

যে, থিরুভান্নামালিতে অবস্থানকালে যখন তিনি প্রথম খবর পেলেন যে এই সম্মিলনের সভাপতি হতে চলেছেন সাইবাবা, তখন তিনি একেবারে মুষড়ে পড়েন, কারণ, ঐখানে খোঁজখবর নেওয়ার সময় তাঁকে বলা হয়েছিল যে সাইবাবার বিদ্যার মধ্যে শুধু যাদুবিদ্যাই আছে এবং তিনি মোটেই বক্তৃতা দিতে পারেন না। এরপর স্বামী সচ্চিদানন্দ বলেন "এই ভুল আমার শীগগিরই ভেঙ্গে গেল এবং আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার সংবাদদাতা ব্যক্তিটি কি নিদারুণ রকমের অজ্ঞ।"

সম্মিলনের উদ্বোধন দিবসে, শহরে তিলধারণের জায়গা নেই।। প্রতিনিধি, দর্শক, ভক্ত এবং সেইসঙ্গে রাজামন্ত্রি, কালাহস্তি, মাদ্রাজ ও সুদূর হৃষিকেশ থেকে আসা একদল সন্ন্যাসীর ভীড়ে সভাস্থল গমগম করছে।

বাবা ভেঙ্কটগিরি রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। সভাস্থলে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো একটি শিবিকা প্রধান তোরণদ্বারে অপেক্ষা করছিল। বাইরে বেরিয়ে ঐশ্বর্য আড়ম্বরের এই ব্যাপক আয়োজন দেখে, বাবা অত্যন্ত বিনীতভাবে এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজার অনেক উপরোধ অনুরোধের উত্তরে বাবা বলেন "এইসব সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমি পদব্রজেই যাবো।" স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী আত্মস্বরূপানন্দ, স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ প্রমুখ বিখ্যাত সন্ন্যাসীদের নিয়ে সে এক অপূর্ব শোভাযাত্রা হয়েছিল।

স্বামী সচ্চিদানন্দ দিব্যজীবন সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। "সম্মার্গদীপম", "মহাশক্তি" ইত্যাদি পুস্তকের প্রণেতা এবং পতঞ্জলি যোগদর্শনের ভাষ্যকার স্বামী সদানন্দ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। এর আগে কয়েকজন বিপথে পরিচালিত ব্যক্তি বাবার বিরুদ্ধে ধনবান এবং অভিজাতদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে কিছু প্রচারপত্র বিলি

করেছিল। এরা জানতেও পারেনি যে সেই সময় শোভাযাত্রার সমারোহ প্রত্যাখ্যান করে সেই একই রাস্তা দিয়ে বাবা হেঁটে আসছেন যে রাস্তায় তারা জঘন্য মিথ্যা ছড়িয়ে এসেছে।

স্বামী সদানন্দ তাঁর ভাষণে এই অপপ্রচার যে কত উদ্ভট তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেন। তিনি সভার সংগঠক এবং প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন যে তাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে তারা সাইবাবাকে আনতে পেরেছে যিনি আধ্যাত্মিক জীবনে তাদের পথের সন্ধান দেবেন।

মূল ভাষণে বাবা বললেন "অণুপরমাণু থেকে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির মূল প্রেরণা, জন্মগত অধিকার, গতিশক্তি এবং এক মাত্র লক্ষ্য হলো দিব্যজীবন—যে দিব্যজীবন সত্য, প্রেম ও অহিংসারূপী মেঘ থেকে বারিধারা হয়ে ঝরে পড়ে। সত্য অন্বেষণের জন্য যাবতীয় কর্ম এই দিব্যজীবনের অন্তর্ভুক্ত। সাংসারিক মায়ার আবরণে ঢাকা মূল সত্যকে লাভ করবার সদাভিপ্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সহজাত অবস্থায় বিদ্যমান, যেমন, দুধের ভেতরে মাখন। দুধকে মন্থন করলে যেরকম মাখন আলাদা হয়ে যায়, সেইরকম মানুষকে সৎকর্ম সৎসঙ্গদ্বারা তার চিত্ত মন্থন অতি অবশ্যই করতে হবে। সনাতন আত্মা এবং অনিত্য জগতের মধ্যে মনুষ্যচিত্ত দোলায়মান এবং সেই কারণেই দিব্যজীবন সমিতির মত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তব্য তার সভ্যদের মন পবিত্রভাবে ভরে তুলতে সাহায্য করা, যাতে কাম-ক্রোধের আবর্জনা তার মন থেকে বিদূরিত হয়। প্রতিটি মানুষই জীবনের এইরূপ রূপান্তরের যোগ্য অধিকারী এবং এই আনন্দের স্বাদ প্রত্যেকের কাছে সমান। নম্রতা ও প্রেমভাব নিয়ে যত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে রূপান্তর ঘটানো যায় সমিতির সেই প্রচেষ্টা করা কর্তব্য। যে মূল কারণ থেকে মানুষের দুঃখ, উদ্বেগ এবং অজ্ঞতার উৎপত্তি, সেগুলি নির্মূল করার জন্যও সমিতিকে উদ্যোগী

হতে হবে।"

পরদিন সকালে অধিবেশনে বাবা বললেন—"হিন্দুধর্ম যে এত আঘাতের পর আঘাত, সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং বিদেশী আক্রমণ সত্বেও টিকে আছে তার একমাত্র কারণ হলো এদেশের বিখ্যাত সব আধ্যাত্মিক নেতা যাঁরা হিন্দুধর্মের সম্পদকে সযতনে রক্ষা করে সনাতন ধর্মের সৃজনশীল নীতিকে মানুষের হৃদয়ে পুনঃস্থাপন করেছেন।" বাবা বলেন যে তিনি প্রতিটি হৃদয়ে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাতে চান! হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও প্রেমের ভাব অনির্বাণ রাখতে তিনি সকলকে উপদেশ দেন। প্রকৃতির তিন গুণ সম্বন্ধে বলবার সময়, বাবা একটি সহজ উপমা দিয়ে তার চরিত্র ব্যাখ্যা করেন। একটি লণ্ঠন দেখিয়ে বাবা বলেন "কাঁচের চিমনিটি সত্বগুণ, চিমনীর ভেতরের কালি তমোগুণ এবং বাইরের ময়লা রজোগুণ।"

পরদিন বিশেষ প্রতিনিধিসভায়, বাবা প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেন যে গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি বৃদ্ধির জন্য তাদের ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করতে হবে এবং যে দিব্যজীবনের জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করেছে তার দৃষ্টান্ত নিজেদের আচার আচরণে ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রচুর লোক অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এই সভায় ঢুকে পড়ায়, শেষ পর্যন্ত এই সভা সাধারণ সভায় পরিণত হয়। সমগ্র জনতার উদ্দেশ্যে বাবা, তারপর প্রায় এক ঘন্টা ভাষণ দেন। তিনি সকলকে ভক্তি এবং আত্ম-নিবেদনের জীবনযাপন করতে উপদেশ দেন। তিনি প্রশ্ন করেন—"ভগবানের হাতে তোমরা কি হতে ইচ্ছুক?" এবং তিনি নিজেই এর জবাবে বলেন "বাঁশী"। তিনি বলেন, প্রত্যেককে হতে হবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মত সোজা—তার ভেতর কোন কুটিলতা, আত্মগর্ব, অহমিকা বা আত্মবোধ থাকবে না—এই বাঁশীতে ঈশ্বরের নামরূপ ফুঁ পড়লে তা পরিণত হবে মধুর সুরে।

স্বামী সদানন্দ ভাষণ দিলেন— বিষয় 'ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সংযোগ'। তিনি স্বীকার ক'রলেন যে প্রকৃতপক্ষে বাবার সাথে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং বাবা তাকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন তিনি তাই বলছেন। এরপর এক প্রখ্যাত পণ্ডিত ভাষণ দিতে উঠলেন। বেদান্তের ওপরে অনেক বই লিখে সমগ্র অন্ধ্র-প্রদেশ জুড়ে এঁর নাম। ভারতীয় দর্শনের সর্বাপেক্ষা জটিল তত্ত্ব 'আমি কে'? এই বিষয়ে ইনি ভাষণ দেন। লোকের ধারণা, অদ্বৈতবাদীরা যেন অন্য জগতের মানুষ এবং অত্যন্ত নীরস। কিন্তু এই জ্ঞানী পণ্ডিতের, বাবার ভাষণে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর উপমাটি বোঝাবার মত যথেষ্ট রসবোধ ছিল। তিনি বাবার আদর্শ সম্পর্কে সানন্দে কিছু বলার পর শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর বাঁশীর পরম সৌভাগ্যের ওপর কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন। তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন এই বলে 'আমি এই অধিবেশনে যোগ দিতে ভেঙ্কটগিরি এসেছি মুখ্যত শ্রীসত্য সাইবাবার সঙ্গে দেখা হবে বলে। তাঁর বিরাটত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি, এবং আমি তাঁকে পরীক্ষা ক'রবার সুযোগের জন্য আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছিলাম। এক কথায় বলতে গেলে আমি এসেছিলাম পরাজিত ক'রবার মনোভাব নিয়ে তাঁকে অগ্রাহ্য করতে। কিন্তু আমি ফিরে যাচ্ছি পরাজয় বরণ ক'রে—তাঁকে দেবতাজ্ঞান ক'রে। আমি আমার অন্তর-স্থিত দেবতাকে উপলব্ধি করেছি বলেই একথা বলছি। আমার এই ভুলের জন্য আমি বাবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।' বাবার দিব্য উপস্থিতির উষ্ণতায় ভ্রান্তির কুয়াশা কেটে যাওয়ার এটি আর একটি ঘটনা।

ভেঙ্কটগিরি ত্যাগ করার পূর্বে বাবা সাধু সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী পণ্ডিতদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মিশলেন এবং প্রত্যেককে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন। স্বামী সচ্চিদানন্দ বলেন 'আমি ঘরে ঢোকার সাথে সাথে বাবা আমাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন যে আমাকে দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। দীর্ঘ ৩৭ বছর আগে যোগ সাধনাকালে আমার এক অসাধারণ-রকমের দিব্যদর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। বাবা এই দিব্যদর্শনের কথা অবিকল বলে দিলেন। এই দিব্যদর্শন, যা বিশেষ দীর্ঘ ও নিরলস যোগসাধনার চরমে পৌছলে হয়, তার জন্য বাবা আমাকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু সাথে সাথে তাঁর কাছে বকুনিও খেলাম - আশ্রমের জন্য চাঁদা তুলতে

দিনরাত ঘোরাঘুরি করা, নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা ইত্যাদি ব্যাপারে আমি আমার সময় ও শক্তি নষ্ট করছি বলে। আমি যখন তাঁকে আমার কার্যকলাপের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বললাম যে এইসব কর্মের ফলে তো শেষ পর্যন্ত বিশ্বের মঙ্গল হবে, তখন তিনি হেসে আমাকে বললেন, "একথা কি তুমি শোননি যে মহাযোগীর হৃদয় থেকে সদ্‌চিন্তা ও উন্নত জ্ঞানের যে বিপুল তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেই মহাতরঙ্গের প্রবল স্রোত সামনের সমস্ত বাধাকে গ্রাস ক'রে এগিয়ে চলে এবং অন্যান্য সব চিন্তাপ্রবাহও এর দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়?" তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন নির্জনে গিয়ে আমি যেন পুনরায় যোগসাধনা শুরু করি। তিনি ভরসা দিলেন যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমার সহায় থাকবেন এবং পুষ্টি যোগাবেন। এমন সত্যকথা এত পরিষ্কার ক'রে শোনার কোন অভিজ্ঞতা আমার না থাকায় আমি তাঁর প্রেম ও করুণার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম তিনি আমার জীবনের এক গোপন ঘটনার কথা যেটা ঘটেছিল বাবার জন্মগ্রহণেরও কয়েক বছর পূর্বে। আমি বাবাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি এর জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। 'আমার কি জন্ম হয়েছে? আমার কি মৃত্যু হয়?'

বাস্তবিকই বাবার সঙ্গে ইণ্টারভিউ—তাদের সকলের কাছে এ ছিল এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। তাদের মনের গভীরতম সংশয় নির্ণয় ক'রে তার উপযুক্ত সমাধান, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন করুণার আশ্বাসপ্রদান, উন্নতির তুলাদণ্ডে তাদের সাফল্যের ওজন এবং তার সর্বজ্ঞতা ও সর্বব্যাপিকত্বের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হওয়া—এইসব বিস্ময়কর অভিজ্ঞতায় তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বামী সদানন্দ এবং স্বামী সচ্চিদানন্দ উভয়েই বাবার দিব্যসান্নিধ্যে কিছুকাল কাটানোর আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁর সঙ্গে পুট্টাপর্তী এসেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা, স্বামী সত্যানন্দ এবং আরও কিছু লোককে নিলয়মের পেছনে পাহাড়ের গায়ে এক ঝর্ণার ধারে নিয়ে গেলেন। সেখানে ঝর্ণার পাশে বসে বাবা বললেন যে মানুষ, পশু, উদ্ভিদ এবং প্রস্তর—সবার মধ্যেই চৈতন্য বিরাজ করছে। উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি ক'রে স্বামী সদানন্দ বললেন ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে ঠিক এই কথারই উল্লেখ আছে। হঠাৎ বাবা

খুব গম্ভীর হয়ে বললেন "তুমি এদের প্রাচীন বলছো? আমি এসব জানি। আমি স্থান কালের অতীত।" এরপর আলোচনা শুরু হয় শৈবধর্ম নিয়ে। ঈশ্বরকে শিবরূপ ধারণা করা এবং শিবের প্রতীক লিঙ্গ ও তার মর্মার্থ। স্বামী শিবানন্দ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন 'দক্ষিণ ভারতে শৈব ধর্মের উৎপত্তি এবং প্রাচীন ইতিহাস'।

ঐদিনটি ছিল তামিল নববর্ষ। বাবা হাত ঘুরিয়ে পুলি পিঠে সৃষ্টি ক'রে প্রত্যেককে একটি ক'রে দিলেন। এই শুভদিনে প্রত্যেক তামিল গৃহিণী বাড়ীতে পুলি তৈরী করাকে অবশ্যপালনীয় পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন।

কয়েকদিন পর, বাবা কোডাইকানাল শৈলাবাসে অল্প কিছুদিন থাকার জন্যে গেলে, স্বামী সদানন্দ আর স্বামী সচ্চিদানন্দও সেই দলে যোগ দেন। ছয় সপ্তাহ সেখানে অবস্থান কালে এই সন্ন্যাসীদ্বয় বাবার কৃপালাভ করবার প্রচুর সুযোগ পান এবং ক্ষণিকের জন্যে বাবার দিব্যজোতির ঝলকও তাঁরা দেখতে সক্ষম হন।

১৯৫৭ সালের ২৯শে জুন পুট্টাপর্তীতে এক সভায়, স্বামী সচ্চিদানন্দ এই প্রসঙ্গে কিছু বললেন। সেদিন 'তপোবনের' উদ্বোধন দিবস ছিল। তিনি বললেন "অন্যেরা বাবাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছে জানি না, তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে বাবা সর্বান্তর্যামী, চৈতন্যস্বরূপ, জগদ্‌সঞ্চালক এবং সর্বভূতান্তরাত্মা।" তিনি, তারপর ব্যাখ্যা করে বলেন কি ক'রে তাঁর সন্দেহ দূর হ'লো। একদিন বিকেলে তিনি বাবার ঘরে গিয়ে দেখেন বাবা বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। হঠাৎ বাবা দাঁড়িয়ে তেলুগুতে চীৎকার ক'রে উঠলেন 'গুলি কোরো না'—বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে বিছানার ওপর পড়ে গেলেন। সমাধিস্থ না বলে এই অবস্থাকে 'সূক্ষ্ম দেহে ভ্রমণ' বলাই অধিকতর সঙ্গত। প্রায় একঘণ্টা ধরে তাঁর দেহ শক্ত কঠিন হয়ে রইলো। স্থূল দেহে পুনঃপ্রবেশ করার পর তিনি চারপাশে ভক্তদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভূপালের এক ঠিকানায় অবিলম্বে একটি জরুরী তার পাঠাতে বললেন। ঠিকানা এবং বার্তা তিনি বলে দিলেন। বার্তায় বলা হ'লো 'চিন্তার কোন কারণ নেই। রিভলবার আমার কাছে আছে। বাবা'। স্বামী সচ্চিদানন্দ

বললেন যে 'রিভলবারের' উল্লেখ থাকায় টেলিগ্রামটি অস্ত্র আইনের আওতায় পড়ে, সুতরাং পোষ্টাফিস এই টেলিগ্রাম নেবে কিনা সন্দেহ আছে। অনেকে তাঁর মতে সায় দিল এবং স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনাও হ'লো। বাবা চাইছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেলিগ্রামটি ভূপালে পৌছোয়। আইনকে বাঁচিয়ে অন্য কোন কথা ব্যবহার করা যায় কিনা আলোচনা হ'লো। স্বামী সচ্চিদানন্দ রিভলবারের বদলে যন্ত্র শব্দটি প্রস্তাব করলেন। বাবা সম্মতি জানিয়ে বললেন যে যার উদ্দেশ্যে এই টেলিগ্রাম যাচ্ছে সে এই শব্দ থেকেই প্রকৃত অর্থ বুঝে নিতে পারবে। হাজার মাইল দূরে ভূপালে টেলিগ্রাম পাঠানো হ'লো।

সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলো জানার জন্যে যে বাবা কি ধরনের দুর্ঘটনা আটকে দিলেন। বাবার কাছ থেকে কোন খবর বের করা গেল না। চারদিন পর একটি চিঠি এলো এবং তখন জানা গেল যে বাবা এক ভক্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। পত্রলেখক উচ্চসরকারীপদে চাকরী করতেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। রাজ্য পুনর্গঠন হবার পর ভদ্রলোক খুব মুষড়ে পড়েন, কারণ এইসময় শাসনসংক্রান্ত ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর চেয়ে নিম্ন পদাধিকারীদের তাঁকে ডিঙ্গিয়ে উচ্চতর পদে প্রমোশন দেওয়া হয়। তাঁর কাছাকাছি এমন কেউ ছিল না যার কাছ থেকে তিনি সান্ত্বনা বা আশ্বাস পেতে পারেন এবং যাকে তাঁর দুঃখের কথা বলে মন হালকা করতে পারেন। স্ত্রীও তখন বাপের বাড়ীতে। কর্মক্ষেত্রে এইরকম ভাগ্যবিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে এই অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভদ্রলোক রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করবেন স্থির করলেন। হাতের কাছেই রিভলবার ছিল। প্রথমে একটা গুলি ছুঁড়ে তিনি দেখে নিলেন হাত কাঁপে কিনা। তারপর দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়বার আগেই বাবা চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন 'গুলি ছুঁড়ো না' এবং দরজায় খুব জোরে ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। বাবা এসে গিয়েছেন। তবে নিজের রূপে নয়—কলেজের এক পুরোনো বন্ধুর বেশে। সঙ্গে স্ত্রী এবং মুটের মাথায় ট্রাঙ্ক বিছানা—দৃশ্যটি স্বাভাবিক করবার জন্যে নিখুঁত যত্ন নেওয়া হয়েছে। অফিসারটিতো থতমত খেয়ে একদৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর রিভলবারটি ছুঁড়ে ফেলে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে হলঘরে

ফিরে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। সামনে বাবার তিনটি পৃথক মূর্তি তিনটি পৃথক ভূমিকায় অংশ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলেজের বন্ধুটি খুব উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত। বাবা পলকের মধ্যে এমন এক বন্ধুর রূপ ধারণ করেছেন যে বন্ধু প্রাণের জোয়ারে বিষাদের আবহাওয়া কাটাতে পারে এবং অফিসারের নৈরাশ্যপীড়িত মনকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে পারে। চিকিৎসার ফল হ'লো এবং অফিসারটি স্বাভাবিক হ'লেন। পুরোনো বন্ধুর হাসি-ঠাট্টায় তার মুখেও হাসি ফুটলো এবং গল্প-গুজব করতে করতে সে আত্মহত্যার কথা একেবারে ভুলে গেল। বন্ধু পত্নীও এক আসরে যোগ দিলেন। কিন্তু বাড়ীর গৃহিণী অনুপস্থিত, তাই এরা হতাশ হলেন এবং বললেন যে কি আর করা যাবে এখন অন্য এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠতে হবে। যে লোকটির জীবন রক্ষা করা হয়েছে, তার অনেক অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও অবশেষে, ৪৫ মিনিট পর কলেজের পুরোনো বন্ধুটি, তার স্ত্রী, মুটে এবং ট্রাঙ্ক বিছানা নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন একটি অপরূপ নাট্যদৃশ্যের ওপর পর্দা টেনে দিয়ে।

এঁদের বিদায় দিয়ে অফিসার চকিতপদে শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখেন রিভলবারটি অদৃশ্য হয়েছে এবং বাড়ীর কোথাও সেটি খুঁজে পাওয়া গেল না। 'কে নিতে পারে? আচ্ছা, মাত্র একবার স্ত্রীর সাথে পুট্টাপর্তী গিয়েছিলাম··· সে আবার বাবার ভীষণ ভক্ত···তবে কি···বাবা? হ্যাঁ, হতেই হবে। বাবার কাজ।' বাড়ীতে তালা দিয়ে অফিসারটি দৌড়ালো আর এক ঠিকানার খোঁজে যেখানে সেই কলেজের বন্ধুটি উঠবে বলেছিল। যা সন্দেহ করেছে ঠিক তাই। ঐ ঠিকানায় কারো অস্তিত্ব নেই। সেই তিনজন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে —সঙ্গের ট্রাঙ্ক বিছানা সমেত। বাড়ী ফিরে এসে, ভদ্রলোক এইসব অদ্ভুত ঘটনাগুলোর কথা চিন্তা করছেন এমন সময় হঠাৎ দ্বিতীয়বার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে তিনি চমকে উঠলেন। কোডাইকানাল থেকে টেলিগ্রাম নিয়ে পিওন এসেছে। 'চিন্তার কোন কারণ নেই। যন্ত্রটি আমার কাছে আছে। বাবা'।

স্বামী সচ্চিদানন্দ বললেন যে পুরাণে বর্ণিত 'পরকায়া-প্রবেশ' অপেক্ষা এই ঘটনা অনেক বেশী আশ্চর্যজনক। পরকায়া-প্রবেশ মানে অন্য দেহে প্রবেশ করা। কিন্তু এক্ষেত্রে সংকল্পমাত্র সেই মুহূর্তে তিনটি পৃথক দেহের সৃষ্টি এবং তাদের

দ্বারা তিনটি পৃথক অভিনয় করানো; জীবিত ব্যক্তির মত অবিকল নিখুঁত আচরণ করা—গলার আওয়াজে, বিশেষ বাচনভঙ্গীতে, হাঁটা-চলার কায়দায় এবং ভাবভঙ্গীতে কোন প্রকার মানসিক বিশেষত্ব সমেত এবং কলেজ জীবনের বহু ছোটখাটো ঘটনার উল্লেখসহ—স্বামী সচ্চিদানন্দের ভাষায় 'এ সবকিছু একমাত্র ঈশ্বরের অবতারের পক্ষেই সম্ভব।'

এইসব ঘটনার পর স্বামী সচ্চিদানন্দ এবং স্বামী সদানন্দ যে হৃষিকেশে তাঁদের গুরু স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর কাছে বাবা এবং তাঁর বিভূতি সম্পর্কে চিঠি লিখবেন, এতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই। বাবার সঙ্গে এই দুই স্বামীজীও কোডাইকানাল থেকে কন্যাকুমারিকা এলেন। এক খ্রীস্টধর্মীকে আশীর্বাদ করার জন্যে বাবাকে পবিত্র ক্রশ চিহ্ন এবং যীশুর মূর্তিসমেত একটি জপমালা সৃষ্টি করতে দেখে, তাঁরা বাবার সর্বজনীন বাণীর পরিচয় পেলেন। কন্যা-কুমারিকার সমুদ্রসৈকতে হাঁটবার সময় বাবার প্রতি পদক্ষেপে স্ফটিকের পুঁতি সৃষ্টি হচ্ছিল। ভক্তরা এগুলি কুড়িয়ে একটি চন্দনকাঠের বাক্সে রেখে দিল। গুণে দেখা গেল মোট ৮৪টি পুঁতি। বাবা বললেন, সবমিলিয়ে ১০৮টি নিশ্চয়ই আছে। আবার গোনা হলো। দেখা গেল সত্যিই ১০৮টি। এই অলৌকিক উপায়ে গঠিত পুঁতি দিয়ে জপমালা তৈরী করা হ'লে বাবা স্বামী সদানন্দকে তা উপহার দিলেন।

এখানে পেরিয়ার বাঁধ ও বন্যপ্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত অভয়ারণ্য দেখার পর বাবা মাদুরাই ও ময়ূরম গেলেন এবং সালেম হয়ে পুট্টাপর্তী ফিরে এলেন। স্বামী সচ্চিদানন্দ এই সালেমে কয়েক বছর ছিলেন। ইতিমধ্যে দিব্যজীবন সমিতির সভাপতি স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী হৃষিকেশে যাবার জন্য বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বাবা সেই আমন্ত্রণলিপির উত্তর শীঘ্রই পাঠালেন। তারপর ঘন ঘন অনেক চিঠিপত্র এবং টেলিগ্রাম আদানপ্রদানের পর বাবা শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে যাত্রা ক'রতে সম্মত হ'লেন।

দেশ দেখা বা প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করা কখনোই বাবার ভ্রমণের উদ্দেশ্য নয় এবং তীর্থভ্রমণেও তাঁর আগ্রহ নেই, কারণ সমস্ত তীর্থযাত্রার চরম লক্ষ্য স্বয়ং তিনি। একবার এক মহিলা তার ছেলে পুট্টাপর্তী না এসে তিরুপতি মন্দিরে চলে গেছে বলে বাবার কাছে নালিশ করায় বাবা বললেন, "সেও তো

আমার কাছেই আসা হ'লো, কারণ ঐ পাহাড়ে যিনি রয়েছেন তিনি আর আমি একই।" সংকল্পমাত্র বাবা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে নিমেষের মধ্যে চলে যেতে পারেন, কারণ তিনি স্থান ও কালের অতীত। বাবা বলেন "বায়ু পরিবর্তন, চিত্তবিনোদন বা নিছক বেড়ানোর জন্যে আমি ভ্রমণ করি না। যারা মনে শান্তি লাভ করার জন্যে ব্যাকুল আমি তাদের মাঝে ছুটে যাই শান্তিদান ক'রতে। যেখানে ব্যথাতুর হৃদয় দেখে আমি ছুটে যাই সেই দুঃখে ভরা হৃদয়ের দুঃখ দূর করতে। যেখানে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব দেখি—আমি ছুটে যাই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে। যে কাজের জন্যে আমি এসেছি তা সফল করবার উদ্দেশ্যে আমি বিরামহীনভাবে এগিয়ে চলেছি।"

স্বামী সচ্চিদানন্দ বাবার যাত্রার পূর্বেই হৃষিকেশ চলে গেলেন। কারণ সাইবাবা সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা দূর করা এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতাদের কাছে বাবার দিব্যত্ব সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন ছিল।

১৯৫৭ সালের ১৪ই জুলাই বাবা পুট্টাপর্তী থেকে যাত্রা করলেন মোটর গাড়ীতে। ৬৭ মাইল দূরে মেডকুর্তির অযোধ্যা আশ্রমে শিরডি সাইবাবার রূপোর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে থামা হ'লো। দুপুরবেলা থেকে একদল গ্রামবাসী সেখানে অপেক্ষা করছিল। বাবা তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, যে কোন কাজ—যেমন এই আশ্রম নির্মাণ—পুরোপুরি ভক্তির ভাব নিয়ে করা দরকার, মনে কোন রকম কপটতা বা লাভের বাসনা থাকলে চলবে না—শুধুমাত্র কাজটি সুসম্পন্ন হোক এই কামনা ছাড়া। ঈশ্বরকে লাভ করার উদ্দেশ্যে দেহের প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলাকে বাবা নিন্দা করেন এবং বলেন "দেহ হলো ভগবানের মন্দির। জন্ম-মৃত্যুর মহাসাগর পার হতে হবে, বিচার আর বৈরাগ্যের দুই দাঁড় দিয়ে দেহ-তরী বেয়ে। তাই দেহকে ফিটফাট পরিপাটি রাখা এত প্রয়োজন।" সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বাবা বলে, শিশুদের মনে ভক্তি, সাহস, আত্মমর্যাদাবোধ এবং সত্যের ভাব সঞ্চারিত করতে হবে। তিনি বললেন, "আনন্দের সন্ধানে এদিক ওদিক ছোটার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের মধ্যেই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গরূপে আনন্দ রয়েছে। একে বাতাস দাও দেখবে ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ বিরাট আগুনে পরিণত হয়েছে।" তিনি ঘোষণা করলেন যে যদিও তিনি স্বর্গকে মর্ত এবং মর্তকে স্বর্গে রূপান্তরিত করতে পারেন, তবু

লোকে তাঁর কাছে এসে সাধারণ বস্তু প্রার্থনা করে। তিনি বললেন যে সত্য ও ন্যায়ের কষ্টিপাথরে প্রতিনিয়ত প্রতিটি চিন্তা যাচাই করলে তবে বিচার বৈরাগ্য জন্মায়। "প্রকৃত ভক্তকে ভাবাবেগ জয় করতে হবে। প্রকৃত সন্ন্যাসীকে তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন হতে হবে। প্রকৃত সেবককে মনোবল বৃদ্ধি করতে হবে।"

১৫ই জুলাই বাবা সদলে মাদ্রাজ পৌছলেন এবং চারদিন পর বিমানে দিল্লী যাত্রা করলেন। টিকিটে নিজের নাম মিঃ এস এস বাবা দেখে খুব কৌতুকবোধ করলেন। মিষ্টার শব্দটি দেখে বাবা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন। বাব প্লেনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের মধ্যে কৃপা বিতরণ করে বেড়াতে লাগলেন। বিন্ধ্যপর্বতের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় বাবা এক যাত্রীর প্রার্থনায় ইণ্টারভিউএরও সুযোগ দিলেন। এই যাত্রীটি বাবার মহিমা সম্বন্ধে পূর্বেই জ্ঞাত ছিল। বাবা যখন তাকে বললেন, সেই স্কুল শিক্ষিকাকেই যেন সে বিয়ে করে যাকে সে ভালবাসে, তখন লোকটি ভীষণ অবাক হয়ে গেল। কারণ তার ধারণা ছিল এ ব্যাপারে কেউ জানে না। বাবা কথা দিলেন যে তার মা বাবার বিরুদ্ধতা দূর করে এই বিবাহে তাঁদের সম্মতি আদায় করে দেবেন।

দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে প্লেন এসে নামলো বিকেল সাড়ে চারটায়। সুন্দর নগরে বাবার জন্যে নির্দিষ্ট বাংলোয় পৌছবার এক ঘণ্টার মধ্যে বাঙ্গালোরের এক ভক্তের আকুল ডাকে বাবা স্থূলদেহ ত্যাগ করে চলে যান। বাবা পরে প্রকাশ করেছিলেন যে ঐ ভক্তকে মারাত্মক ধরনের পক্ষাঘাতের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করতে তিনি গিয়েছিলেন। দিনে দুবার ভজন অনুষ্ঠানে দিল্লী নগরীর ভক্তবৃন্দ এবং তাঁদের অগণিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন (যারা পূর্বেই বাবার মহিমার কথা শুনেছে) যোগ দেয়।

জুলাই মাসের ২২ তারিখে মোটরযোগে বাবা দিল্লী ত্যাগ করে হৃষিকেশ যাত্রা করেন। স্বামী শিবানন্দ কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন, বাবাকে হরিদ্বার থেকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় শিবানন্দনগর পৌছলে স্বামীজি বাবাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান এবং আশ্রমিকদের একটি বিশেষ সভার আয়োজন করেন। স্বামী শিবানন্দ তাঁর

অভ্যাস মত হাত জোড় করে বাবাকে অভিবাদন জানালে বাবা তাঁর বিখ্যাত অভয়হস্ত ভঙ্গিমায় তা গ্রহণ করলেন।

চির সবুজ পাহাড়ের কোলে, মা গঙ্গার দক্ষিণ বাহুডোরে বেষ্টিত হয়ে শিবানন্দনগর বিরাজ করছে। দূরে গঙ্গার বাম তীরে, কুয়াশার আবরণ মিলিয়ে গেলে, দেখা যায় সারি সারি অনেক মন্দির এবং গীতাভবন, স্বর্গাশ্রমের মত প্রকাণ্ড সব আশ্রম। এগুলির চাইতে অধিক সুন্দর হলো চারদিকের জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়। ঠিক মনে হয় যেন অতিকায় সব ঋষির দল অনন্তের ধ্যানে বসে আছেন—অন্তর্মুখী তাঁদের দৃষ্টি—বাইরের জগতের ইতিহাসের তাঁরা কোন খোঁজ রাখেন না।

স্বর্গ ও মর্ত্যের কন্যা গঙ্গানদী আশ্রমের পাশ দিয়ে গম্ভীর ছন্দে বয়ে চলেছে—ভারতের মর্মবাণী ও ঐতিহ্যের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে। ভারতের লক্ষ লক্ষ শিশু প্রতিরাত্রে তাদের মায়ের কোলে শুয়ে গঙ্গার অপরূপ সব রূপকথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। গঙ্গার যশোগাথা যুগযুগান্ত ধরে পৌরাণিক কাহিনী আলোকিত করে আছে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে গঙ্গাজলের মত পবিত্র আর কিছু নেই। হাজার হাজার বছর ধরে এই মহাপবিত্র গঙ্গাজল হিন্দুগৃহে ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রতিটি কাজকর্মের প্রারম্ভে পবিত্রতা সম্পাদনের জন্যে, যাবতীয় অমঙ্গল ও পাপ দূর করার জন্যে এবং গৃহে শান্তি স্থাপনের জন্যে। এই গঙ্গা কাব্যে, শিল্পকলায়, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে—বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা নানাভাবে পূজিত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

পরদিন আশ্রমবাসীরা এক ভক্তসভার আয়োজন করেন। এই সভায় বাবাকে ভাষণ দেবার জন্যে অনুরোধ করা হলে তিনি সাগরাভিমুখী গঙ্গার সঙ্গে ঈশ্বরাভিমুখী একনিষ্ঠ সাধকের তুলনা করেন। বাবা বলেন যে প্রতিটি নদী মনে মনে জানে যে সাগরের বুকে তার জন্ম এবং এই জ্ঞানের প্রেরণাই তাকে মহাবেগবতী করে সম্মুখের সমস্ত প্রতিবন্ধক চূর্ণবিচূর্ণ করে সাগরের পানে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। শিবানন্দনগরের শান্ত, নির্জন পরিবেশের প্রশংসা করে বাবা বললেন যে এই সুন্দর জায়গা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের উপযুক্ত। শ্রোতাদের কাছে বাবাকে ভগবান বলে প্রশস্তি করা হয়েছিল। এর উল্লেখ করে বাবা

বললেন, " 'ভ' মানে সৃষ্টি, 'গ' মানে পালন, 'বা' মানে পরিবর্তন। ভগবান এই তিনটি কার্যই করতে সক্ষম। এই হলো আমার নিগূঢ় তত্ত্ব।"

বাবা সচরাচর যে সব পদার্থ সৃষ্টি করেন এবং উপহার দেন, সেই সৃষ্টি-রহস্যের নানা অসার ব্যাখ্যাকে বাতিল করে দিয়ে বাবা বললেন যে তিনি ইচ্ছা করার সাথে সাথে পদার্থ সৃষ্টি হয়। পিতা যেমন তার আদরের শিশুপুত্রকে মিষ্টি উপহার দেন—সে তো পিতৃত্ব জাহির করবার জন্য বা মহত্বের বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে নয়—সেইরকম ভক্তদের প্রাণে আনন্দ দেবার জন্যই বাবা জিনিষ সৃষ্টি করেন। তিনি এইসব জিনিষ উপহার দেন মানুষের মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করতে, মনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, একাগ্র সাধনার উন্নতিতে সাহায্য করতে এবং বহু ক্ষেত্রে প্রাপকদের জীবনের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অদৃশ্য সংযোগ রক্ষা করতে। কাউকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই উপহার নয়। তন্ত্র মন্ত্র আচার অনুষ্ঠান থেকেও এর সৃষ্টি নয়। আর পাঁচটা পদার্থ যে ভাবে তৈরী হয় এই পদার্থও সেই একই ভাবে তৈরী তবে তফাৎ এই যে, এগুলি নিমেষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, অন্যগুলি হয় না। অন্যান্য সব জড় পদার্থ যতদিন স্থায়ী এগুলিরও স্থায়িত্ব ততদিন। এরপর বাবা বললেন 'প্রেম আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। আমার এই প্রেম লাভ করার জন্যে ভক্তদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। সেই সাথে বিচার বৈরাগ্য—যা একমাত্র গুরুই দিতে পারেন।'

তারপর বাবা শূন্যে হাত ঘুরিয়ে ১০৮টি রুদ্রাক্ষের একটি সুন্দর জপমালা সৃষ্টি করলেন। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা সুন্দর এই জপমালার প্রতিটি রুদ্রাক্ষ সোনার জালে জড়ানো এবং সোনার তারে গাঁথা। মাঝখানে একটি বড় পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ। বাবা এই জপমালাটি স্বামী শিবানন্দকে উপহার দিলেন এবং অনেকখানি বিভূতি সৃষ্টি করে স্বামীজির কপালে লাগিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা স্বামীজি সেই অপরূপ রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে যখন সৎসঙ্গ হলে প্রবেশ করেন, তখন সকলে মালাটির সৌন্দর্যে এবং অলৌকিকত্বে বিস্মিত হন। স্বামী শিবানন্দ 'ভগবান এবং তাঁর বাণী' সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। নাম স্মরণের উপকারিতা নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন এবং চিকিৎসকের মত আবেদন করলেন প্রত্যেকে যেন দৈনিক ভগবানের নাম জপরূপ পথ্যের সাথে একমাত্রা করে বৈরাগ্যরূপ ওষুধ সেবন করে। সেই সন্ধ্যায় বাবা তাঁর ভাষণ শুরু করলেন

মা গঙ্গার উল্লেখ করে। বাবা বললেন "'নার' অর্থ জল এবং গঙ্গা স্বয়ং নারায়ণ—নার যার অয়ন বা জল যার আশ্রয়। বাস্তবিক পর্বত, উপত্যকা, অরণ্য, আকাশ সর্বচরাচরের মধ্যে সেই একেরই প্রকাশ। ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন 'আমি এক থেকে অনেক হতে চাই' এবং নিমেষের মধ্যে তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করলেন। সূর্য যেমন জলভরা পাত্রে প্রতিফলিত হয়, ঈশ্বরও সেইরকম ভক্তিরূপ জলভরা হৃদয়ে প্রতিফলিত হন। বিশ্বাস থেকে আসে জ্ঞান। একনিষ্ঠ ভক্ত শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এবং তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

বাবার ভাষণ ও কথোপকথন, দুর্লভ জ্ঞানে এমন গভীর ছিল যে পরের দিন বহু সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী তাঁর কাছে এলেন, নানা প্রশ্ন করে নিজেদের মনের সংশয় দূর করতে। স্বামী শিবানন্দ প্রতি সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে একঘণ্টা কাল আলাপ-আলোচনা করতেন এবং ঐ সময় বাবা অসুস্থ স্বামীজির জন্যে ফল ও বিভূতি সৃষ্টি করে দিতেন। স্বামীজির শরীরের দিন দিন উন্নতি দেখা দিতে লাগলো। একদিন বাবা হাতে গঙ্গাজল নিয়ে তা অমৃতধারায় পরিণত করে স্বামীজিকে ওষুধ হিসাবে খেতে দিলেন। আশ্রমের সকলে দেখে অবাক হলো যে বাবার আশ্রম ত্যাগের দিন স্বামীজি খুব উৎসাহ নিয়ে বাবাকে আশ্রম ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। কারণ, বাবা যে সময় আশ্রমে পদার্পণ করেন সে সময় স্বামীজি এমন অসুস্থ ছিলেন যে তাঁকে চাকালাগানো চেয়ারে করে ঘুরতে হতো।

১৯৫৭ সালের ২৬শে জুলাই তারিখটি শিবানন্দ আশ্রমের বাসিন্দাদের কাছে মধুর স্মৃতিতে ভরা থাকবে। এইদিন সকালে বাবা বাসে করে গঙ্গার ধার ঘেঁষা রাস্তায় গাড়োয়ালের রানীর প্রাসাদে বেড়াতে যান।

পথের দৃশ্যাবলী খুবই সুন্দর। পাহাড়ের মধ্যে জায়গায় জায়গায় গেরুয়া পতাকা শোভিত সন্ন্যাসীদের কুটির। হঠাৎ রাস্তার বাঁক পেরিয়ে বাস একটি ছবির মত সাজানো ছোট্ট বাংলোর সামনে থামলো। বাংলোটি সুন্দর একটি বাগানের মাঝখানে—পাশেই গঙ্গা। একটি ফলভর্তি জামগাছ দেখে বাবা জাম পেড়ে সবাইকে দিলেন এবং গঙ্গার ধারে একটি গাছের নীচে গিয়ে ব'সলেন। বাবাকে কয়েকজন প্রশ্ন ক'রলো আধুনিক যুগে শাস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে। বাবা ব'ললেন, এগুলি রাস্তার ধারের ফলকের মত, যাতে পথের নির্দেশ দেওয়া থাকে।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর আনন্দ পেতে গেলে পথ অতিক্রম করা চাই। স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বাবা ব'ললেন যে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ এবং নরক আছে। সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মোপলব্ধি, মায়া অবসান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন।

ফেরার পথে বাবা এক জায়গায় বাস থামালেন। লোহার ছোট্ট একটি পোস্টে অস্পষ্ট এক ফলক লাগানো—লেখা আছে—"বশিষ্ঠ গুহা।" বাবা এমনভাবে সেই খাড়া ঢাল বেয়ে নদীর ধারে নামলেন যে দেখে মনে হ'ল তিনি যেন আগে বহুবার এখানে এসেছেন এবং গুহায় অবস্থিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর যেন পূর্ব থেকেই সাক্ষাতের সময় স্থির করা ছিল। গুহার কাছে গঙ্গা একটি মস্ত বাঁক নেওয়ায় ওখানকার দৃশ্য আরও সুন্দর লাগছিল। অতীতে বহু সাধক এবং যোগী এখানে বসে তপশ্চারণা ক'রেছেন বলে বশিষ্ঠ গুহা পবিত্রতার জন্যে প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য এবং রামকৃষ্ণদেবের আর এক সাক্ষাৎ শিষ্য মহাপুরুষজি মহারাজের কাছে সন্ন্যাসপ্রাপ্ত স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ বিগত ৩০ বৎসর ঐ গুহায় তপস্যা ক'রছেন। তিনি বাবাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা ক'রলেন যেন তিনি অধীর আগ্রহে বাবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর বয়স ৭০ বছরের ওপর এবং তিনি জীবনের বেশীরভাগ সময় কাটিয়েছেন কঠোর সাধনা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে। তাঁর মুখমণ্ডল ভগবৎ প্রেমের আনন্দে সমুজ্জ্বল। অবতারের মহিমার কথা বলা মাত্রই তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ২৭ বছর তখন কন্যাকুমারিকায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ হাত দেখে বলেছিলেন যে এই যুবক ভবিষ্যতে গুহায় বসে অবিরত ধ্যানে মগ্ন থাকবেন।

বাবা মনে করিয়ে দিলেন স্বামীজি যখন প্রথম এই গুহায় আসেন তখন তাঁকে কত কষ্ট স্বীকার ক'রতে হয়েছে—চিতাবাঘ এবং গোখুর সাপের সঙ্গে লড়াই ক'রতে হয়েছে—তিনদিন লাগতো হৃষিকেশ গিয়ে দেশলাই আর নুন সংগ্রহ ক'রে আনতে এবং তখন ভগবান কৃপা ক'রে যে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন বাবা তারও উল্লেখ করেন।

পরের দিন সন্ধ্যায়—দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং সঙ্গীদের মৃদু আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাবা আবার ঐ গুহায় গেলেন। তাঁর কৃপায় মেঘও কেটে গেল এবং

সঙ্গীরাও আনন্দলাভ ক'রলেন। বাবা সেখানে একাধিক ভজন গাইলেন। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের সেবক এক সন্ন্যাসী, বাবাকে ত্যাগরাজের ভক্তিগীতি গাইতে অনুরোধ করায় বাবা জিজ্ঞেস ক'রলেন ত্যাগরাজের কোন্ গানটি তিনি শুনতে ইচ্ছুক। স্বামী কালিকানন্দ ব'ললেন যে তিনি ত্যাগরাজের "শ্রীরঘুবর সুগুণালয়" ভজনটি শোনার জন্যে ব্যাকুল। বাবা এই ভজনটি গেয়ে তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিলেন। এর আগে এই ভজন তাঁর মুখে কেউ শোনেনি। সুতরাং অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দ পাওয়ায় তাঁরা স্বামী কালিকানন্দকে ধন্যবাদ জানালেন। ঐ স্বামীজি দীর্ঘদিন ধ'রে পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন শুনে বাবা তৎক্ষণাৎ হাত ঘুরিয়ে মিছরি সৃষ্টি ক'রে তাঁকে দিলেন। পথ্য সম্পর্কেও কিছু নির্দেশ দিলেন। একটি উজ্জ্বল স্ফটিকের জপমালা সৃষ্টি ক'রে বাবা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে উপহার দিলেন।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় বাবা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে যে দিব্যদর্শন দিয়েছিলেন তা আরও রহস্যময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯১৮ সালে স্বামীজী তাঁর গুরুকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "সমস্তই মিথ্যা। যতদিন না সত্যের সম্মুখীন হইতে পারিতেছি ততদিন বিরাম নাই, শান্তি নাই।" সবাইকে গুহার বাইরে যেতে ব'লে বাবা এবং স্বামীজি গুহার ভেতরের একটি ছোট্ট ঘরে ঢুকলেন। ভেঙ্কটগিরির দিব্যজীবন সমিতির সভাপতি শ্রীসুব্বারামিয়া গুহার বাইরে থেকে যা দেখতে পেয়েছিলেন তার বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন। "আজও আমি চোখের সামনে পরিষ্কার সেই দৃশ্য দেখতে পাই। গুহার মুখের কাছে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দরজার ছোট্ট ফুটো দিয়ে ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিলাম, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের কোলে মাথা রেখে বাবা শুয়ে প'ড়লেন। হঠাৎ বাবার সম্পূর্ণ শরীর দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আমার মনে হ'ল তাঁর মাথা ও মুখমণ্ডল বিরাট আকার ধারণ করেছে। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে এক দিব্যজ্যোতি-ধারা ঝরে পড়ছে। আমি এক অদ্ভুত অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে বিভোর হ'য়ে গেলাম। তখন রাত প্রায় দশটা"। পরে ঐ দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য বাবাকে প্রার্থনা করা হ'লে তিনি বলেন, এ হ'লো ঈশ্বরের মহিমার রূপদর্শন।

গুহা থেকে ফেরার পথে বাবা সামান্য কিছুক্ষণের জন্য দেহ ছেড়ে গিয়েছিলেন। পরে, জিজ্ঞেস করা হ'লে বাবা ব'ললেন, তিনি এক যোগীকে

জলে ডোবার হাত থেকে উদ্ধার ক'রতে গিয়েছিলেন। এই কথায় সবার কৌতুহল বৃদ্ধি পেল এবং যোগীর পরিচয় জানার জন্যে তারা বাবাকে ঘিরে ধরলো। কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি শুধু ব'ললেন, "সুব্রহ্মণ্যম্‌কে জিজ্ঞেস করো—সে জানে।"

সুব্রহ্মণ্যম্‌ বাবার একজন ভক্ত এবং তিনিও ঐ দলে ছিলেন। বাবা তাকে সেদিন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ গুহাতে সে কি দেখেছে বলতে ব'ললেন। সে বললো যে গঙ্গার স্রোতে একটি শবদেহ ভেসে যেতে দেখেছিল এবং বাবাকে এ কথা আগে না জানানোয় সে বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রলো। কিন্তু গুহার মত পবিত্র জায়গায় বসে এই অশুভ লক্ষণের কথা সে বলতে চায়নি। বাবা হেসে উঠে বললেন যে সেটি মোটেই শবদেহ ছিল না। একটি যোগী, মনে হয়, গঙ্গার তীরে কোন আলগা পাথরের ওপর ধ্যানে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। হঠাৎ জলের তীব্র স্রোতে পাথরের নীচের কাদামাটি আলগা হ'য়ে পাথরটি উল্টে যায় এবং যোগী ঐ অবস্থায় জলে পড়ে গিয়ে খরস্রোতে ভেসে যেতে থাকে। বাহ্যজ্ঞান-রহিত যোগীর অসাড় দেহ দেখে শবদেহ বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। যোগী প্রথমে তার বিপদ বুঝতেই পারেননি। "প্রথমে তার কাছে এটা একটা স্বপ্ন মনে হয়েছিল"—বাবা ব'ললেন। পরে যখন বুঝতে পারলো যে গঙ্গায় ভেসে চলেছে তখন সে ব্যাকুল হ'য়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলো। বাবা তার কাতর আহ্বান শুনতে পান এবং তিনি সেই ভাসমান দেহকে ধীরে ধীরে শিবানন্দনগরের কয়েক মাইল দূরে, গঙ্গার তীরে নিয়ে আসেন এবং সেখানে এক কুটীরে রেখে সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।

রাজা রেড্ডী তখন হৃষিকেশে ছিলেন। তিনি লিখেছেন "আমরা বাবার মুখে ঘটনাটি শুনেছিলাম। সমাধিস্থ অবস্থায় বাবার এক হাত দিয়ে অপর হাত এমনভাবে ঢাকা ছিল যে মনে হচ্ছিল হাতের ভেতরে কিছু আছে। সেই সন্ন্যাসীর হৃৎপিণ্ডকে রক্ষা ক'রবার জন্তে বাবা হাত দুটি ঐভাবে ঢেকে রেখেছিলেন। গঙ্গার স্রোতে দীর্ঘ ৩০ মাইল ভেসে যাবার পর সাধুকে বাঁচানো হয়। কিন্তু বিপদাপন্ন কোন ব্যক্তির আকুল ডাকে বাবার সাড়া পেতে হ'লে তিনটি সর্ত পূরণ করা দরকার। হয় তাকে বাবার কাছ থেকে তার সৃষ্টিকরা কোন পদার্থ, কৃপার নিদর্শন এবং রক্ষাকবচস্বরূপ পেতে হবে, অথবা সঙ্কট মুহূর্তে

তাকে সর্বান্তঃকরণে আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকতে হবে। এদু'টির একটিও যদি সেইব্যক্তি পূরণ ক'রতে অক্ষম হয় তবে তাকে খাঁটি মানুষ হতে হবে—সৎ এবং সরল। বাবার ভক্ত না হ'লেও কিছু ক্ষতি নেই। বাবাকে ডাকবার সময় কোন একটি বিশেষ নামে না ডাকলেও চলে। রাম, কৃষ্ণ, যীশু, আল্লা, সাই—যে কোন নামে ডাকলেই হবে। সমস্ত নামই তাঁর নাম, সমস্ত রূপই তাঁর রূপ। পীড়িতের ক্রন্দনে সাড়া দেবার জন্যে তিনি সদা প্রস্তুত। ব্যথাতুরের কষ্ট দূর ক'রতে তিনি সদা জাগ্রত। এই যোগীটি বাবার ভক্ত ছিলেন না এবং কখনও বাবাকে দর্শন করেননি। কিন্তু তবুও তাঁর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।" বাবার প্রেম যে সর্বজনীন এবং তিনি যে সর্বত্র বিরাজমান - এ পরিচয় অনেকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'লো ঐ অজ্ঞাতনামা যোগীর ঘটনায়।

হৃষিকেশে যে কদিন বাবা ছিলেন তাঁর কুটির সর্বদা কর্মচঞ্চল থাকতো। আশ্রমবাসীরা এবং ছাত্ররা এসে বাবাকে সাধনার নানাবিধ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ক'রতো। এছাড়া বাবার পদার্পণে হৃষিকেশ বিশেষভাবে পবিত্র হওয়ায়, তীর্থযাত্রীরাও স্রোতের মত বাবাকে দর্শনের জন্যে আসতে লাগল। বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী শ্রীষড়দর্শনাচার্য স্বামী তাঁর শিষ্য ও ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে দুবার এলেন দেখা ক'রতে। উৎসুক ব্যক্তিরা স্বামী সচ্চিদানন্দ এবং স্বামী সদানন্দকে ঘিরে ধরলেন বাবার জীবনের কথা, তাঁর লীলা এবং পুট্টাপর্তীর প্রশান্তি-নিলয়ম্ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার জন্যে। স্বামী সদানন্দ এক তরুণ ব্রহ্মচারীকে বললেন যে বাবা ইচ্ছামত স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ জগতের মধ্যে বিচরণ ক'রতে পারেন এবং যে কোন স্থানের যে কোন সময়ের যে কোন ঘটনা প্রকাশ ক'রতে পারেন। বাবা সর্বশক্তিধর। তিনি আরো বললেন যে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বাবা একটি চালের দানাকে হাতির দাঁতের টুকরোয় পরিণত ক'রে, সেই হাতির দাঁতের টুকরো থেকে ১০৮টি অতি ক্ষুদ্র হাতির মূর্তি সৃষ্টি ক'রেছেন। এই মূর্তিগুলির অতিসূক্ষ্ম কারুকাজ পরকলা কাঁচের (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) ভেতর দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়।

২৮শে জুলাই বাবা স্বামী শিবানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিল্লী গেলেন। ৩০ তারিখে মোটরযোগে তিনি মথুরা বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই মথুরা বৃন্দাবন তাঁর অতীত দিব্যজীবনের লীলাভূমি, যে সময় তিনি কৃষ্ণ

অবতাররূপে মর্তে এসেছিলেন। যে মথুরার প্রতিটি ধূলিকণা শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ লীলার স্মৃতিতে পবিত্র এবং যে লীলার দিব্যসৌরভ অমর মহাকাব্য ভাগবতের পাতায় পাওয়া যায়—সেই মথুরার লীলাময় পটভূমিকায় বাবাকে দর্শন এবং তাঁর দিব্যসঙ্গ লাভ করার জন্য ভক্তের দল উতলা হয়ে পড়েছিল। একদল ভক্ত বাসে ক'রে দিল্লী থেকে আলিগড় হ'য়ে মথুরা যাত্রা করেন। আলিগড় থেকে ২০ মাইল দূরে একটি ছোট্ট গ্রামে বাস খারাপ হ'য়ে গেল। অন্য বাসের ব্যবস্থা ক'রে মথুরা পৌছাতে বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে বাজলো। যাত্রীরা পথের ধকলে অবসন্ন, ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত। কিন্তু মথুরায়, বাবা, মাতৃস্নেহের চাইতেও অধিক স্নেহে, অধিক মমতায়, তাঁদের সকলকে এমন আদর-অভ্যর্থনা ক'রলেন যে অনেকে রাস্তায় বাস খারাপ হওয়া সার্থক হয়েছে বলে মনে করলো। তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্টি কথার প্রলেপে সবাইকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। প্রত্যেক ভক্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ নজর রেখে বললেন 'পাখার কাছে সরে বসো', 'একটু হাত পা ছড়িয়ে আরাম করো', 'আমি এলে আর দাঁড়াতে হবে না', 'এই নাও, এই ঠাণ্ডা সরবৎ আমি বিশেষ ক'রে তোমাদের জন্যেই বানিয়েছি', 'খেয়ে নাও, তুমি দেখছি খুবই পরিশ্রান্ত'—ইত্যাদি এবং মুহূর্তের মধ্যে বাবার ভালবাসায় সবাই সুস্থ হ'য়ে উঠলো।

বাবা তাঁদের যমুনা তীরে নিয়ে গিয়ে সেখানকার পবিত্র স্থানগুলি দেখালেন। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এখানকার সবকিছুই তাঁর অতি পরিচিত। তিনি যখন সবাইকে দেখাচ্ছিলেন কোথায় শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-দমন করেছিলেন, কোথায় গোপীরা তিরস্কৃত হয়েছিল, কোথায় শকটাসুর উৎসাদন করা হয়েছিল এবং কোথায় যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয় উৎপাটন করা হয়েছিল—তখন কে বলতে পারে বাবার মনের ভেতরে অতীতের কোন স্মৃতি জেগে উঠেছিল কি না। তাঁর দিব্যকণ্ঠের মধুর স্বর শুনে যমুনার ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলি খুশিতে মাতামাতি ক'রছিল বলে মনে হ'লো। প্রতিটি গাভীকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন তারা বাবার দিব্যহাতের উষ্ণ স্পর্শ পেতে চাইছে।

মথুরায় ফেরার পথে, বাবা হঠাৎ একটি রাধাশ্যাম মন্দিরে প্রবেশ করেন। মন্দিরের সামনে তখন রাসলীলা অভিনয়ের আয়োজন চলছিল। শ্রীকৃষ্ণ একবার চন্দ্রালোকে গোপীদের সাথে নৃত্য করেছিলেন—তখন প্রত্যেক গোপীর

পাশে নৃত্যসঙ্গী হিসাবে একজন ক'রে কৃষ্ণ দেখা গিয়েছিল—এইরূপ অসংখ্য কৃষ্ণময় নৃত্যকে রাসলীলা বলা হয়। বাবা মন্দিরের ভেতরে পূজার ঘরের সামনে দাঁড়াতেই সহসা সব আলো নিভে অন্ধকার হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো কেন এমন হ'লো। বাবা বললেন, "চিন্তা কোরো না। শ্রীকৃষ্ণের এই বিগ্রহকে আমরা দিল্লী নিয়ে যাবো এবং সেখানেই তোমরা পূজো দিয়ো।" তৎক্ষণাৎ সংকল্প করামাত্র সেই স্পষ্ট আলোকে দেখা গেল বাবার হাতে ঘরের ভেতরের শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের অবিকল এক প্রতিমূর্তি।

১৯৫৭ সালের ২রা আগস্ট, বাবা বিমানে দিল্লী ত্যাগ করে দুপুরবেলা কাশ্মীর উপত্যকার শ্রীনগরে পৌঁছলেন। বিমান থেকে নীচে দেখা গেল—পাঞ্জাবের বিখ্যাত সেচ খালগুলি, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, বানিহাল গিরিপথের রুক্ষ প্রবেশমুখ, এবং বিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকা। গিরিপথ পার হবার পরেই অপরূপ লাবণ্যময় কাশ্মীর উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হ'লো—যে উপত্যকা অধিকারের লালসায় অতীতে সুদূর ম্যাসিডোনিয়া এবং মঙ্গোলিয়ার নৃপতিরা ছুটে এসেছিলেন। নদীর কল্লোল, দেবদারু গাছের একটানা সারি, চিরসবুজ তৃণভূমি, অধিবাসীদের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রা মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। শ্রীনগরের শঙ্কর মঠের অধ্যক্ষ বাবাকে তাঁর আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করার জন্যে অনেক উপরোধ করলেন। কিন্তু বাবা হাউস বোটে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বাবা যে হাউস বোটে ছিলেন তার নাম 'আলেকজান্দ্রা প্যালেস।' তাঁর দলের আর সকলে রইলেন অন্য দুটি হাউস বোটে—'প্রিন্স অব কাশ্মীর' এবং 'কিংস রোজেস্'-এ।

প্রকৃতির শোভা উপভোগ করার জন্য বাবা সবাইকে উৎসাহ দেন। ফুলের সৌন্দর্য, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণালী, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ভয়ঙ্কর রূপ, মধ্যরাতের আকাশের গায়ে তারার ঝিকিমিকি. এবং নীলাকাশে যুঁই ফুলের মালার মত ভেসে চলা বকের পাঁতি—কোন দৃশ্যই বাবা উপভোগ না ক'রে থাকতে পারতেন না এবং উৎসাহভরে তিনি এইসব মনোরম দৃশ্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি সবাইকে নিয়ে শালিমার উদ্যান এবং নিশাতবাগ বেড়াতে গেলেন। হাউস বোটে ফেরার পথে তিনি বললেন, উপত্যকার ধূলি ধূসরিত পরিবেশ থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে

নেবার জন্যে ভগবানের সৃষ্টি করা, বরফে ঢাকা ঐ দূরের হিমালয় অনেক বেশী সুন্দর।

বাবার দলে ছিলেন ব্যবসায়ী, বণিক, আইনজীবী, অধ্যাপক, লেখক, কবি, সঙ্গীতশিল্পী, প্রশাসক এবং কৃষি-বিশারদগণ। হিমালয়ের তুষারাবৃত এলাকা দেখাবার জন্যে এদের নিয়ে বাবা ২রা আগষ্ট গুলমার্গ ও খিলানমার্গ যাত্রা ক'রলেন। তনমার্গ পৌছে ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হ'লো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪০০০ ফুট উঁচু এই জায়গায় পৌছনো ভীষণ কষ্টকর—একটানা কঠিন চড়াই-উৎরাই ভেঙে দীর্ঘ ১২ মাইল পথ অতিক্রম ক'রতে হয়। পথে বাবা হাসি-কৌতুকের মুক্তো ছড়াতে ছড়াতে চললেন, ভক্তরা সেগুলো কুড়িয়ে পথশ্রমের ক্লান্তি ভুলে গেলেন। মাঝে মাঝে বাবা বিভূতি এবং অন্যান্য উপহারও সৃষ্টি ক'রে দিচ্ছিলেন। 'রাজা' নামে সবচাইতে বড় এবং তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে বাবা চড়েছিলেন এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে ঘোড়াটিকে চালনা ক'রছিলেন। বিশ্রামের জন্য একবারও তিনি ঘোড়া থেকে নামেননি। পাহাড়ের সরু আঁকাবাঁকা পথে নানা প্রকার নুড়ি, পাথর ছড়ানো আর জায়গায় জায়গায় দেবদারু গাছের শেকড়ের জাল। কিন্তু ঘোড়াগুলো খুবই সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছিল। এইভাবে অবশেষে হিমরেখা অবধি পৌছানো গেল।

বাবা খালি পায়ে বরফের ওপর নেমে পড়লেন এবং বরফের গোলা তৈরী করে, সঙ্গীদের গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে শিশুর মত খেলা ক'রতে লাগলেন। শ্লেজ গাড়ীতে চড়ে বরফের ঢাল বেয়ে নামার সময় আরোহীদের চোখ মুখের ভয়কাতুরে অবস্থা দেখে তিনি খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন। কনকনে শীতের হাওয়ায় যারা কাঁপছিল তাদের ঠাট্টা ক'রলেন। রাত ১০॥ টায় হাউস বোটে সবাই ফিরে এলেন। প্রত্যেকে ভীষণ ক্লান্ত, সর্বাঙ্গে ব্যথা আর পায়ে ফোস্কা পড়ার অভিযোগ ক'রছিলেন। কিন্তু বাবাকে সতেজ গোলাপের মত দেখাচ্ছিল।

'আলেকজান্দ্রা প্যালেস' শীঘ্রই একটি ছোটখাট প্রশান্তি-নিলয়ম্ হ'য়ে উঠলো। শ্রীনগর থেকে অনেকে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে এবং তাঁর আশীর্বাদ নিতে এলেন। এক বৃদ্ধা এসে বললেন, তিনি আগের রাত্রে স্বপ্নে নির্দেশ পেয়েছেন

এই নৌকায় এসে বাবাকে দর্শন ক'রতে। শ্রীনগরের কয়েকটি পরিবারের আমন্ত্রণে বাবা তাদের গৃহে যাবেন বললেন। এইরকম এক গৃহে গিয়ে বাবা একটি শিশুর গলায় মালা পরিয়ে বললেন যে শিশুটি ভবিষ্যতে এক বিরাট যোগী হবে। আশ্চর্যের বিষয় শিশুর ঠাকুরদা জানালেন যে শিশুর জন্মের সময়ে তৈরী করা কোষ্ঠীতে ঐ একই কথা লেখা আছে এবং আরও আশ্চর্যের ব্যাপার ঠাকুরদার এই কথা শোনার আগেই বাবা তাকে বলেছিলেন "তোমাকে তো এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে তাই না?" যে ট্র্যাভেল এজেন্সী বাবার কাশ্মীর ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন, তারই সেক্রেটারী এই গৃহের মালিক। বাবা একটি পাথর বসানো আংটি সৃষ্টি ক'রে সেক্রেটারীকে দিলেন। কথাবার্তার সময় একজন বাবাকে জিজ্ঞেস ক'রলেন যে তিনি কবে ঘর-সংসার পরিত্যাগ ক'রেছেন। বাবা উত্তর দিলেন "সমগ্র জগৎ যাঁর ঘর-সংসার তিনি কিভাবে তা পরিত্যাগ করবেন?"

দু'দিন ধরে 'আলেকজান্দ্রা প্যালেসে' দর্শনার্থীর স্রোত আসতে লাগলো। তাদের প্রশ্নের উত্তরে বাবা তাঁর দিব্যত্ব নানাভাবে প্রকাশ ক'রলেন। ৬ই আগস্ট বাবার শ্রীনগর ত্যাগের দিন অগণিত ভক্তদের মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়েছিল এবং যাত্রাক্ষণ বিলম্বিত হচ্ছিল। শেষ অবধি বিমান দিল্লী অভিমুখে যাত্রা ক'রলো। এরপর বাবা বিমানে মাদ্রাজ যান কয়েক দিনের জন্য এবং অবশেষে ১৪ আগস্ট পুট্টাপর্তী পৌছান।

হস্ত-সঞ্চালন

শিশুকাল থেকেই বাবা শূন্যে হাত ঘুরিয়ে জিনিষ সৃষ্টি ক'রতেন। তাঁর খেলার সাথীদের মিষ্টি এবং লজেন্স সৃষ্টি ক'রে তাদের বিস্ময়ের উদ্রেক ক'রতেন। ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে বলা সত্ত্বেও কি ক'রে বড়রা টের পেয়ে যায় এবং তাদের কৌতূহলের জবাবে বাবা চুপ করে থাকতেন। পরে,

বন্ধুরা চেপে ধরলে বাবা বলতেন, তাঁর হুকুম মত এক দেবদূত এসব করেন। এর উত্তর অবশ্য এদের ক্ষান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কারণ গ্রামবাসীরা এই উত্তরেই সন্তুষ্ট থাকতো। এরা বাবাকে ঈশ্বরের বরপুত্র বলে শ্রদ্ধা ক'রতে লাগলো এবং খুব ভক্তি ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর সাথে আচরণ শুরু ক'রলো। স্কুলে থাকতেও বাবা তাঁর সহপাঠীদের জন্যে পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি সৃষ্টি ক'রে সাহায্য ক'রেছেন। কেউ ব্যথা বা অসুখের কথা জানালে বাবা একরকম সবুজ পাতা সৃষ্টি ক'রে বলতেন এগুলো হিমালয় থেকে আনা হয়েছে। তিনি এই পাতা চিবিয়ে এর রস তাদের খেতে বলতেন। কিছু বয়স্ক লোক অবশ্য একে ম্যাজিক আখ্যা দিয়েছিল। এবং কেউ কেউ একে তুকতাক বিদ্যাও বলেছিল, ছেলেমেয়েদের সাবধান ক'রেও দেওয়া হ'য়েছিল যাতে তারা সত্যনারায়ণের সাথে না মেশে।

অবতারত্ব ঘোষণার পর থেকেই বাবা নিয়মিতভাবে বিভূতি সৃষ্টি ক'রে সবাইকে নানা উদ্দেশ্যে বিতরণ ক'রতে আরম্ভ করেন। যেহেতু শূন্য থেকে এর সৃষ্টি এবং যেহেতু শিবের সাথে এর গভীর সম্পর্ক তাই অনেকে ভক্তিভরে একে কৈলাস-বিভূতি বলে। এর নাম বিভূতি, কারণ এটা ঐশ্বর্যের প্রতীক,—ভস্ম, কারণ সমস্ত পাপ দহন করে,—ভাষিতম্, কারণ আধ্যাত্মিক জ্যোতি বৃদ্ধি করে, —ক্ষরম্, কারণ বিপদমুক্ত করে,—রক্ষা,—কারণ অশুভ আত্মার বিরুদ্ধে বর্মের কাজ করে। বৃহৎ জবালা উপনিষদে এইভাবেই বিভূতির প্রশস্তি করা হ'য়েছে। বাবা বলেন যে বিভূতি সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই দেহ ক্ষণস্থায়ী এবং পরিশেষে একমুঠো ভস্মে পরিণত হয়।

হাজার হাজার ব্যক্তি বিভূতির অলৌকিক শক্তি স্বচক্ষে দেখেছেন। একে বুদ্ধিতে বা বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। এমন সাবলীলভাবে বাবা বিভূতি সৃষ্টি করেন যে অনেকে এই করুণার মর্মার্থ বুঝতে পারেন না। বাবার ডান হাতের করতল সামান্য কাত করে ধরা থাকে এবং এক বা কি দু'বার তিনি তা সঞ্চালন করেন। আঙুলগুলি একত্র করা থাকে যাতে বিভূতি সৃষ্টি হ'লে তা আঙুলের মধ্যে ধরা যায়। বিস্ময়করভাবে সৃষ্টি করা এই বিভূতি বাবা ভক্তের হাতে দেন বা কপালে লাগিয়ে দেন তাঁর করুণার চিহ্ন হিসেবে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় আধ কেজি করে সৃষ্টি হয় এই বিভূতি এবং এইভাবে আজ

পর্যন্ত বাবা যত বিভূতি সৃষ্টি ক'রেছেন তার মোট ওজন ৫ টনেরও বেশী হবে বলে অনুমান করা যায়।

প্রত্যেক কল্পনাই প্রকাশ পেতে চায় বাস্তবের আকৃতি নিয়ে এবং সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ইচ্ছাশক্তির ওপর, তা সে ইচ্ছা ভগবানেরই হোক বা মানুষেরই হোক। বাবা ইচ্ছা করেন এবং তা তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়।

বিভূতি জলে গুলে ওষুধ হিসেবে খাওয়া চলে। কবচ হিসেবে তা ধারণ করাও যায়। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এক মহিলা ভক্ত লিখেছিলেন যে তিনি প্রতিরাত্রে হাতে এক প্যাকেট বিভূতি নিয়ে শুতে যেতেন। এবং তিনি স্বপ্নে দেখতে পান যে তাঁর হাত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শ ক'রে আছে। বাবার সৃষ্টি করা বিভূতির সাহায্যে যে কতরকম অসুখ ভাল হ'য়েছে এবং কত যন্ত্রণা লাঘব হ'য়েছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নয়। বাবা যে বিভূতি দেন তা বহুরকমের। যার যেরকম বিভূতিতে উপকার হবে বাবা সেইরকম বিভূতি সৃষ্টি করে দেন। এর আকৃতিও নানা প্রকারের—কখনও শক্ত চতুষ্কোণ, কখনও মিহি গুঁড়ো, কখনও দানাপূর্ণ, কখনও বা তবকের মত। কখনও সুগন্ধি, কখনও ঝাঁঝালো, কখনও লবণাক্ত, কখনও মিষ্টি, কখনও স্বাদহীন। কখনও সাদা, কখনও কালো বা সাদা কালোর মাঝামাঝি রংয়ের। কোন কোন সময় বাবা বিভূতি রাখবার আধারও সৃষ্টি করেন। এক ব্যক্তি উচ্চশিক্ষার্থে ইংলণ্ডে যাবার সময় বাবা তাকে বিভূতি দেন একটি রূপার কৌটো সৃষ্টি ক'রে, তার মধ্যে এবং তার সঙ্গে বাড়তি আশীর্বাদ—'এই বিভূতি কখনও ফুরোবে না।' তাঁর সঙ্কল্পের এমনই শক্তি যে সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত স্থানে ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে বিভূতির পাত্র নিঃশেষ হওয়ামাত্রই আপনা আপনি আবার ভরে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে যদি ওষুধ হিসেবে বিভূতি সেবন ক'রতে হয়—যেমন অন্তঃসত্তা অবস্থায়—তখন বাবা একটি আধার আনতে বলেন এবং শূন্য আধারের ঢাকনার ওপর মৃদু আঘাত করামাত্রই তা বিভূতিতে ভরে যায়। ভক্তদের নিয়ে তিনি যখন নদীতীরে বালুচরে বসেন,—যেমন চিত্রাবতীতে বা ভেঙ্কটগিরির কৈবল্যে বা কেরালার কোডালামে বা তামিলনাদের কন্যাকুমারিকায় বা গোদাবরীতে—তখন বাবা ক্রীড়াচ্ছলে বালির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেন এবং তার ভেতর থেকে বিভূতির একটি মস্ত চাঙড় বের করেন। তারপর সেই

চাপড় ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে সবাইকে বিতরণ করেন। দু'হাত ভর্তি করে বালি নিয়ে একটি প্লেটে ঢালার পর দেখা যায় তা সুগন্ধি বিভূতি হ'য়ে গেছে।

মনে হয় বাবার সম্পূর্ণ দেহটি বিভূতিতে ভরা। বিজয়া দশমী বা অন্যান্য উৎসবের দিন বাবাকে শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাওয়ার সময় হাজার হাজার লোক পরিষ্কার দেখেছে বাবার ভুরু, চোখের পাতা এবং গাল থেকে বিভূতি ঝরে পড়ছে। যখন তিনি স্থূলদেহ ছেড়ে যান কোন ভক্তের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তখন তাঁর মুখমণ্ডল, মুখাভ্যন্তর, হাত, পা এবং কপাল থেকে বিভূতি নির্গত হয়। কপালে বিভূতি লেপন ক'রতে চাইলে তিনি অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কপালে দাগ দিলে সর্বসমক্ষে সেই দাগ বিভূতির দাগে পরিণত হয়।

এমনও ঘটনা ঘটেছে যে ভক্ত হয়তো স্বপ্ন দেখছে বাবা এসে তার কপালে বিভূতি লেপন ক'রছেন এবং ঘুম ভাঙার পর দেখা গেল সত্যি সত্যিই কপালে বিভূতি লেগে আছে। কেউ স্বপ্নে এমনও দেখেছেন যে বাবা তার মুখে বিভূতি ঢালছেন। জেগে উঠে সত্যিই মুখের মধ্যে বিভূতির চিহ্ন পাওয়া গেল। তিনি ভক্তের গৃহে তাঁর আবির্ভাবের সংকেত দেন ঠাকুর ঘরে যেখানে তাঁর ছবি রাখা আছে, তার সামনের মেঝেতে বিভূতি ছড়িয়ে। যখন বাবা কাউকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা ক'রতে তাঁর দিব্যদেহের দর্শন দেন, সেক্ষেত্রেও তিনি নিরাময়ের জন্য বিভূতি ব্যবহার করেন।

একবার দশেরা উৎসবের সময় তেলেঙ্গানা থেকে আসা একজন ভক্ত জরুরী টেলিগ্রাম পান তার শ্বশুর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন এবং তাঁর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। বাবা তাকে চিন্তা ক'রতে বারণ করলেন। কিন্তু পরদিন আবার একই খবর নিয়ে টেলিগ্রাম এলো। বাবা লোকটিকে একলা যাবার অনুমতি দিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে উৎসব দেখার জন্য রেখে যেতে বললেন। যদিও গুরুতর অসুস্থ পিতার শয্যাপার্শ্বে কন্যার উপস্থিত থাকার খুবই প্রয়োজন ছিল। যাত্রার পূর্বে জামাতাকে বাবা বিভূতি সৃষ্টি ক'রে দিলেন তার শ্বশুরের কপালে লাগাবার জন্যে। পরের দিন রাত ৮টার সময় বাবা ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করছেন লোকটি কোন্ ট্রেনে গিয়েছে এবং কটা নাগাদ গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে—এমন সময় তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—"তোমাদের মারাত্মক ভুল হয়েছে। ঐ ট্রেনে সে কখনো তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে না। পৌঁছতে

পৌঁছতে রাত ৯টা বেজে যাবে। ইস্, কি আফশোষের কথা।" তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বাবা সূক্ষ্মদেহে চ'লে গেলেন এবং আধঘণ্টা ঐ অবস্থায় রইলেন দেহে ফিরে এসে খুব খুশিমনে জানালেন যে তিনি তেলেঙ্গানা গিয়ে রুগীর দেহে নিজের হাতে বিভূতি লাগিয়ে এসেছেন। বাবাকে জিজ্ঞেস করা হ'লো, "জামাতার সাথে যে বিভূতি পাঠিয়েছেন এটা কি সেই একই বিভূতি ?" বাবা ব'ললেন, "হ্যাঁ, সে ফিরে আসুক। তখন সব জানতে পারবে। তাকে তখন জিজ্ঞেস কোরো, দেখবে সে বলবে যে সে রুগীর কাছে পৌঁছে দেখেছিল যে মোড়কের মধ্যে বিভূতি নেই।" ঠিক তাই হ'য়েছিল। লোকটি ফিরে এসে তার অভিজ্ঞতার কথা বললো—যখন টের পাওয়া গেল যে মোড়কের সব বিভূতি রহস্যজনকভাবে উড়ে গেছে তখন তার ভীষণ মন খারাপ হয়—তাকে সবাই দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে দোষ দেয়—তারপর সেই মোড়কের কাগজে যদি কিছু বিভূতি লেগে থাকে এই আশা করে সে আঙ্গুল দিয়ে কাগজটা চাঁছতে থাকে এবং চেঁছেও কিছু পাওয়া যায় না।

বিশেষ উৎসবের দিন মন্দিরে রক্ষিত, বাবার পূর্ব দেহ শিরডিবাবার, অভিষেক হয়। এইদিন বাবা আনুষ্ঠানিকভাবে সেই রজতমূর্তিকে বিভূতি দিয়ে স্নান করান। এই উপলক্ষে, একটি সূক্ষ্ম কারুকাজ করা ছোট একটি কাষ্ঠ-নির্মিত কলস ব্যবহার করা হয়। মূর্তির ওপর কাঠের সেই শূন্য কলস উপুড় ক'রে ধ'রে বাবা তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ঘোরাতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র বিভূতি সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টির ধারার মত মূর্তির মাথায় ঝ'রে পড়তে থাকে। বাবা এক একবার হাত ঘোরান আর তাঁর হাতের দিব্যস্পর্শে বহুক্ষণ ধ'রে অবিরাম ধারায়, ঝরঝর ক'রে বিভূতি সৃষ্টি হ'য়ে মূর্তির ওপর বর্ষিত হ'তে থাকে। এইভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মূর্তিটি সুগন্ধি বিভূতিতে সম্পূর্ণরূপে স্নাত হয় এবং বিভূতির ধারা স্তূপাকৃতি হ'য়ে মূর্তিটিকে একেবারে ঢেকে ফেলে। শেষ পর্যন্ত, ব'লতে গেলে. শারীরিক ক্লান্তিবশতঃই বাবা পাত্রটি নামিয়ে রাখেন।

বিভূতি প্রসঙ্গে আর এক প্রকারের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এই বিভূতি ঠিক হাত ঘুরিয়ে সৃষ্টি করা নয়। কোন একনিষ্ঠ ভক্তের অন্তিম সময়ে বাবা তাকে দর্শন দেন চিরশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে। এই ধরনের ঘটনায়, তাঁর আশীর্বাদধন্য

ভক্তের প্রাণত্যাগের মুহূর্তে বাবার মুখ থেকে বিভূতি নির্গত করা হয়—মৃত্যু, ধ্বংস বা অনিত্য বস্তুর বিনাশের প্রতীক হিসাবে। ১৯৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর শনিবার বিকেল ৫টা ২০ মিনিটের সময়, বাবা ভক্তদের একটি চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন 'হ্যা' এবং সঙ্গে সঙ্গে মেঝের ওপর অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে গেলেন—দেহে জীবনের কোন সাড়া নেই। প্রায় ১০ মিনিট পরে সামান্য নড়ে উঠলেন এবং তিনবার কাশলেন। কিন্তু আসলে তা কাশি ছিল না তাঁর মুখ থেকে তিনটি দমকের সঙ্গে এমন প্রবল-বেগে বিভূতি বের হলো যে তা প্রায় এক হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। পাঁচ মিনিট পর বাবা উঠে বসলেন, ক্লান্তি বা ক্লেশের কোন চিহ্ন নেই এবং পূর্বের আলোচনা আবার শুরু করলেন। দেহ ছেড়ে তিনি কোথায় গিছিলেন প্রকাশ করার জন্য বাবাকে অনুরোধ করায়, তিনি বললেন—"আমি দেরাদুন শহরে গিয়েছিলাম। ডাক্তার কৃষ্ণা, যে এখানে মাঝে মাঝে আসে, তার মা বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে মারা গেলেন। মহিলা তার নিজের নাড়ি টিপে ধরে বলেছিলেন, 'এই আমার শেষ নিঃশ্বাস'। ঘরে সকলে ভজন গান ক'রছে। তাঁর শান্তিতে মৃত্যু হয়েছে এবং আমি অন্তিম মুহূর্তে তাঁকে দর্শন দিয়েছি।"

ডাক্তার কৃষ্ণার চিঠি সোমবার এসে পৌঁছল। তিনি বাবাকে লিখছেন 'শনিবার বিকেলে ৫ট ৩০ মিনিটে আমার মা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা ঐ সময় ভজন করছিলাম। তিনি সর্বক্ষণ আপনাকে স্মরণ করছিলেন।' কি অলৌকিক ব্যাপার! বাবা, মৃত্যুর মুহূর্ত পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে মুমূর্ষু ভক্তের ব্যাকুল ডাকে সাড়া দিলেন, প্রশান্তি-নিলয়ম্ থেকে ১৫০০ মাইল দূরে দেরাদুনের এক ঘরে কি ঘটছে তার বর্ণনা দিলেন এবং দেহের বন্ধন কাটিয়ে আত্মার মুক্তিরক্ষণে অনিত্য দেহের বিনাশের প্রতীকস্বরূপ বিভূতি নির্গত হলো তাঁর মুখ থেকে।

শিরডির সাইবাবা তাঁর ভক্তদের যে রকম 'উদি' দিতেন তাঁর দেহধারী বর্তমান অবতারের বিভূতি সেই উদিরই অবিচ্ছেদ্য ধারা। শিরডির সাইবাবা তাঁর সামনের সদ্য-প্রজ্বলিত হোমকুণ্ড থেকে ভস্ম বিতরণ করতেন, তাতে সত্য সাইবাবার ভাষায় 'তাঁর হাতের কাছে সর্বদা ভস্ম মজুত থাকতো'।

বাবা ইচ্ছা মতন যে কোন জিনিষ হাত ঘুরিয়ে সৃষ্টি ক'রতে পারেন। বাবা

বলেন, এইসব জিনিষ পূর্ব থেকেই তাঁর ভাষায় 'সাই-ভাণ্ডারে' জমা থাকে এবং তাঁর ভাষায়, তাঁর 'কারিগররা' এমন চটপটে আর দক্ষ যে তাঁর মনে চিন্তার উদয় হওয়ামাত্র অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম কারুকাজ করা যে কোন জিনিষ তারা তৎক্ষণাৎ তৈরী ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে যায়!

একবার বাবা এক বেহালাবাদকের বাজনা শুনে একটি সোনার মেডেল সৃষ্টি করেন তাঁকে উপহার দেবার জন্যে। সবাইকে বাবা মেডেলটা দেখালেন। তার আকৃতি, ঔজ্জ্বল্য এবং সৌন্দর্য দেখে সবাই যখন প্রশংসামুখর, তখন বাবা বললেন, "ঐ যা! ভুল হয়ে গেছে। এতে তো নাম বসানো হয়নি।" এই বলে তিনি হাত মুঠো ক'রেই সাথে সাথে মুঠি খুললেন। সবাইকে আবার মেডেলটি দেখালেন। সবাই এই অলৌকিকত্বে অবাক হয়ে দেখলো এর ওপর গভীরভাবে খোদাই ক'রে ইংরাজীতে দিন ও তারিখ সমেত লেখা রয়েছে 'ভগবান শ্রীসত্যসাই বাবা কর্তৃক বিদ্বান টি. চৌডিয়ানকে প্রদত্ত।' মেডেলটি আমাদের দেখিয়ে বাবা কৌতুক ক'রে বললেন, "দেখলে তো, আমার কারিগররা কিরকম চটপটে!"

প্রশান্তি-নিলয়মের অনুষ্ঠানে যে সব শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন, যোগ্যতানুসারে তাদের আংটি, নেকলেস, মেডেল, ব্রোচ ইত্যাদি উপহার বাবা হাত ঘুরিয়ে সৃষ্টি ক'রে দেন। একজন বংশীবাদক, নাদেশ্বরম বিদ্বানকে বাবা শিবের মূর্তি খোদাই করা একটি আংটি দেন। খবর নিয়ে জানা যায় যে ঐ শিল্পীর পূর্ব-পুরুষরা সবাই ছিলেন এক শিবমন্দিরের বাদক। তাঁরা মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেবার পুরস্কারস্বরূপ কিছু জমিও দান হিসাবে পেয়েছিলেন। আংটির শিবমূর্তিটি ঐ মন্দিরের শিবমূর্তিরই প্রতিরূপ।

বাবা এক দর্শনার্থীকে বললেন, "আমি তোমাকে একটি গণেশমূর্তি দেবো। বাড়ী নিয়ে গিয়ে পুজো কোরো।" বিঘ্ননাশা গণেশের এই মূর্তিটি ছিল দণ্ডায়মান অবস্থায়। মূর্তিটি দেবার সময় বাবা তাকে বললেন, "তোমার ঠাকুর ঘরে এইরকম গণেশ মূর্তি রাখা আছে তাই না?" লোকটি উত্তর দিল "হ্যাঁ বাবা তাই।"

গ্রহীতাদের উপহারপ্রাপ্ত জিনিষগুলি ওজন ক'রে দেখা বা তার মূল্য যাচাই করা কোনক্রমেই উচিত নয়, কারণ সেগুলি একেবারেই পার্থিব বস্তু নয়।

একবার এক সঙ্গীত শিল্পী বাবার কাছ থেকে জড়োয়ার নেকলেস পেয়েছিলেন। বাড়ী ফেরার পথে তিনি এই গহনার দাম নিয়ে আলোচনা সুরু করেন, হঠাৎ গলা থেকে নেকলেসটি রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ভাবে শাস্তিলাভ ক'রে তিনি তক্ষুণি প্রশান্তি নিলয়ম্ ছুটে আসেন। বাবা তাকে মৃদু তিরস্কার করলেন এবং তার চোখের সামনে ঐ একই নেকলেস সৃষ্টি ক'রে পুনরায় উপহার দিলেন।

বাবার উপহার দেওয়া জিনিষ কখনো হারিয়ে যায় না। পুট্টাপর্তী থেকে হায়দ্রাবাদ ফেরার সময় মহবুব নগরের কাছে রাত্তিরবেলা এক ভক্তের সমস্ত মালপত্র চুরি যায়। মহিলাটি রেল পুলিশকে খবর দেন। দু'দিন পরে চোর ধরা পড়ে, অপহৃত মালপত্র সমস্তই পাওয়া যায় এবং পুলিশ সেই মহিলাকে ডাকে মাল সনাক্ত করার জন্য। মহিলাটি যখন দেখলেন সব ঠিক আছে, শুধু বাবার দেওয়া জপমালাটি নেই, তখন তাঁর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। তিনি বাবাকে টেলিগ্রাম ক'রলেন। বাবা উত্তরে জানালেন যে জপমালা তাঁর কাছে আছে, কারণ কোন চোরের সাধ্য নেই তা চুরি করে। এই মহিলা বাবার কাছ থেকে যখন সেই একই জপমালা দ্বিতীয়বার উপহার পেলেন তখন তার আনন্দের সীমা ছিল না।

একজন ভক্ত সি. এন. পদ্মা লিখছেন, "১২ বছর আগেকার কথা। পুরোনো মন্দিরের সকলকে নিয়ে বাবা নদীর বালুচরে একদিন সন্ধ্যায় গেলেন। সেখানে ভজনের পর বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন এবং আমার কিছু ব্যক্তিগত সমস্যায় সান্ত্বনা দান ক'রে একটি জপমালা সৃষ্টি ক'রে আমাকে দিলেন। এর পূর্বেই তিনি আমাকে একটি জপমালা দিয়েছিলেন এবং সেটা আমি খুব সাবধানে বাড়ীতে একটি রূপোর কৌটোর মধ্যে রেখে এসেছিলাম। দ্বিতীয়বার জপমালা দেওয়াতে আমি শংকিত মনে ভাবলাম বোধহয় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে তাই বাবা আমায় রক্ষা করবার জন্যে এই বাড়তি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "কেন বাবা, আবার আমাকে কেন জপমালা দিলেন?" বাবা বললেন, "আগে যে জপমালা দিয়েছিলাম, সেইটাই এটা। তোমার বাড়ীতে যে রূপোর কৌটোর মধ্যে তুমি তা রেখেছিলে সেটি কাল চুরি গেছে। এই নাও, সাবধানে রাখবে।" সত্যিই

আমি বাড়ী গিয়ে দেখলাম বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে এবং রূপোর কৌটো নেই।

শ্রীমতী সুকাম্মার হীরের আংটির ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর আগে তিনি দশেরার উৎসবে পুট্টাপর্তীতে তাড়াহুড়ো ক'রে এসেছিলেন। মালপত্র বাধা-ছাদা করার সময় হুড়পাড়ের মধ্যে হীরের আংটিটি ভুল হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন পর যখন টের পাওয়া গেল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, খুঁজে কোন লাভ হতো না। মহিলাটি বাবাকে একথা জানালেন। বাবা ব্যাপারটা শুনে একটু কৌতুক করলেন এবং মহিলার লোকসানে খুব একচোট হাসলেন। কয়েকমাস পরে বাবা ঐ মহিলার কফি তৈরীর কারখানা দেখতে যান। কারখানার পেছনে একটি ছোট বাড়ীতে রান্নাঘরে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বাবা বললেন 'বেচারী সুকাম্মা। হীরের আংটিটা তোমার ভীষণ দরকার। তাই না? বেশ। এই নাও।" এই বলে তিনি পাশের দেয়ালে আঘাত করলেন এবং অবাক কাণ্ড বাবার হাতে আংটিটা এসে গেল। এই হাত যদি দেবতার না হয় তবে কোন হাত দেবতার!

এমনও হয়েছে বাবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে জলকে পেট্রোলে পরিণত করেছেন এবং এই পেট্রোলে গাড়ীও কয়েক মাইল চলেছে। একবার ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার পথে চিক্‌বাল্লাপুরের কাছে গাড়ীর পেট্রোল শেষ হয়ে যায়। বাবা একজনকে পাশের পুকুর থেকে জল আনতে বললেন এবং বাবা হাত দিয়ে স্পর্শ করার পর সেই জল গাড়ীর পেট্রোল ট্যাঙ্কে ঢালা হলো। এর পর মাইলের পর মাইল গাড়ী চললো—ইঞ্জিন কোন গোলমাল করলো না। আর একটি ঘটনাও উল্লেখ করার মত। উৎসবের আলোকসজ্জার জন্যে প্রশান্তি-নিলয়মে যে ডায়নামো আছে একবার তার ডিজেল তেল ফুরিয়ে যায়। তখন এমন সময় ছিল না যে ২০ মাইল দূরে ডিজেল আনতে কাউকে পাঠানো যায়। বাবা জলের মধ্যে হাত দিলেন এবং জল পরিণত হ'লো ডিজেল তেলে!

এই ধরনের আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল হর্স্‌লি পাহাড়ে। সেখানে কয়েকদিন. অল্প কয়েকটি ভক্তের, বাবার দিব্যসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হ'য়েছিল। প্রতিদিন সকালে অরণ্যের মধ্যে একটা পাথরের চাটানের ওপর বাবা বসতেন এবং ধর্মালোচনা ক'রতেন। একদিন, সেই জায়গায় হাঁটতে

হাঁটতে গিয়ে বাবা একটি অদ্ভুত আকারের পাথর কুড়িয়ে পেলেন। দেখতে অনেকটা শক্ত করে বাঁধা এক বাণ্ডিল মোটা সিমাই-এর মত। বাবা কথা বলার সময় পাথরটিকে সামনেই রেখেছিলেন। আলোচনা শেষ হ'লে বাবা বললেন, "আমি তোমাদের একটু মিষ্টিমুখ করাবো।" বাবা পাথরটি হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সেটি আশ্চর্যজনকভাবে ঠিক ঐ পাথরটির মত সরু সরু লম্বা লম্বা কাঠির আকারের মিছরিতে পরিণত হ'লো। পাথরের প্রতিটি অণু-পরমাণু মিছরিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মিছরির এইরকম লম্বা কাঠির মত আকৃতি কেউ কখনো চোখে দেখেনি। কিন্তু এতো মানুষের রসায়নবিদ্যা নয়! এ হ'লো দিব্যরসায়ন !!

শ্রীমতী সুকান্মা একবার পুট্টাপর্তীতে চশমা ভেঙ্গে যাওয়ায় খুব অসুবিধা ভোগ ক'রছিলেন। বাবা অবিকল ঐরকম চশমা সৃষ্টি করে তাঁকে দিয়েছিলেন।

একবার মাদ্রাজে জন্মাষ্টমীর দিন বাবা উপস্থিত থাকায় ভক্তরা উৎসবটি বিরাট আকারে পালন করার আয়োজন ক'রছিলেন। ভজন হল সুসজ্জিত করা হ'লো এবং ভক্তদের কাছে নিমন্ত্রণলিপিও গেল। হলের এক প্রান্তে, পূজাবেদীর কাছে এই উপলক্ষে বিশেষভাবে তৈরী একটি আসনে বাবা এসে বসেছেন। ভজনের শেষে বাবা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে সবাই উঠে দাঁড়ালো। বাবা মাথার ওপর দু'হাত তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। ভক্তরা বাবার এই ভঙ্গী পূর্বে কখনো দেখেনি বলে তাঁর হাত দুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। ব্যাপারটা তাঁদের কাছে খুব আশ্চর্যজনক লেগেছিল। কিছু ভাববার সময় পাবার আগেই তারা দেখলো বাবা দু'হাতের মধ্যে একটি কাঁচের বাটি ধরে আছেন। বাটিটির গায়ে পাখীরা ডানা মেলে আছে—এই রকম খুব সুন্দর নকৃশা করা। বেশ ভারী ওজনের ঐ বাটিটি বাবা বেদীর ওপর রাখলেন এবং ঘোষণা ক'রলেন, "বৃন্দাবন থেকে বিশেষ প্রসাদ এসেছে।" এই পাত্রের মধ্যে ৪৩ প্রকারের বিভিন্ন মিষ্টান্ন ছিল!

একদিন বাবা দুটো জীপে ক'রে ভক্তদের নিয়ে চিত্রাবতী নদী পার হয়ে ওপারের সংরক্ষিত অরণ্যে প্রবেশ ক'রলেন। পাহাড়ী রাস্তার চড়াইয়ে জীপ উঠতে না পারায়, বাবা সকলের সঙ্গে পায়ে হেঁটে নদীর ওপরের দিকে ৬ মাইল গেলেন। অবশেষে তারা অরণ্যমধ্যস্থ একটি মনোরম স্থানে এসে উপস্থিত

হ'লেন। তিন দিকের খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নদী কুলকুল ক'রে বয়ে চলেছে। এরই মধ্যে পাথরের একটি চাটানে সবাই বসলেন। সঙ্গে আনা খাবার খাওয়া হ'লো। কয়েকজন উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় চাও তৈরী হ'লো। বাবা এদের মুখমিষ্টি করার জন্যে মিছরি সৃষ্টি ক'রে দিলেন। তারপর বাবা হাত সঞ্চালন ক'রলেন এবং সবাই বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই অলৌকিকত্ব দেখলো। বাবার হাতে এক গোছা তাঁর নিজেরই ছবি। মোট ষোলজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন এবং বাবা ঠিক ষোলটা ছবিই সৃষ্টি ক'রেছিলেন! বাবা প্রত্যেক ভক্তকে একটি ক'রে ছবি উপহার দিলেন। দলে বেশী লোক থাকলে বাবা বেশী ছবি সৃষ্টি করেন এবং সব সময়েই ছবির সংখ্যার সঙ্গে লোকের সংখ্যা মিলে যায়।

বাবার ঐশীশক্তির প্রকাশ আর একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। সেটি ঘটেছিল ১৯৫৮ সালে, কন্যাকুমারিকাতে। সমুদ্রের তীরে ভক্তদের নিয়ে ব'সে বাবা একটি লোককে জিজ্ঞেস ক'রলেন তীর্থমাহাত্ম্যের ওপর যে বইটি সে কিনেছে তাতে স্থানীয় মন্দির সম্বন্ধে কি লেখা আছে। সে বললে যে মন্দিরের দেবীমূর্তির নাকে এককালে একটি বহুমূল্য হীরে বসানো ছিল। এই হীরকের দ্যুতি এমন জলজল ক'রতো যে সমুদ্রবক্ষ থেকে তা জলদস্যুদের নজরে পড়ে। জলদস্যুরা লোভের তাড়নায় সেই মন্দির আক্রমণ ক'রে সেই হীরেটি লুট করে নিয়ে যায়। বাবা জিজ্ঞেস ক'রলেন "তোমরা কি সেই হীরে দেখতে চাও? কয়েক মিনিট মাত্র লাগবে এবং কেউ টের পাবার আগেই হীরেটি আবার যথাস্থানে চলে যাবে।" বাবা তাঁর সামনের বালির ওপর মৃদু আঘাত করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে একটি বিরাট হীরকখণ্ড দেখা গেল! প্রত্যেককে সেই হীরেটি দেখানোর পর আবার বাবার হাত থেকে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। বাবার প্রতিটি সৃষ্টি এই রকম বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয় এবং সৃষ্টির মুহূর্তে তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয় এক বিস্ময়মিশ্রিত দিব্য হাসিতে।

এক ভক্ত একটি একটাকার নোট যত্ন ক'রে রেখেছিলেন কারণ তাতে তার বন্ধুর স্বাক্ষর ছিল। একদিন ব্যাঙ্গালোরে তিনি ভুল ক'রে ঐ নোটটি অন্য নোটের সঙ্গে মিশিয়ে খরচ ক'রে ফেলেন। নোটটির অভাবে তিনি খুব ম্রিয়মান হয়ে পড়েন। সাতদিন পর বাবা ব্যাপারটি জানতে পেরে ব'ললেন,

"চিন্তা কোরো না। নোটটি এখনও বম্বে চলে যায়নি। আমি দেখতে পাচ্ছি সেটি কোথায় আছে। আমি তোমায় নোটটি এনে দেবো।" বাবার হাত সঞ্চালিত হ'লো। সাক্ষরিত সেই নোটটি বাবার হাতে এলো এবং ঐ ভক্তের হাতে বাবা নোটটি তুলে দিলেন।

বাবা গীতা সৃষ্টি করে ভক্তদের বিতরণ ক'রেছেন। একটি ক্ষীণ দৃষ্টি-সম্পন্ন বৃদ্ধ ভক্তকে গীতা সৃষ্টি করে দেবার সময় বাবা বললেন, "দেখ, এর অক্ষরগুলো তোমার সুবিধার জন্য বড় এবং মোটা হরফে ছাপা হয়েছে।" সত্যিই গীতাটি সেই ভাবেই ছাপা ছিল। বিজ্ঞানের ডক্টরেট এক প্রফেসর ভক্তকে বালির ভেতর থেকে গীতা সৃষ্টি করে দেবার সময় বাবা বললেন. "তুমি তো দেবনাগরী লেখা পড়তে পারবে না, তাই তোমার জন্যে এই গীতা তেলুগুতে ছাপা হয়েছে। এই নাও।" নিত্য পূজার জন্যে তিনি শিবলিঙ্গ, কৃষ্ণ এবং অন্য অনেক দেব-দেবীর মূর্তি সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন। ক্রুশে বিদ্ধ যীশুখ্রীস্টের প্রতিমূর্তি এবং রহস্যময় গোপন সংকেতলিপি লেখা ফলকও বাবা হস্তসঞ্চালনের দ্বারা সৃষ্টি ক'রেছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টি আকারে, রূপে এবং সৌন্দর্যে নিখুঁত।

বাবা যেসব ছবি উপহার দেন, সেগুলি কখনো শুধু তাঁর ছবি, কখনো শিরডি সাইবাবার সঙ্গে তাঁর ছবি, আবার কখনো ভক্তের ইষ্ট দেবতার সঙ্গে তাঁর ছবি। এই ছবিগুলির কোন কোনটি আবার অন্য ধরনেরও হয়। এইরকম একটি ছবি হ'লো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। এই ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বুকে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের চার কোণে শিরডি সাইবাবার ছবি এবং এর ঠিক মাঝখানে শ্রীসত্য সাইবাবার ছবি। একবার বাবা তাঁর শ্রীচরণে একজোড়া রূপোর পাদুকা সৃষ্টি করেন এবং এক ভক্তকে তা উপহার দেন।

বাবা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জিজ্ঞাসু ভক্তকে পরামর্শ দান ক'রে বলেন যে দেবতার রূপ ও নাম তার সব চাইতে বেশী ভাল লাগে সেই নামই যেন সে স্মরণ করে এবং সেই রূপই যেন সে ধ্যান করে। তিনি কৌশল ক'রে কারুর স্থান অধিকার ক'রতে আসেননি বা কাউকে বিনাশ ক'রতেও আসেননি। তিনি এসেছেন সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার সংকল্প কার্যে পরিণত ক'রতে এবং সার্থক ক'রতে।

একদিন সন্ধ্যায় নদীর বালুচরে এক ব্যক্তি এলেন। তাঁর বুকে একটি ব্যাজ লাগানো—তাতে 'কুসুম ও হরনাথ' নামক সাধকদম্পতির প্রতিকৃতি। বাবা সংক্ষেপে সেই সাধকদম্পতির জীবনী শোনালেন এবং ব'ললেন যে তাঁরা নামসংকীর্তনের মহিমা প্রচার ক'রে গিয়েছেন। কথা বলার ভেতরেই বাবা বালি থেকে একটি সুন্দর রূপোর মূর্তি সৃষ্টি ক'রলেন—কুসুম ও হরনাথের মূর্তি—সাপের কুণ্ডলীর ওপর দাঁড়ানো ভঙ্গিমায়, এবং মাথার ওপর সেই সাপটি ফণা বিস্তার ক'রে আছে। কুসুমের মূর্তির কপালে কুমকুমের সত্যিকারের একটি টিপও রয়েছে! একটি ভক্ত, বাবাকে শিবরূপে পূজা ক'রতেন। বাবা তাকে একটি বড় আকারের রঙ্গিন শঙ্খ দেন এবং সেই শঙ্খের গায়ে 'শিব সাই' কথাটি খোদাই করা ছিল। প্রত্যেককে তাঁর নিজের অভীষ্ট পথে নির্ভীকভাবে চলবার জন্যে বাবা উৎসাহ দেন এবং তাঁর প্রেম ও জ্ঞান দিয়ে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

বাবা যেসব জিনিষ সৃষ্টি ক'রেছেন তার মধ্যে আছে—চন্দনকাঠের মূর্তি, রূপোর বিগ্রহ, রূপোর পাদুকা, হাতির দাঁতের মূর্তি, পঞ্চধাতুর মূর্তি, এক রক্তবর্ণ চুনি, সবুজ বা নীল রঙের পোখরাজ ও নীলকান্ত মণি নির্মিত শিবলিঙ্গ। এছাড়া আছে রত্নখচিত আংটি ও লকেট। এগুলির আকৃতি এবং সৌন্দর্য নির্ভর করে সৃষ্টির মুহূর্তে বাবার সংকল্প এবং প্রয়োজনের ওপর। কোন ভক্তের হাতে রত্নখচিত মূল্যবান আংটি দেখতে পেলে বাবা হাসতে হাসতে তাকে বলেন যে মজুরী গ্রহণ না ক'রে দামী পাথরের বোঝা কেন সে বহন ক'রছে। এই বলে আংটিটি খুলে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাবা তার গায়ে হাত দিয়ে একটু আঘাত করামাত্র আংটির দামী পাথরগুলি অদৃশ্য হ'য়ে যায় এবং তার জায়গায় শিরডি সাইবাবা, শ্রী সত্য সাইবাবা বা কখনো উভয়ের ছবি একত্রে খোদাই করা দেখা যায়। এই ছবি রাম, কৃষ্ণ বা অন্য কোন দেবদেবীরও হ'তে পারে।

ভেঙ্কটগিরিতে একপাতা ডাকটিকিট রাখা আছে সেটা বহুবছর আগে অলৌকিকভাবে বদলে গিয়েছিল। ডাকটিকিটের ওপর রাজার ছবি দেখে বাবা ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন, "তোমরা এরকম জিনিষ রেখেছ কেন?" কথা বলতে বলতে তিনি টিকিটের পাতার ওপর হাত বোলালেন। দেখা গেল

টিকিটের ওপর থেকে রাজার ছবি অদৃশ্য হ'য়ে গেছে আর তার জায়গায় বাবার ছবি। ছবির নীচে ছাপা রয়েছে 'শ্রী সত্যসাই!' কোন সাধককে মন্ত্রদীক্ষা দেবার ইচ্ছা হ'লে বাবা হাতের কাছে যে কোন কাগজের টুকরো নিয়ে তাকে সরু ক'রে পাকিয়ে নেন—প্রায় একটা সরু স্ঁচের মতন। মুহূর্তের মধ্যে কাগজটি রুপো কিংবা হাতির দাঁতে পরিণত হয় এবং তার গায়ে ইষ্টদেবতার ছবি খোদিত হ'য়ে যায়। এরপর বাবা ঐ কাঠি দিয়ে সাধকের জিভের ওপর কিছু গোপন সাংকেতিক শব্দ লেখেন এবং গুরুকৃপার নিদর্শন স্বরূপ সেটি তাকে উপহার দেন।

বাবার হাতের আর একটি অলৌকিক শক্তি আছে,—কোন বস্তু স্পর্শ করা মাত্র তার সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধি করা। যেমন, লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যের অকুলান হলে, বাবা সেই খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন। তিনি ইচ্ছা করেন হাত দিয়ে স্পর্শ করেন এবং তৎক্ষণাৎ পাত্র ভরে যায়। ১৯৫০ সালের বিজয়া দশমীর দিন এইরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। অনন্তপুর থেকে ভক্তেরা দু'ঝুড়ি ভর্তি করে তুলসীপাতা এনেছিলেন। সেই তুলসীপাতা দিয়ে তারা ঝুড়ির চারপাশে বসে মালা গাঁথছেন। মালা গাঁথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং ঝুড়ি প্রায় খালি। এমন সময় বাবা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু কৌতুক আর কিছু আগ্রহ মিশিয়ে তিনি ওদের জিজ্ঞেস ক'রলেন "কি ? সব ফুরিয়ে গেল ? বাজি ধরবে নাকি যদি আরো দু'ঝুড়ি তুলসীপাতা দিই ?" ওরা তো প্রস্তাব শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলো। বাবা নীচু হ'য়ে ঝুঁকে ঝুড়ি দুটির ভেতরে দুহাত ঢোকালেন। বাবা যখন সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন তখন দেখা গেল ঝুড়ি দুটি টাটকা সবুজ তুলসীপাতায় উপছে পড়ছে।

এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রশান্তি-নিলয়মে উৎসবের দিনে হাজার হাজার ব্যক্তিকে খাওয়ানোর সময় বাবা কেন নিজের হাতে পরিবেশন করেন। প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করেও সর্বদা খাবার উদ্বৃত্ত থাকে। প্রাচুর্যই ঐ শ্রীহস্তের চিহ্ন।

উৎসবের শোভাযাত্রায় বাবা পুষ্পসজ্জিত শিবিকায় বসে থাকেন। ভক্তরা তাঁকে যে সব মালা নিবেদন করেন, বাবা তার পাপড়িগুলি ভক্তদের মাথার ওপর ছুঁড়ে দেন। মাটিতে পড়ার সময় সেগুলি কখনো পিপারমিণ্ট, কখনও

মুদ্রা, কখনও শিরডি সাইবাবার বা শ্রীসত্য সাইবাবার ছবি, কখনও একত্রে উভয়ের ছবি হয়ে ঝরে পড়ে। কেউ বলতে পারে না কি পড়বে বা কখন পড়বে। ঐ হাতে এমনই রহস্য লুকিয়ে আছে। ১৯৫০ সালের ২৩শে নভেম্বর প্রশান্তি-নিলয়মের দ্বারোদ্ঘাটনের দিন, পুরোনো মন্দির থেকে নিলয়ম্ পর্যন্ত শোভাযাত্রায় এইভাবে যেসব জিনিষ বর্ষিত হয়েছিল, আজো কয়েকজন ভক্তের কাছে সেগুলি সযতনে রাখা আছে। এই জিনিষগুলি চিরকাল অবিকৃত এবং উজ্জ্বল থাকবে, কারণ অন্যান্য যে কোন পার্থিব বস্তুর মতই এগুলি স্থায়ী।

সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ বলেন যে তিনি দীর্ঘদিন হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। বাবা ব'ললেন, অশুদ্ধ প্রণালীতে হঠযোগ অভ্যাস করার জন্যই এই রোগ হয়েছে এবং বৃদ্ধিলাভ করেছে। যে কয়েকমাস তিনি পুট্টাপর্তী ছিলেন, বাবার দেওয়া ওষুধে তাঁর শ্বাসকষ্ট দূর হয় এবং স্বামীজি হাঁপানির ভয়ঙ্কর কষ্ট থেকে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে ওঠেন। এই ওষুধ সম্পর্কে স্বামীজি বলেন 'প্রথম দুদিন বাবা বিভূতি সৃষ্টি করে দিলেন। তৃতীয় দিন বাবা সোনালী রংয়ের মোটা দানার একরকম গুঁড়ো ওষুধ সৃষ্টি ক'রে আমার মুখে ঢেলে দিলেন। তারপর তিনি ঘুরে ঘুরে চারদিকের এক একদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং প্রতিবার হস্ত সঞ্চালনদ্বারা তাম্রবর্ণ একরকম গুঁড়ো ওষুধ সৃষ্টি ক'রে আমার বুকে ও পিঠে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর শ্বাসকষ্টের সময় খাওয়ার জন্যে বিভূতি সৃষ্টি করে তিনি আমার হাতে দিলেন। আর একদিন বিশেষ একজাতের গাছের নরম এবং রোঁয়ামুক্ত শেকড় সৃষ্টি করে আমাকে চিবিয়ে খেতে বললেন। আর একদিন তিনি আমাকে একপ্রকার অতিক্ষুদ্র কলা দিলেন। এ ধরনের কলা আমি ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয় বা হিমালয়ের কোথাও দেখিনি। তিনি একটি বিচিশূন্য খেজুরও দিয়েছিলেন। একমুঠো গাছের পাতা সৃষ্টি করে তার থেকে নিংড়ে রস বের করলেন এবং একটি পাত্র সৃষ্টি করে তার ভেতর সেই রস ঢেলে আমাকে পান করবার আদেশ দিলেন।

"আর একদিন তিনি একগোছা সবুজ পাতা সৃষ্টি করলেন এবং চোখে দুষ্টুমিভরা হাসি নিয়ে আমার হাতে দিয়ে সবটা খেয়ে ফেলতে বললেন। পাতাগুলিতে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ কাঁটা লক্ষ্য করে আমি একটু চমকে উঠলাম। তাঁর দিকে মিনতিপূর্ণ চোখে তাকালাম এই চিন্তা করতে করতে "আপনি

কি সত্যি সত্যি চান যে আমি এইসব কাঁটাসমেত পাতা চিবিয়ে খাই ?" বাবা একটু যেন নরম হলেন এবং হাত বাড়িয়ে বললেন, "ওগুলো আমার হাতে দাও।" তাঁর হাতে পাতাগুলো দিলাম। তিনি আবার সেগুলি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু, এবারে এতে একটিও কাঁটা নেই। এমনকি, কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই যে পাতাগুলি ঐ জাতের। অতএব আমি মহানন্দে সবটা চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম। কয়েকদিন পরে বাবা তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং হাত সঞ্চালন ক'রে প্রচুর সবুজ রংএর পাতা আবার সৃষ্টি করলেন। বললেন, "এই রোগের এটি খুব ভাল ওষুধ। সোজা হিমালয় থেকে এসেছে।" নিজের কাছে অর্ধেক রেখে বাকি অর্ধেক আমার হাতে দিয়ে বললেন—"নাও, চিবিয়ে খেয়ে ফেল।" এগুলি ভয়ঙ্কর তেতো ছিল এবং আমি এপর্যন্ত তপস্যায় যত শক্তি আয়ত্ত ক'রেছি সবটুকু একত্র করে তাঁর আদেশমত এই কার্য পালন করলাম। সেই সঙ্গে মনে মনে যে কি আকুল প্রার্থনা ক'রছিলাম যাতে বাবা এবারের মতন ক্ষান্ত হন এবং তাঁর কাছে রাখা বাকি অর্ধেক খাবার জন্য আমাকে আর বাধ্য না করেন তা শুধু আমিই জানি। ছিন্তু বাবা কৃপা ক'রলেন না। ঐ প্রচণ্ড তেতো পাতার বাকিটা আমাকে দিয়ে আদেশের সুরে বললেন, "এগুলোও শেষ ক'রে ফেল।" সাহসে বুক বেঁধে দ্বিতীয় দফার পাতাগুলো ধীরে ধীরে মুখে পুরলাম। কিন্তু অবিশ্বাস্য কাণ্ড, তাঁর দিব্যহস্তে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে পাতাগুলি আর তেতো লাগছে না—আখের রস বা মধুর চেয়েও মিষ্টি লাগছে—এ মিষ্টত্ব বর্ণনা করা যায় না। আমার আনন্দ আর স্বস্তি দেখে বাবা খুশীতে হেসে উঠলেন। আমি উপলব্ধি করলাম ভগবানের লীলা বোঝা সত্যিই দুষ্কর।" এই অকপট বিবরণ যে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দিয়েছেন তিনি দীর্ঘকাল রমণ মহর্ষির সঙ্গে ছিলেন এবং বেদ-বেদান্তে একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি বলে সুপরিচিত।

অসুখের জন্য রোগীকে কোন ওষুধ দেবার ইচ্ছে বাবার মনে জাগলে, তিনি হাত ঘুরিয়ে বড়ি, পাউডার, শিশিসমেত মিক্সার, মলম, সিরাপ, তেল বা ফল সৃষ্টি করেন। কখনো মজা ক'রে তিনি কাউকে একটি ফল ছুঁড়ে দিয়ে ধরতে বলেন এবং ভাগ্যবান লোকটির হাতে এসে পড়ার পূর্বেই সেটি অন্য ফল হ'য়ে যায়। কখনো খালি হাতে কারো দিকে তাক ক'রে কোন কিছু ছুঁড়ে দেবার

ভঙ্গী করেন। যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ছোঁড়ার ভান করা হ'লো, সে একটু অসতর্ক হলেই বিপদ, কারণ ইতিমধ্যেই, শূন্যে সৃষ্ট, তার দিকে ছুটে আসা ফল, তার হাত ফসকে পড়ে যেতে পারে! একবার একজনের অনবরত হাঁচি হতে থাকায় বাবা তাকে ডেকে কিছু মিষ্টি সৃষ্টি করে খেতে দেন। আর একজন বহুদিন ধরে জ্বরে ভুগছিল। বাবা তার বিছানার পাশে গিয়ে শূন্যে হাত ঘুরিয়ে কিছু সৃষ্টি ক'রে রোগীটির হাতে রাখলেন। রোগী সসম্ভ্রমে উঠে বসলো দান গ্রহণ করবার জন্যে। কিন্তু জিনিষটি ছিল একটি বড় ভোমরা! ভোমরাও উড়ে গেল—জ্বরও পালালো!

একবার এক ভক্ত মাদ্রাজে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিপ্লোমা নিতে যোগ দেবার জন্য পুট্টাপর্তী থেকে যাত্রা করার অনুমতি প্রার্থনা করায় বাবা তাকে বললেন, "আমি এখানেই তোমাকে ঐ ডিপ্লোমা দেব।" বাবা হাত ঘোরালেন এবং মাদ্রাজে যে ডিপ্লোমা অপেক্ষা ক'রছিল তারই অবিকল এই ক্ষুদ্র সংস্করণ সৃষ্টি ক'রে তার হাতে দিলেন। ১৯৬১ সালে মহীশূরের এক ভক্ত পরিবার পুট্টাপর্তীতে গৌরীপূজার দিন বাবাকে পূজা ক'রবেন বলে আয়োজন করেন। পুট্টাপর্তী এবং বুক্কাপট্টনম থেকে এরা পূজার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন কিন্তু কালো পুঁতি কোথাও খুঁজে পেলেন না। বাবা এলেন পূজা নেবার জন্যে। এই দম্পতির আনন্দের সীমা নেই। তাঁরা নিবিষ্ট মনে বাবার চরণ-পূজা করতে লাগলেন। কিন্তু একটা বড় কালো পিঁপড়ে বাবার চরণে অর্ঘ্য দেওয়া ফুলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটা এরা লক্ষ্য করেননি। বাবা কিন্তু পিঁপড়েটি দেখেছিলেন। তিনি সেটাকে আলতোভাবে আঙ্গুলে তুলে ধরে মজা ক'রে বললেন, "কি ব্যাপার! তোমরা কি আজকাল ফুলের বদলে পিঁপড়ে দিয়ে পূজো ক'রছো?" বাবা পিঁপড়েটিকে হাতে দেওয়ামাত্র তা দুটো কালো পুঁতিতে পরিণত হ'লো।

বাবার হাতের ঐশীশক্তির আর একটি বিস্ময়কর উদাহরণ—একদিন সন্ধ্যায় বাবা তাঁর ঘরের আধখোলা জানালার কাছে এমনি দাঁড়ালেন। দেখলেন জানালার তাকে একটি টেবিল ল্যাম্প রয়েছে। কেউ বুঝতে পারছে না বাবার উদ্দেশ্য কি। উপস্থিত সবাই দেখলো বাবা হাত ঘোরাচ্ছেন। ভক্তরা বাবার হাতে কি এসেছে দেখবার জন্যে দ্রুত এগিয়ে এলেন। তাঁরা দেখলেন

বাবারই একটি রঙ্গিন স্বচ্ছ ছবি সৃষ্টি হয়েছে তাঁর হাতে। স্পষ্টতই বাবা ইচ্ছে ক'রেছিলেন যে টেবিল ল্যাম্পের ঢাকনার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে একটা স্বচ্ছ কিছু সৃষ্টি করা দরকার। ছবিটি বাবা আলোর দিকে তুলে ধ'রলেন। উপস্থিত কেউ মন্তব্য করলেন যে, ছবিটির পশ্চাদ্‌পট আর একটু পরিষ্কার হ'লে ভাল হতো, কেউ বললে, চুলগুলি একটু এলোমেলো হয়েছে, কেউ বললে, ভালভাবে দাড়ি কামানো নেই! সব মন্তব্য থামিয়ে বাবা বললেন, "শোন। তোমরা কি দেখতে পারছো না যে, আমি এখন যে অবস্থায় আছি ঠিক সেই অবস্থার ছবি এটা? এই পোষাক, এই পশ্চাদ্‌পট, এই আধখোলা জানলা, এই দরজা, দরজার এই পর্দা, এই সুইচ, সবই এতে আছে।" ভক্তরা ছবিটি যত দেখতে লাগলো ততই তাদের বিস্ময় বাড়তে লাগলো! যেন, কেউ ক্যামেরা এনে ফোকাস করে রঙিন ছবি তুলে ডেভলপ করেছে, ধুয়েছে, শুকিয়েছে—তারপর বাবার হাতে দিয়েছে এবং এত কাণ্ড ঘটতে লেগেছে এক পলকেরও কম সময়!

প্রশান্তি-নিলয়মে, একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা আলেচনা ক'রছিলেন, মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীব-জন্তুর আত্মীয়তা এবং মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে। বাবা বললেন যে মনুষ্য জীবের সঙ্গে স্থলচর বানর অপেক্ষা বৃক্ষচারী বানরের মিল অনেক বেশী। তিনি সিমিয়ান (Simian) বানরের কথা বললেন—এই বানরের লেজ নেই, লোম নেই এবং এরা গাছে বাস করে। উৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে একজন নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বানরের জাতিটা ঠিক বুঝতে না পারায় বাবা হাত ঘুরিয়ে সিমিয়ান বানরের একটি ছোট্ট মডেল সৃষ্টি ক'রে দেখালেন। বানরের এই ক্ষুদ্র মডেলটি এখনও বাবার কাছে আছে। এটি বিজ্ঞান এবং শিল্পের দিক দিয়ে একেবারে নিখুঁত।

ব্যাঙ্গালোরের কাছে থিপ্পাগোণ্ডানাহাল্লী লেকের ধারে কয়েকজন ভক্ত একদিন সকালের নির্জনতায় বাবার দিব্য সঙ্গের আনন্দলাভ করছেন। পুনর্জন্ম এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পর, বাবা প্যাঁচ লাগানো ঢাকনা সমেত একটি অমৃতপূর্ণ ছোট রৌপ্যপাত্র সৃষ্টি ক'রে উপস্থিত প্রত্যেককে সেই অমৃত বিতরণ করলেন। তারপর বিলাতযাত্রী এক দম্পতিকে সেই পাত্র দান

করলেন। তিনি লক্ষ্য ক'রলেন যে শূন্য পাত্র পাওয়ায় ওদের মন খুব খারাপ হয়েছে। বাবা ওদের কাছ থেকে পাত্রটি নিয়ে তক্ষুনি আবার ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু পাত্রটি এবারে শূন্য নয়, অমৃতে পূর্ণ!

তারপর সকলে ব্যাঙ্গালোর শহরের জল সরবরাহ কেন্দ্র দেখতে গেলেন। একজন ইঞ্জিনীয়ার ঐ জলসরবরাহ কেন্দ্রের ইতিহাস বর্ণনা ক'রছিলেন। দুটি নদী যেখানে মিলেছে সেই স্থানটি তিনি দেখালেন এবং বাঁধ তৈরী করার পর লেকের জলে যে মন্দির ডুবে রয়েছে তার চূড়ার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। বাবা এতক্ষণ জলের ধারে দাঁড়িয়ে এই বৃত্তান্ত শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে একটু জল তুললেন। সবাই বিস্ময়ে দেখলো যে বাবার হাতে একটি শিবলিঙ্গ রোদে ঝলমল ক'রছে। শিবলিঙ্গের গায়ে চন্দন মাখানো, মাথায় বেলপাতা যেন এইমাত্র কোন মন্দির থেকে পূজার ঠিক পরেই বাবা তুলে নিয়ে এসেছেন। দলের মধ্যে একজনের দিকে ফিরে বাবা বললেন, "শিবলিঙ্গটি নিয়ে যাও এবং রোজ এর পূজো করো। তুমি তো শিবপূজা করো, তাই না?" বাস্তবিকই, যে বিশেষ শিবলিঙ্গটি ঐ জলে ডোবা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে ভক্তটি শিবের ঐ রূপেরই উপাসক ছিলেন।

প্রশান্তি-নিলয়মে, বাবা যখন তাঁর ভক্তদের ছেলমেয়েদের তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে, বিবাহ অনুষ্ঠানে সম্মতি দেন এবং আশীর্বাদ করেন, তখন সাধারণত তিনি একটি সোনার লকেট সৃষ্টি ক'রে বরকে দান করেন, ভাগ্যবতী নববধূর গলায় এই মঙ্গলসূত্রটি পরিয়ে দেবার জন্যে বাবা একটিবারমাত্র শূন্যে হাত ঘোরান এবং নিমেষের মধ্যে তাঁর হাতে সৃষ্টি হয় সোনার লকেটসমেত এই মঙ্গলসূত্র। কান বেঁধানো অনুষ্ঠানে বাবা সোনার মাকরিও সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে শিশুর কান বেঁধানো হয় এবং পরে সে পরতে পারে। বাবার হস্তসঞ্চালন যে কি সৃষ্টি ক'রতে সক্ষম তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সাধ্যের অতীত!

রোগনিরাময় বা অঙ্গবৈকল্য দূর করবার জন্য বাবা যদি স্বয়ং অস্ত্রোপচারের সংকল্প নেন তবে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হস্তসঞ্চালনমাত্র তাঁর হাতে এসে উপস্থিত হয়।

বাবার হস্তসঞ্চালন দ্বারা অপরের হাতেও কিভাবে অলৌকিক দিব্যশক্তি সঞ্চারিত হয়, নিম্নে বর্ণিত ঘটনায় তা জানা যাবে। এই ঘটনা ঘটেছিল অনেক

বছর আগে। বাবা তখন কিশোর বালক। চিত্রাবতীর ওপারে সাহেব ট্যাংকের কাছে এক বাগানে, তিনি ভক্তের এক বিরাট দল নিয়ে গিয়েছেন। সেখানেই রান্না ক'রে খাওয়া-দাওয়া হ'য়েছে। অন্ধকার হ'য়ে আসায় সকলে তাড়াতাড়ি গ্রামের দিকে ফিরে আসছে। বাবা আগে আগে হাঁটছিলেন। একটা ঝোপের কাছে আসতেই, হঠাৎ একটা সাপ বালির ওপর দিয়ে ছুটে এসে বাবার ডান পা জড়িয়ে ধরলো। সকলে চীৎকার ক'রে উঠলো—"সাপ, সাপ।" একটি গোখুর সাপ বাবার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দংশন ক'রে নিমেষের মধ্যে পাক খুলে বালির ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে পালিয়ে গেল। বাবা ব'ললেন, "ওকে যেতে দাও।" কিন্তু সঙ্গীরা সাপটির উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে সাপটিকে মারার জন্যে পেছনে ধাওয়া ক'রলো। বাবা আদেশের সুরে সাপটিকে জোরে বলে উঠলেন "যাও"। সাপটিও তীব্র গতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ইতিমধ্যে বিষের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল। বাবা অচৈতন্য হ'য়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কয়েকজন তাঁর পিতা পেড্ডা ভেঙ্কাপ্পা রাজুকে সংবাদ দিতে ছুটলো। আর এক ব্যক্তি ওঝাকে ডাকতে দৌড়লো। এই ওঝা এক মাইল দূরে বাস ক'রতো। দু'জন ভক্ত প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্যোগ ক'রলে, বাবা এদের একজনকে ইসারা করলেন হাত সঞ্চালন করতে। ভক্তটি বাবার নির্দেশমত হাত সঞ্চালন করার সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব ক'রলো তার করতলে যেন শক্তমতন কিছু একটা ঠেকছে। দেখা গেল তার হাতে একটা মাদুলী সৃষ্টি হ'য়েছে। বাবা মাদুলীটিকে তাঁর মুখের ফেনার সাথে সাপে-কাটা জায়গায় লাগাতে ইঙ্গিত করলেন। ভক্তটি আদেশ পালন করার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাবা সুস্থ হ'য়ে উঠে বসলেন এবং সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বাবা কথাবার্তা বলা শুরু ক'রলেন এবং এমন ভাব দেখালেন যেন সেদিনের আনন্দ বিঘ্নিত হবার মত কিছুই হয়নি।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাবার পিতা-মাতা এবং আরো অনেক উদ্বিগ্ন ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসার বিরাট আয়োজন —টোটকা, শেকড়, গ্রামোফোনের ভাঙ্গা রেকর্ড, মেলায় কেনা বোতলভরা ওষুধ এবং সেই সঙ্গে সেই নামকরা ওঝা। বাবা মজা ক'রে তাদের অভ্যর্থনা ক'রলেন।

বাবা পরে বলেছিলেন যে তিনি নিজেই ঐ মাদুলী আনাতে পারতেন, কিন্তু তাঁর হাতে সৃষ্টি করা কোন জিনিষ তিনি নিজের প্রয়োজনে কখনও ব্যবহার করেন না বলে. এই শক্তি অন্য একজনের হাতে সঞ্চার ক'রতে হ'য়েছিল।

শিরডির সাইবাবা সম্পর্কে বলা হয়—"ভক্তদের বিদায় গ্রহণকালে বাবা ভস্মের প্রসাদ দিতেন, ভক্তদের কপালে ভস্ম লেপন ক'রতেন এবং তাদের মাথায় হাত রেখে বরাভয় দিতেন।" শ্রীসত্য সাইবাবাও তাই করেন। তাঁর যত ভক্তকে বরাভয় দান করে, এবং এই হাতের স্পর্শে রোগ নিরাময় হয়, অকল্যাণ দূরে যায়, আর ভাগ্যলিপি নতুন ক'রে লেখা হয়।

সেই একই বাবা

এই ব্যাপার খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে সত্য সাইবাবা শিশুকাল থেকেই তাঁর সঙ্গে শিরডি সাইবাবার আত্মিক বন্ধন বা অভিন্নতার ইঙ্গিত দিয়ে আসছিলেন। তিনি সঙ্গীদের এমন "এক বাবার"—এমন এক সাধুর নাম নিয়ে ভজন শেখাতেন, যে সাধুর কথা কেউ কখনো শোনেনি। তিনি এমন এক তীর্থের নাম ক'রতেন যে তীর্থে কেউ কোনদিন যায়নি। লোকে অবাক হ'তো এসব কথা শুনে। তারা বলতো—"কোথায় এই শিরডি?" "কি পরিচয় এই মুসলমান সাধকের?" তাদের ধারণাই ছিল না যে তাদেরই মাঝে যে কিশোর এত সুন্দর নাচে, এত সুন্দর গান গায়, কয়েক বছরের মধ্যে সেই কিশোর বালকই তাদের ছোট্ট গ্রামটিকে আর একটি শিরডিতে পরিণত ক'রবে যেখানে হাজার হাজার জনতা স্রোতের মত অবিরাম গতিতে আসতে থাকবে সেই একই বাবার খোঁজে!

আগেই বলা হ'য়েছে, সত্য সাইবাবা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা ক'রলেন যে তিনিই শিরডির সেই বিখ্যাত সাধুবাবা স্বয়ং তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হ'য়েছিল 'যদি তাই হয় তবে এক্ষুণি কিছু অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করো।'

তিনি বললেন, 'কিছু যুঁই ফুল নিয়ে এসো।' ফুলগুলি এনে তাঁর হাতে দেওয়া হ'লে তিনি সেগুলি মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিলেন। ফুলগুলি মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেলুগু অক্ষরে 'সাইবাবা' নামটি লেখা হয়ে গেল। একটির পর একটি ফুল দিয়ে নিখুঁতভাবে তেলুগু অক্ষরগুলি সাজানো হ'য়েছে। এমনকি শেষাম্মা রাজুর মত ব্যক্তি যিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ভাই-এর বহু অলৌকিক ঘটনা দেখতে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন—তিনিও আত্মপ্রকাশের এইরকম বলিষ্ঠ ভঙ্গী দেখে বিস্মিত হ'য়েছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে বাবা ব'লেছিলেন, "হ্যাঁ, আমার ঠিক আগেকার অবতারের নাম আমি ওদের কাছে প্রকাশ ক'রেছিলাম। এর একমাত্র অর্থ হ'লো যিনি শিরডি সাইবাবা রূপে পূর্বে এসেছিলেন তিনিই সত্য সাইবাবা রূপে আবার অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তাছাড়া, সাই-অবতারেরা আসেন একটি ধারাবাহিকতা অনুসরণ ক'রে। বর্তমান অবতারের পর আসবেন প্রেমসাই যিনি মহীশূর এলাকায় জন্মগ্রহণ ক'রবেন।"

এই সময় দুজন শিক্ষক পুট্টাপর্তী আসেন। বুক্কাপটনমে সত্য এঁদের ছাত্র ছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে এঁরা সেই সময়কার ঘটনাবলী লিখে রেখেছিলেন। এঁদের একজন, শ্রী বি. সুব্বান্নাচার বলেন, "তাঁর সম্বন্ধে আমার সর্বপ্রথম ধারণা হ'লো পুরাণের প্রহ্লাদের মত তিনি একজন মস্তবড় ভক্ত। আমি তাঁকে অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করতে দেখেছি। আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে তিনি সাধারণ কোন মানুষ নন—অলৌকিক শক্তির অধিকারী এক বালক। আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম যেদিন পুট্টাপর্তীর এই 'পাগল' বালক আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন যে তিনি শিরডির সাইবাবা ছাড়া অপর কেউ নন। একবার তিনি তাঁর পূর্বদেহের বৃত্তান্ত শোনাবেন বলে আমাদের রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ জানালেন। আমরাও শিরডির সাইবাবার জীবনী জানবার জন্য উৎসুক ছিলাম, কারণ তাঁর যে সব জীবনী লেখা হয়েছে তাতে তাঁর শৈশবের এবং ১৬ বছর পর্যন্ত জীবনের কোন উল্লেখ নেই। আমরা প্রার্থনা জানাবার পূর্বেই তিনি আমাদের অনুগ্রহ করলেন! আমাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। রাত্রি হলো। আমরা জীবন বৃত্তান্ত শুনলাম। আমরা স্বয়ং সাইকে নরদেহে দর্শন করলাম।"

শিরডির সাইবাবার কথা বলবার সময় সত্য সাইবাবা সর্বদা 'আমার পূর্বদেহ' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, তাঁর 'পূর্বদেহে' অবস্থানকালে তিনি ভক্তদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন এবং কি ভাবে নানা পরিস্থিতি সামলাতেন, কোন বিষয় বোঝাতে গেলে তিনি কি রকম উদাহরণ দিতেন, এবং কি ধরণের প্রশ্ন তাকে করা হতো ইত্যাদি। তিনি হয়তো কখনো এরকম মন্তব্য করবেন, 'এক ব্যক্তি ঠিক এইরকম সন্দেহ প্রকাশ করেছিল শিরডিতে এসে'—এবং সুদূর অতীতে শিরডিতে বসে সেই ব্যক্তিকে তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন তাও বলে দেবেন! শিরডি সাইবাবার সব ভক্তকে তিনি নিজের ভক্ত বলে চিনতে পারেন। তিনি তাদের বলেন, "আমি তোমাকে গত দশ বছর ধরে চিনি।" অথবা, "যদিও তুমি এই দেহ প্রথম দর্শন করছো, কিন্তু আমি তোমাকে ২০ বছর পূর্বে দেখেছি যখন প্রথম শিরডি এসেছিলে।" লোকটির তখন খেয়াল হয়, গত দশবছর ধরে সে সাইবাবার পূজো ক'রে আসছে অথবা, ২০ বছর পূর্বে সে বাস্তবিকই শিরডিতে গিয়েছিল! বাবা অনেককে শিরডি যাবার জন্য উৎসাহিত করেছেন; পথের নির্দেশ নিখুঁতভাবে দিয়েছেন এবং শিরডির মন্দিরে কি কি ছবি আছে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রোতার মনে হবে বাবা যেন দীর্ঘকাল শিরডির অধিবাসী ছিলেন।

একবার কয়েকজন ভক্ত শিরডিতে গেলে সত্য সাইবাবা তাদের বলেছিলেন, "তোমরা দ্বারকামায়ী মন্দিরে রাতে শোবে এবং সেখানে আমি তোমাদের স্বপ্নে দর্শন দেবো।"

বাবা এই কথা রেখেছিলেন। অনেক ভক্ত শিরডি এসে, পুট্টাপর্তীতে শিরডি সাইবাবার দেহধারণের কথা যখন শোনে, তখন তারা কালবিলম্ব না ক'রে পুট্টাপর্তীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পুট্টাপর্তীতে এসে পৌছলে বাবা তাদের শিরডি তীর্থযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অতীতে, শিরডিতে যে সব প্রশ্নের উত্তর অনেক ভক্তকে দেওয়া হয়ে ওঠেনি, পুট্টাপর্তীতে ইণ্টারভিউএর সময় বাবা, প্রশ্ন করবার পূর্বেই, তাদের সেইসব উত্তর দিয়েছেন! এই অভিজ্ঞতা বহুলোকের জীবনে হয়েছে।

চিন্‌চোলির রাজা শিরডির সাইবাবার পরম ভক্ত ছিলেন। এই রাজা প্রতিবছর কয়েকমাস শিরডি, আকালকোট এবং অন্যান্য তীর্থস্থানে, সাধুসন্ন্যাসী-

দের সঙ্গে বাস করতেন। রাজার মৃত্যুর পর রাণী যখন শুনলেন যে তাঁদের প্রভু শ্রীসত্য সাইবাবা রূপে পুট্টাপর্তীতে অবতীর্ণ হয়েছেন তখন তিনি বিস্ময়ে পুলকিত হ'লেন এবং পুট্টাপর্তী এলেন কৌতূহল মেটাতে। বাবার বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর। রাণী বাবাকে রাজী করালেন তাঁর সঙ্গে চিন্‌চোলি যেতে। রাণীর বিস্ময় সহজেই অনুমান করা যায় যখন বাবা একটি নিমগাছের খোঁজ করলেন যে গাছটি অনেক আগেই কেটে ফেলা হয়েছিল, একটি কূপের কথা জিজ্ঞেস করলেন যে কূপ বহুপূর্বে বুজিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং এক সারি নব-নির্মিত দোকানের কথাও জিজ্ঞেস করলেন যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। বাবা রাণীকে বললেন, তাঁর 'পূর্বদেহে' তিনি এসব স্থান পূর্বে দর্শন করেছেন। শিরডির সাইবাবা রাজাকে পাথরের ছোট এক দেবমূর্তি দিয়েছিলেন। বাবা রাণীকে এই মূর্তির কথা জিজ্ঞেস করলেন। রাণী বললেন তাঁর জানা নেই কোথায় আছে। বাবা মূর্তিটি আবিষ্কার ক'রে রাণীকে দিলেন। শিরডি সাইবাবার একটি ছবিও রাজাকে দেওয়া হয়েছিল। বাবা বললেন খুঁজলে সেই ছবিও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এবং পরে খোঁজ ক'রে সত্যিই তা পাওয়া গিয়েছিল।

কয়েক বছর পর একদিন রাণী রাজবাড়ীর তোশাখানার জিনিষপত্র গোছগাছ করছিলেন। পুরোনো তামা, পেতল বা ব্রোঞ্জের কিছু দ্রব্য বিক্রী করলে ঘরে বাড়তি জায়গা পাওয়া যাবে এই উদ্দেশ্যে। ঘাঁটাঘাঁটি করতে, বহু পুরোনো পেতলের এক কমণ্ডলু পাওয়া গেল। সাধারণত সাধুসন্ন্যাসীরা জলপান করার জন্যে এ নিয়ে ভ্রমণ করেন। এর আকৃতি খুবই রুচিসম্মত এবং অপূর্ব ছিল। হাতলের গায়ে একটি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে জল ভরার ব্যবস্থা এবং নলটা শেষ হয়েছে গোমুখের আকৃতি নিয়ে। অনেকে বললো যে কমণ্ডলুটা পালিস ক'রে রাজবাড়ীর বৈঠকখানায় সাজিয়ে রাখতে। পরদিন কমণ্ডলুর গায়ে একটি গোখুর সাপ জড়ানো দেখে রহস্য আরো বেড়ে গেল। রাণী ধর্মীয় প্রথা অনুসারে সাপটির পূজো করলেন এবং মনে মনে ভাবলেন 'একমাত্র বাবাই এই রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন।'

দশেরা উৎসবের প্রথম দিনেই রাণী পুট্টাপর্তী এলেন। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা খবর পাঠালেন রাণী যেন অবিলম্বে 'আমার কমণ্ডলু' নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বাবার হাতে কমণ্ডলু দেওয়ামাত্র তিনি সবাইকে দেখালেন, সেটির

গায়ে সংস্কৃত ভাষায় খোদাই করা রয়েছে 'সা' এরপর দুটি ছোট দাঁড়ি, তারপর 'বা' এবং এর পরও দুটি ছোট দাঁড়ি। 'সা' মানে সায়ী এবং 'বা' মানে বাবা। বাবা বলেছিলেন যে শিরডিবাবা যে ঝুলি নিয়ে দৈনিক মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করতে বেরোতেন, তাঁর সেই ভিক্ষার ঝুলিও তিনি উদ্ধার করবেন—যেখানেই তা থাকুক না কেন।

অনেক আশ্চর্য হয়ে এই কথা ভেবেছে যে যতদূর জানা যায় শিরডি সাইবাবা শিরডি ছেড়ে বহুবছর কোথাও যাননি। তবে তিনি কি ক'রে চিন্-চোলি এবং সেখান থেকে পরে হায়দ্রাবাদ গেলেন আর রাজাকে কমণ্ডলু উপহার দিলেন। অথচ রাণী এবং কয়েকজন পুরোনো রাজকর্মচারীর দৃঢ় বিশ্বাস যে শিরডির সাইবাবা চিনচোলি আসতেন, প্রতিবার কয়েকদিন ধরে থাকতেন এবং একটি বলদটানা টাঙ্গায় চড়ে শহর ছেড়ে বহুদূর রাজার সঙ্গে চলে যেতেন ধর্মালোচনা করবার জন্য। এই টাঙ্গাটি বর্তমানে পুট্টাপর্তীতে রাখা আছে।

যে সব ভক্তরা শ্রীসত্য সাইবাবার লীলা দর্শন করেছেন তাদের কাছে এই বিস্ময়কর ঘটনা উপলব্ধি করা কিছু কঠিন না। কারণ তারা জানে যে বাবা মাদ্রাজে অবস্থান করলেও বাঙ্গালোরে একটি পরিবারের সাথে বসে চা পান করতে পারেন—ঠিক যা ঘটেছিল সিভিল স্টেশনের এক বাংলোয়! অন্যত্র অবস্থান করেও, তিনি ভূপালে একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, বা দিল্লীর কোন একজিবিশনের (মেলার) স্টলেও তাঁকে দেখা যেতে পারে অথবা মাদ্রাজে বসে মেননের সাথে ফোনে কথা বলতেও পারেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪০ সালে, হোসপেট শহরে এক পরিবার বাস করতো। এদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই বাবার পরিচয় ছিল। তিনি ভাইবোনের মধ্যে বড়বোন স্কুলে পড়াতেন এবং ছোট দুভাই, বুক্কাপটনমে বাবার সহপাঠী ও খেলার সাথী ছিলেন। এরা সবাই বাবার অবতারত্বের ঘটনা শুনেছিলেন এবং পুট্টাপর্তী গিয়ে বাবাকে দর্শনও ক'রে এসেছিলেন। একবছর পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা, সত্য সাইবাবা টাঙ্গায় চড়ে এদের বাড়ী এলেন। ছোটবেলার সাথীকে দেখে এদের আনন্দ আর ধরে না। বাবাকে মাঝখানে রেখে, সারারাত দুভাই বিছানায় শুয়ে গল্প ক'রে কাটালো। হাসিঠাট্টা আর আনন্দকৌতুকে সময় কেটে গেল। পরদিন, এদের মা, বাবার স্নানাহারের

আয়োজন ক'রলেন। কিন্তু, সকালবেলা, দেখা গেল বিছানা খালি—বাবা নেই। ভদ্রমহিলার মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল, বাবা পুট্টাপর্ত্তী ছেড়ে নাকি কোথাও যাননি! পুট্টাপর্ত্তী আর হোসপেটের দূরত্ব ১০০ মাইল! অবতার পুরুষরা সাধারণ মানুষের মত স্থান কালের সীমায় আবদ্ধ নন। তাঁরা নিজেরাই নিয়মের স্রষ্টা।

মাদ্রাজের মাইলাপুরে এক মন্দিরে, সারাভারত সাইসমাজের অধিবেশনে ভাষণ দেবার সময় বাবা এই বলে তাঁর ভাষণ শুরু করেন, "আমি এই মন্দিরে চিরকাল বাস ক'রছি, যদিও বর্তমান দেহের প্রথম আগমন এটা।"

নানাভাবে, নানা উপলক্ষে, বাবা, তাঁর সাথে শিরডিবাবার এই অভিন্নতা এবং ধারাবাহিকতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

একবার কুর্গে, শিরডি সাইবাবার এক পরম ভক্তকে দেখামাত্রই বাবা চিনতে পারেন এবং এই বলে আনন্দ প্রকাশ করেন যে ভক্তটি শিরডি সাইবাবা ট্রাস্টের আজীবন সভ্য ছিলেন।

বাবা তাঁর ভক্তদের যে সব লকেট বা ছবি সৃষ্টি ক'রে উপহার দেন, তার ভেতরে, হয় শুধু শিরডি সাইবাবার ছবি থাকে, অথবা শিরডি সাইবাবার ছবির সঙ্গে তাঁর নিজের ছবি থাকে, অথবা তাঁর নিজের ছবির বুকের মধ্যে শিরডি সাইবাবার ছবি থাকে। প্রশান্তি-নিলয়মে, তাঁর বর্তমান রূপ এবং পূর্বরূপের পূজার্চনার মধ্যে কোনরকম পার্থক্য করা হয় না। সেখানকার ভজন হলে রাখা দুটি প্রতিকৃতি এই ধারাবাহিকতার সাক্ষ্য দেয়। শিরডি সাইবাবা যে মহালগ্নে সত্য সাইবাবারূপে পুনর্বার তাঁর কর্ম আরম্ভ করেন, সেই শুভমুহূর্তকে শিল্পী অতি নিপুণভাবে এই প্রতিকৃতির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই পবিত্রলগ্নের অন্তর্নিহিত মহিমা ছবিদুটির মধ্যে যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে।

শিরডি সাইবাবার রৌপ্যমূর্তিটি প্রশান্তি-নিলয়মের ভজন হলে উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু। বাবা তাঁর অভিন্নতা এবং ধারাবাহিকতা, একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ কার্যের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ ক'রেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাবাকে নিবেদন করা ফুলের মালা দিয়ে শিরডি সাইবাবার মূর্তি সাজানো হয় এবং নিবেদিত মালা আর নতুন মালার মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না। দুই প্রকারের মালাই মূর্তি সাজানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়। নবরাত্রি উৎসবে, নয় দিন ধরে মহিলা

ভক্তেরা নিলয়মে যে রকম অর্ঘ্য দেন, তা সঞ্চয় ক'রে দশমীর দিন শিরডি সাইবাবার মূর্তির ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে ঢেলে দেওয়া হয়।

নানা সমস্যা নিয়ে অনেকে বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসে বসে থাকেন। এইরকম অপেক্ষমান বহু দর্শনার্থীকে বাবা ব'লেছেন, "আমার সঙ্গে দেখা ক'রে প্রশ্ন করবার জন্যে তোমাদের অতক্ষণ অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। নীচে বুড়ো বাবা বসে আছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো।" অর্থাৎ শিরডি সাইবাবার কাছে। ভজন হলের উঁচু বেদীর ওপর ভক্তদের দিকে মুখ ক'রে দুটি পূর্ণ আকৃতির তৈলচিত্র আছে—একটি শিরডি সাইবাবার এবং অন্যটি সত্য সাইবাবার। ছবিতে দুজনেই হাতের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। শিরডি সাইবাবা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত ধরে আছেন এবং সত্য সাইবাবা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরে আছেন। শিরডি সাই বাবার মাথার উপরকার কাপড়ের গিট সাধারণত মাথার বাঁ দিকে থাকে, কিন্তু এই ছবিতে সেটা ডান দিকে আছে। এতে কোন কোন ভক্ত অস্বস্তিবোধ করেন, কিন্তু তাদের জানা নেই যে, যখন চিত্রশিল্পী তৈলচিত্র আঁকার জন্যে বাবার কাছে দুখানি ছবি চেয়েছিল তখন বাবা শূন্যে হাত ঘুরিয়ে দুটি ছোট আকারের ছবি সৃষ্টি করেছিলেন। শিরডি সাইবাবার ছবিতে দেখা গেল তাঁর হাত দুটি নূতন ভঙ্গীতে রাখা এবং মাথার কাপড়ের গিঁট ডানদিকে। অতএব, শিল্পী সেই ছবি দেখে তৈলচিত্র আঁকায় গিঁটটা ডানদিকে হয়েছে।

একই ভজন এবং একই স্তোত্র পাঠ দ্বারা প্রতিদিন উভয় অবতারকে পূজো করা হয়—এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁদের অভিন্নতা এবং ধারাবাহিকতার কথা এইসব ভজন এবং স্তোত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্য সাইবাবার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতি পূজা বা তাঁর পট পূজা করার সময় যে অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটিতে শিরডি সাইবাবার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। সত্য সাইবাবার স্তুতি এইভাবে করা হয় "ওম্ শ্রী সাই পর্তিগ্রামোদ্ভবায় নমঃ," "ওম্ শ্রী সাই যশঃকায় শিরডিবাসিনে নমঃ," "ওম্ শ্রী সাই শিরডিসাই অভেদশক্ত্যাবতারায় নমঃ," "ওম্ শ্রী সাই শিরডি সাই মূর্তয়ে নমঃ ইত্যাদি।" সত্য সাইবাবার প্রতিনিধিত্বের দাবী নিয়েই শিরডি সাইবাবার রৌপ্যমূর্তি মঞ্চে অধিষ্ঠিত। সত্য সাইবাবা মঞ্চে

আরোহণ ক'রলে, জায়গা ক'রে দেবার জন্যে রৌপ্যমূর্তিটি হয় বাবার ডান দিকে, না হয় বাঁদিকে সরানো হয়। নইলে মেঝেতে নামিয়ে রাখা হয়, অথবা হলের বাইরে রেখে আসা হয়। একবার বাবা পুট্টাপর্তীতে একটি শোভাযাত্রার প্রয়োজন বোধ ক'রলে তিনি বলেছিলেন, "আজ বুড়োবাবা শোভাযাত্রায় বের হবেন" এবং একটি সুসজ্জিত শিবিকায় মূর্তিটি বসিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়।

অবতারত্ব ঘোষণার ঠিক পরের কথা। বাবা তখন কিশোর বালক। অনেক সন্দেহগ্রস্ত লোক এই প্রশ্ন তুলেছিল, "আমাদের কি ক'রে বিশ্বাস হবে যে তুমিই শিরডির সাইবাবা?" এই রকম এক সংশয়ীকে ১৯৪৩ সালে কিশোর সাইবাবা এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখান। যে অকাট্য প্রমাণ এই ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিটির সামনে রাখা হ'য়েছিল, এতে সে সম্পূর্ণ হতভম্ব হ'য়ে যায়। এই লোকটির চোখের সামনে বাবা তাঁর দুই করতল প্রসারিত ক'রে ধরতেই বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ দিয়ে লোকটি দেখলো. বাবার এক করতলে শিরডি সাইবাবার ছবি এবং অপর করতলে সত্য সাইবাবার ছবি জ্বলজ্বল ক'রছে।

অনুরূপ অলৌকিক ঘটনার অপর এক সাক্ষী হ'লেন দিল্লীর চিদাম্বর আয়ার নামে এক ভক্ত। শিরডি সাইবাবারূপে যিনি এসেছিলেন, তিনিই সত্য সাইবাবারূপে অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা—সংশয়ীদের মনের এই সন্দেহ দূর করতে বাবা যে একই অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন, এই ঘটনায় তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

দিল্লীর এই ভক্ত লিখেছেন—"একদিন সন্ধ্যাবেলা পুরোনো দিল্লী ও নতুন দিল্লীর মাঝখানে এক নির্জন রাস্তা দিয়ে সাইকেল চড়ে যাচ্ছিলাম আর আমার শোচনীয় আর্থিক সংকটের কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ হলো পুট্টাপর্তী থেকে ফিরেছি। যদিও বাবাকে আমার খুবই ভাল লেগেছে, তবুও আমি মনকে একথা ঠিক বোঝাতে পারছিলাম না, তিনি কি সত্যিই শিরডির সাইবাবা—তিনি কি সত্যই ঈশ্বরের অবতার? বেশ কয়েক বছর আগে আমাকে একজন বলেছিল শিরডি সাইবাবার পূজো করতে—এরমধ্যে আবার হঠাৎ পুট্টাপর্তীর এই নতুন বাবার দেখা পেয়ে গেলাম। এইসব নানান চিন্তা মাথায় ঘুরছে আর আমি সাইকেল চালাচ্ছি। হঠাৎ খুব কাছ থেকে

একজনের কণ্ঠস্বর শুনলাম. 'কি, দিনের কাজকর্ম সব সারা বুঝি?' চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম বলিষ্ঠ আকৃতির এক বৃদ্ধ ব্যক্তি খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে আমার খুব কাছাকাছি এসে গেছেন এবং একমুখ হাসি নিয়ে স্নেহ-মমতা মাখানো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

"দিল্লীতে আমি ছোটদের গান-বাজনা শেখাই আর মাঝে মাঝে জলসায় বেহালা বাজাই। এই করে আমার পেট চলে। তাই আমি ভাবলাম লোকটি এইরকম কোন জলসায় বা কোন ছাত্রের বাড়ীতে হয়তো আমাকে দেখে থাকবে আর আমি যে দিল্লীর রাস্তায় সাইকেল চেপে ঘুরি তাও তার নজরে পড়েছে। আমি আমার মাতৃভাষা তামিলে তাঁকে বললাম—'হ্যাঁ, বাড়ী ফিরছি এখন।' ভদ্রলোকটি এই তামিল ভাষাতেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি এতে একটু আশ্চর্যও হয়েছিলাম। বৃদ্ধটি অনুনয় করে বললেন 'ভালই হলো। তুমি কি আমার সঙ্গে ঐ পুরানো কবরখানার কাছে একটু আসতে পারবে? ভয় নেই, আমি তোমাকে বেশীক্ষণ আটকাবো না।'"

"আমরা পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে এক ফার্লং দূরের কবরখানায় পৌঁছে, দেয়ালে সাইকেল কাত ক'রে রেখে পূর্বদিকের এক জায়গায় ছায়া আছে দেখে বসলাম। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসতে বললেন এবং সুকৌশলে প্রশ্ন করে আমার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা এক এক করে জেনে নিলেন। তিনি বললেন যে খুব সৌভাগ্যের ফলে যে গুরু আমি পেয়েছি তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন. 'তবু তোমার সন্দেহ যাচ্ছে না কেন? বিশ্বাস করো তিনিই শিরডির সাইবাবা। দেখবে?' এই বলে তিনি দুই হাত আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন আর আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাঁর এক করতলে শিরডি সাইবাবার ছবি, অন্যহাতে পুট্টাপর্তীর বাবার ছবি। ছবি দুটি এমনই জীবন্ত যে মনে হচ্ছিল তা যেন কোন এক নিপুণ শিল্পীর উজ্জ্বল রং দিয়ে আঁকা অমর কীর্তি। সেই ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তির দুই করতল আলো করা জ্যোতিষ্মান মুখ দুটির কথা জীবনেও ভুলতে পারবো না। আমার সন্দেহ নিবারণ করবার জন্যই যেন এই নাটকীয় ঘটনার উদয় হয়েছিল। দুস্তর পারাবারে ভেসে যাওয়া জীবনে যেন এই রকম নোঙরেরই প্রয়োজন ছিল। এই ঘটনা আমাকে জীবনের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিলো। আজও, যখনই

আমি ধ্যানে বসি সেই জ্যোতির্ময় রূপদুটি আমার মানসচক্ষে ভেসে ওঠে এবং এক অনির্বচনীয় আনন্দধারা আমার দেহমন প্লাবিত করে দেয়। আমরা একসঙ্গে সাইকেল চালিয়ে আবার বড় রাস্তায় ফিরে এলাম এবং তিনি, যেদিক থেকে আমরা প্রথম এসেছিলাম, সেইদিকে সাইকেলের মুখ ঘোরালেন। এটাও আমার কাছে খুবই আশ্চর্য ঠেকলো কারণ আমার মন বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে শুধুমাত্র ঐ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়ে আমাকে কৃপা করার জন্যে তিনি এতটা পথ ছুটে এসেছেন! তিনি আবার আমাকে সতর্ক করে বললেন, আমার বিশ্বাস যেন শিথিল না হয় এবং বিনা পরিশ্রমে যে অমূল্য সম্পদ লাভ করেছি তা যেন নিজের ভুলে না হারাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম তিনি দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছেন, এবং এই বৃদ্ধ বয়সে চমৎকারভাবে সাইকেল চালনার জন্য মনে মনে তাঁর তারিফ করলাম। পরমুহূর্তেই তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন—বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে আমি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।"

দিল্লীর এই ভক্তকে এইভাবে বাবা দুই সাইবাবার অভিন্নতা প্রমাণ করে দেখালেন।

বালক অবস্থাতে বাবা যে কথা বলে লোকের মনে সাহস সঞ্চার করতেন, সান্ত্বনা দিতেন এবং তাঁর অভয়মুদ্রা দেখাতেন, আজও অনুরূপ পরিস্থিতিতে তিনি সেই একই কথা বলে মানুষকে সান্ত্বনা দেন, সাহস যোগান এবং অভয়মুদ্রা দেখান। সংশয়ী ব্যক্তিদের কাছে আগেও যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যে তিনি অবতার হয়ে এসেছেন মানবসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে, এখনও সেই একই ভাবে প্রত্যক্ষ করান। সংশয়ী তার মনের সন্দেহ নিয়ে বাবার কাছে সশরীরে উপস্থিত থাক বা সুদূর দিল্লীর জনশূন্য রাজপথে সাইকেল চেপে ঘুরে বেড়াক—তিনি একই রকম সন্দেহের জন্যে এইরকম অলৌকিকত্ব প্রত্যক্ষ করান। এইরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি প্রচুর ব্যক্তিকে দেখিয়েছেন, তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। এই সব ব্যক্তি এবং বাবার অগণিত ভক্ত, এই ঘটনা এবং আরো অনেক ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে জেনেছে যে বাবা ও শিরডি সাইবাবা এক ও অভিন্ন।

বাঙ্গালোর সিটি স্টেশনে একবার বাবার এক মহিলা ভক্ত ট্রেনের জন্যে একটা বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করছেন। তিনি মহীশূর যাবেন। সেখানকার

মিশন হাসপাতালে তাঁর অপারেশন হবে। সত্য সাইবাবা এক লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ বৃদ্ধের রূপধারণ করে সেই বেঞ্চিতে এসে বসলেন। বৃদ্ধের পরণে আলখাল্লা, মাথায় কাপড়ের ফেটি বাঁধা, বগলে একটি পুঁটুলি আর হাতে একটা মোটা লাঠি। তিনি তেলুগু ভাষায় মহিলাটির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। বললেন, তিনি কখনো যেন অপারেশন না করান। আজকালকার ডাক্তাররা একটু ছুতো পেলেই অমনি অপারেশন ছাড়া কথা বলে না। আরো বললেন যে তিনি অতি সম্প্রতি শিরডি ঘুরে এসেছেন এবং তাঁর কাছে প্রসাদী খেজুরও আছে। এই প্রসাদ খেলেই অসুখ ভাল হয়ে যাবে। এই বলে মহিলাকে তিনি প্রসাদী খেজুর খেতে দিলেন। তিনি আরো জানালেন যে তাঁর আশ্রম পুট্টাপর্তীর পথে বিতুরাশ্বতমের কাছে। তিনি বললেন যে তিনি ঠিক করেছেন শেষ অবধি আশ্রমের সবাইকে নিয়ে তিনি শিরডি চলে যাবেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই মহিলার রোগ ভাল হয়ে গিয়েছিল ঐ প্রসাদী খেজুর খেয়ে।

এইভাবে দেখা যায়, শিরডির সাইবাবা এবং সেই একই দেবত্বের বর্তমান রূপ সত্য সাইবাবা ভক্তদের অভিজ্ঞতায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন ভক্ত শিরডি সাইবাবার পূজো করলে সত্য সাইবাবা তা জানতে পারেন।

বহু বছর পূর্বে একবার মাদ্রাজে, একটি মহিলা নিরুপায় হয়ে, তাঁর মরণাপন্ন পুত্রকে শিরডি সাইবাবার ছবির সামনে শুইয়ে রেখেছিলেন। অনেক বছর পরে তিনি সত্য সাইবাবার কথা লোকমুখে শুনতে পান। ইতিমধ্যে সেই ছেলেটি ভাল হয়ে গিয়েছে এবং সে এখন সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় এক যুবক। মহিলাটি তাঁর পুত্রকে সাথে নিয়ে পুট্টাপর্তী এলেন। বাবা এদের দেখা মাত্র ছেলেটির মাকে বললেন, "পনেরো বছর আগে তুমি এই ছেলেকে আমার কাছে সমর্পণ করেছিলে, তাই না?"

প্রতিবছর শিরডিতে, শিরডি সাইবাবার নশ্বর দেহের মহাপ্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন করার সময়, বাবা সূক্ষ্মদেহে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং ফিরে এসে বলেন, "আমি শিরডি গিয়েছিলাম।"

কয়েকবছর পূর্বে বাবা মাদ্রাজে থাকার সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যার একটিমাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব এবং তা হলো উভয় বাবার অভিন্নতা। বাবা ভক্তদের কাছে একদিন প্রকাশ করলেন যে শিরডি সাইবাবার এক ঘনিষ্ঠ শিষ্য

কোন এক বিশেষ তারিখের প্রভাতে প্রাণত্যাগ করবেন, নশ্বর দেহত্যাগের অন্তিম মুহূর্তে সেই শিষ্যকে তিনি ঈপ্সিত দর্শন দেবেন। বেশীরভাগ ভক্ত উদ্বিগ্ন মনে সেই দিনটির প্রতীক্ষায় রয়েছেন—সেদিন না জানি কি ঘটে! অনেকের আবার আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে তাঁর পূর্বদেহের একজন শিষ্যকে বাবা আশীর্বাদ করছেন, এই অপূর্ব দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য তাদের হবে। কয়েকদিন ধরে এদের মুখে শুধু এই আলোচনা, ক্যালেণ্ডার আর ঘড়ি ঘন ঘন দেখতে দেখতে তারা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষমান রইল।

অবশেষে সেই দিনটি উপস্থিত হ'লো। বাবা যে নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলেছিলেন সেই সময়ও এগিয়ে এলো। ভক্তরা সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বাবাকে একলা থাকতে দিচ্ছে না। এদিকে অনেকক্ষণ হ'লো বাবা বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও বাবা যখন বেরোলেন না তখন ভক্তরা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখতে পেলে বাবার দেহে সাড়া নেই, তিনি স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গেছেন। তারা দরজা ভেঙে ফেললো এবং বাবার দেহের পরিচর্যা শুরু করলো। তাঁর দেহে কখন স্পন্দন ফিরে আসে উদ্বেগাকুল ভক্তরা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলো। তারা বাবার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিভূতি নির্গত হতে দেখলো এবং শুনতে পেল মারাঠী ভাষায় শ্লোক আবৃত্তি করছেন। দেহে ফিরে এসে বাবা ভক্তদের প্রকাশ করলেন যে তাঁর "পূর্বদেহের" সেই শিষ্য প্রাণত্যাগ করেছেন এবং বাবা তাকে শিরডি সাইবাবা রূপে দর্শন দিয়েছেন ও 'উধি' দান করেছেন—যে 'উধি' তার গুরু তাকে সব সময় দিতেন।

চার বছর পূর্বে, বাবা যখন হায়দ্রাবাদে ছিলেন, তাঁকে সাকোরিতে গোদাবরী-মাতার আশ্রমে যাবার আমন্ত্রণ করা হয়। গোদাবরীমাতা ছিলেন উপাসিনী বাবা এবং শিরডি সাইবাবার শিষ্যা। আশ্রমের মহিলা শিষ্যারা বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে এবং প্রথাগত অনুষ্ঠান সহকারে বাবাকে পূজা নিবেদন করলেন। বাবা নিশ্চয়ই এদের তাঁর স্বরূপ এবং অভিন্নতার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে কৃপা করেছিলেন, কারণ এরা প্রশান্তি-নিলয়মে আসবার জন্য তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বাবা বললেন যে, অন্য সব স্থানের মত সাকোরির আশ্রমেও তিনি বিরাজ করছেন এবং এই আশ্রমে থাকাই তাদের পক্ষে মঙ্গলের হবে।

শিরডির সাইবাবা এবং সত্য সাইবাবা উভয়ের অলৌকিকত্ব দর্শনের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা হয়তো দুজনের ভঙ্গী, ভাষা এবং পদ্ধতিতে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, কিন্তু মাদ্রাজের শ্রদ্ধানন্দ ভারতী—যিনি দুই বাবাকেই দর্শন ক'রে অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন—তাঁর ভাষায়—"উভয়ের কর্ম ও বাণীর মধ্যে যে একটা অভিন্নতা বা একত্ব বর্তমান—এতে কোন ভুল নেই।" সত্য সাইবাবা বলেন যে তিনি "পূর্বদেহে" অজ্ঞানতা, অবহেলা, অবাধ্যতা বা অহংকারের প্রতি যেরকম কঠোর ও নির্দয় হতেন, বর্তমানে আর তা হন না। একটি উপমার মাধ্যমে তিনি চমৎকারভাবে এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন। "মা যখন রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তখন ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে ঢুকে তাঁকে বিরক্ত করলে মা ভীষণ রেগে যান। কিন্তু সেই মা আবার হাসিমুখে যখন খাবার পরিবেশন করেন তখন তাঁর অন্যরূপ—আনন্দময়ী এবং ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। আমি এখন যা করছি তা হ'লো তোমাদের খাবার পরিবেশন—রান্না আগেই করা ছিল। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, তোমার পেটে যদি খিদে আর হাতে একটা থালা থাকে, তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো আমি তোমাকে নিজে হাতে পরিবেশন ক'রে প্রাণভরে খাওয়াবো।"

শিরডি সাইবাবা, শিরডিগ্রামের এক 'চাবাডি' বা বিশ্রামালয়ে, একদিন বাদে বাদে শয়ন করতেন। প্রতি সপ্তাহে এক সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে, ভক্তরা তাঁকে এই 'চাবাডি'তে নিয়ে যেতেন। এই শোভাযাত্রার আড়ম্বরের বর্ণনা পাঠ ক'রে অনেকেই রোমাঞ্চিত হয়েছেন। এই শোভা-যাত্রার সুসজ্জিত ঘোড়া, রথ, শিবিকা এবং অন্যান্য সমারোহ দেখে এঁরা হয়তো বলতে পারেন যে সত্য সাইবাবা তাঁকে নিয়ে এরকম সমারোহ করার অনুমতি তাঁর ভক্তদের কেন দেন না। মেঝে থেকে চারহাত ওপরে, অত্যন্ত বিপদ-জনকভাবে কাপড়ের ছেঁড়া ফালি দিয়ে ঝোলানো কাঠের যে একহাত চওড়া তক্তার ওপর শিরডি সাইবাবা অবিশ্বাস্যভাবে নিদ্রা যেতেন, তাঁর বর্ণনা যারা পড়েছেন তারা আবার খুশি হবেন এই মনে করে যে সত্য সাইবাবা অত কৃচ্ছ্রসাধন পছন্দ করেন না।

দুই সাই বাবার অভিন্নতা ঠিকমত অনুধাবন করতে পারার অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাবা একবার ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজে সারা ভারত

সাইসমাজের সভায় বলেছিলেন, "শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব জীবনের নানা ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁদের পার্থক্য দেখা যায়। নৈতিক আচরণ এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার ব্যাপারেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য ছিল,—একজন যেদিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন অপরজন সেদিকে অতটা দেননি। শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির পদ্ধতিতেও তাঁদের মধ্যে মিল ছিল না। এইসব পার্থক্য শুধু প্রকাশের প্রণালীতেই সীমাবদ্ধ, মৌলিক ব্যাপারে নয়। যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ—এই তত্ত্ব বিশ্বাস করা খুব কঠিন মনে হলেও এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সেইরকম, যারা আমার এই রহস্যতত্ত্বের গভীরে ডুব দিয়েছে, একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারবে যে শক্তি একই আছে, শুধু দেহ ভিন্ন।"

যারা শিরডি সাইবাবার অলৌকিকত্ব, তাঁর সর্বজ্ঞতা, তাঁর সর্বব্যাপকতা, তাঁর শিক্ষা, এবং তাঁর বিশ্বপ্রেমের সংবাদ রাখেন, তারা শ্রীসত্য সাইবাবার পবিত্র সান্নিধ্যে মাত্র কয়েকটি দিন কাটালেই দু'জনের একত্ব উপলব্ধি ক'রবেন। এঁদের দুজনের কথাবার্তায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং শিক্ষাদান প্রণালীতে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

১৯৬০ সালে, প্রশান্তি-নিলয়মে, শ্রীশ্রীগায়ত্রী স্বামী এসেছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীনরসিংহ ভারতী স্বামীর শিষ্য এবং স্বামী অমৃতানন্দের গুরুভ্রাতা। স্বামী অমৃতানন্দের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৯০৬ সালের সম্পূর্ণ বছরটা তিনি শিরডি সাইবাবার সাথে একত্রে অতিবাহিত করেছিলেন এবং তার পরেও তাঁকে বহুবার দর্শন করেছেন। পূর্বে বর্ণিত "গুলি ছুঁড়োনা" ঘটনার মত শিরডি সাইবাবার সম্পর্কে অনেক ঘটনার কথা তিনি বললেন। শিরডি সাইবাবার জীবনের ছোট ছোট অনেক গল্প শোনালেন যেগুলি বর্তমান অবতারের সাথে মিলে যায়। এমনকি দুজনের কিছু কৌতুকও অবিকল এক।

সেবার, পুট্টাপর্তী ত্যাগ করার আগের রাত্রে, তিনি তাঁর গুরু শিরডি সাইবাবার দর্শন পান। সিরডিবাবা গায়ত্রী স্বামীকে বলেন যে সমাধিস্থ হবার আট বছর পর তিনি সমাধি ত্যাগ করেন এবং তাঁর সমস্ত 'সম্পত্তি' ১৫ বছর পর তিনি নিয়ে আসেন! পরদিন সকালে গায়ত্রী স্বামী নিলয়মের আশ্রমিকদের কাছে একথা শুনে আশ্চর্য হলেন যে সত্য সাইবাবা, শিরডি সাইবাবার মৃত্যুর ৮ বছর পরে, ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ১৫ বছর বয়সে তিনি

"বাবা" নাম গ্রহণ এবং শিরডি বাবার সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় শক্তি উদ্ঘাটন করেছেন। এই নাম ও শক্তিকেই 'সম্পত্তি' বলে তাঁর গুরু নিশ্চয় উল্লেখ করেছেন, গায়ত্রী স্বামী এই কথা জানালেন। গায়ত্রী স্বামী ইণ্টারভিউ পাননি বলে কোন খেদ করলেন না। কারণ, তিনি জানালেন তিনি 'সেণ্টার-ভিউ' (centre-view) পেয়েছেন অর্থাৎ একেবারে মূল তত্ত্ব অবগত হয়েছেন। পরম আনন্দ সাথে নিয়ে গায়ত্রী পুট্টাপর্তী ত্যাগ করলেন। তাঁর শিশুর মত সরল আচরণ সকলকে সর্বক্ষণ স্বামী অমৃতানন্দের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

যোগী শুদ্ধানন্দ ভারতী বলেন যে তিনি একবার লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এবং করন্দিকরের সঙ্গে শিরডি সাইবাবাকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সাইবাবা তখন তাঁদের বলেছিলেন যে বন্দুকের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করা বৃথা, কারণ শক্তিদ্বারা কিছু লাভ করলে শক্তির কাছেই তাকে হারাতে হয়। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। সত্য সাইবাবাও প্রেমকে সবার ওপরে স্থান যেন—যে প্রেমের ভিত্তি হ'লো সমবেদনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া।

প্রসিদ্ধ লেখক ওলাফ স্ট্যাপল্‌ডন (Olaf Stapledon) ইউরোপ এবং পাশ্চাত্য দেশ সম্পর্কে লিখেছেন, "ইতিমধ্যেই দুটি বিশ্বযুদ্ধের আগে এক জড়বাদী, ভোগবিলাসী, হল্লাবাজ, বেপরোয়া, সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীন সভ্যতা দুঃস্বপ্নের মত সমাজের বুকে চেপে বসতে শুরু করেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই বিভীষিকা আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ ক'রলো। লোকের মনে বিতৃষ্ণা জেগে উঠলো। সমাজের বৃহৎ অংশ ব্যক্তিবাদের আওতা থেকে পালিয়ে এলো এবং একটি খাঁটি সমাজ গঠনের জন্য জনতা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলো। এর ফলে সৃষ্টি হ'লো গণতান্ত্রিক সমাজবাদের জন্য আন্দোলন এবং একই সাথে এই সমাজবাদের বিকৃত রূপ—একদলীয় শাসনতন্ত্রের জন্য আন্দোলন। এর বিরুদ্ধে গজিয়ে উঠলো বাণিজ্যিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং হীন গোষ্ঠীবাদ, যে দুই মতবাদের কাছ থেকে, সত্যভ্রষ্ট এবং আতঙ্কে কম্পমান পৃথিবী মোক্ষম শিক্ষালাভ করলো।" কিন্তু এই ব্যাধি ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ পৃথিবী অতি দ্রুত গতিতে ভৌগোলিক ব্যবধান কমিয়ে ফেলছে।

শিরডি সাইবাবার দ্বিতীবার আবির্ভাবের আর একটি কারণও ছিল এই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্ট্যাপল্‌ডন বলছেন, "খোদ বিজ্ঞানই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ পেশ করছে তাতে মনে হয় আধুনিক জ্ঞান যে সব অনুমানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তা সত্য নয়! অন্যের মনের খবর বলতে পারা, অতীত এবং ভবিষ্যৎ-এর কথা বলা—এই সব ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের সমর্থনে বিজ্ঞান জোরালো প্রমাণ হাজির করেছে। এই সব দেখে মনে হয় যে ভবিষ্যতের গর্ভে যে সব ঘটনাবলী আছে, যাকে গোঁড়া মত অনুসারে বলা হয় অস্তিত্বহীন, সেগুলি চৈতন্যে প্রতিফলিত হতে পারে! একইভাবে অতীতের ঘটনাবলীও। সময় ও মানুষের মনের পার্থিব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের এতদিনকার পরিচিত অনুমান এইসব ঘটনায় অসার হয়ে দাঁড়ায়। এইসব অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে 'আধুনিক জ্ঞানের' রূপান্তর-সাধন করতেই হবে।"

শিরডি সাইবাবা এবং বর্তমান সত্য সাইবাবা ঠিক এই কাজই করে চলেছেন। যুগ যুগ ধরে প্রবহমান জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধের ধারার ওপর এঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের খবর বলে দিয়ে, দূরে অবস্থানকারী একাধিক লোকের সাথে মনের সংযোগ স্থাপন করে, একই সাথে একাধিক স্থানে বিরাজ করে এবং আরো নানা প্রকার নাম-না-জানা অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করে এঁরা সমগ্র মানবজাতিকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাথে পরিচিত করাচ্ছেন এবং 'আধুনিক জ্ঞানের' কাঠামো পাল্‌টাচ্ছেন। এইভাবে মানুষের কাছে তাঁরা প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন যে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ভাণ্ডার তার মধ্যেই বর্তমান। এইসব কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে বিজ্ঞানের রথী মহারথীরা হতভম্ব হয়েছেন।

দুই সাই অবতারের উদ্দেশ্য একই। শুধু 'আধুনিক জ্ঞানের' রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। শিরডি সাইবাবা সমাজের ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন—সত্য সাইবাবা গুরুত্ব দিচ্ছেন ব্যক্তির ওপর। তখন সকলের মঙ্গলের জন্য কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল—এখন প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে সকলের এবং সেই সঙ্গে নিজের অন্তরস্থিত আত্মার প্রতি প্রেমের ওপর। তখন অপেক্ষাকৃত অল্প কয়েকজনের কাছে এই বাণী প্রচারিত হয়েছিল

এখন সবার জন্যে দ্বার উন্মুক্তই শুধু নয়, যে উৎসুক তার কাছে গিয়েও এই বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়।

শ্রীসত্য সাইবাবার জীবনকাহিনী উত্তমরূপে জানেন, এইরকম এক ব্যক্তি যদি শ্রীহেমাডপন্থের মারাঠী ভাষায় রচিত বই অবলম্বনে শ্রী এন. ভি. গুণাজীর ইংরাজী ভাষায় লেখা 'সাই-সৎচরিত' গ্রন্থটি পাঠ করেন, তবে তিনি বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় এই দুই অবতারের অভিন্নতা এবং ধারাবাহিকতার পরিচয় পাবেন। স্বয়ং সত্য সাইবাবার মুখে যে সব বাণী তিনি প্রায়ই শুনতে পান, অবিকল তারই প্রতিধ্বনি এই বইটির পাতায় পাতায় তিনি দেখতে পাবেন।

এই গ্রন্থে আছে, শিরডি সাইবাবা ভক্তদের সাবধান করছেন এই বলে "তুমি যেখানেই থাকো, যা খুশি করো, এই কথাটি সর্বদা মনে রাখবে যে তোমার সব কিছু আমি জানি। আমি সকলের অন্তরের অধিপতি। তোমার অন্তরের মধ্যে আমি বাস করছি। আমি এখানে অবস্থান করলেও সাত-সমুদ্র-তের-নদী পারে তুমি কি করছো তাও আমি জানতে পারি। বিশাল পৃথিবীর যেখানেই তুমি যাও আমি সবসময় তোমার সঙ্গে আছি।" সত্য সাইবাবাও অসংখ্যবার ঠিক একই কথা বলেছেন।

একবার প্রশান্তি-নিলয়মের কিছু ভক্ত ত্রিবান্দ্রম থেকে সুন্দরাই যাবার পথে কোটাল্লামে নেমে কোথায় উঠবেন, এ নিয়ে যখন চিন্তা করছিলেন, তখন বাবা বললেন, "দাঁড়াও। আমি বলে দিচ্ছি।" পরদিন সকালে তিনি ওখানকার ত্রিবাঙ্কুর প্রাসাদের খুঁটিনাটি বিবরণ দিলেন। ঘরের মোট সংখ্যা, বাগানে কি কি গাছ আছে, বাইরের দেয়াল কত উঁচু, টেলিফোনটি হলঘরের কোনখানে রাখা আছে ইত্যাদি আরো অনেক বিবরণ। এ সবের তালিকা তৈরী হ'লে বাবা আরও কিছু এর ওপর যোগ করলেন—এর মধ্যে ছিল গাড়ীবারান্দার দুই প্রান্তে দুটি 'বুগান-ভিলিয়া' গাছের ঝাড়! তিনি নিলয়মে বসে থেকেই এসব কিছু দেখতে পেয়েছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজপ্রাসাদে পৌঁছে সবাই লিস্ট মিলিয়ে দেখল, কোন ভুল নেই—লিস্টে যা লেখা ছিল সবই সেখানে দেখা গেল, এমন কি গ্যারেজের পাশের উপেক্ষিত গোলাপ গাছটি পর্যন্ত!

ভক্তদের কাছে বাবা প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে তিনি সদাসর্বদা তাদের

সঙ্গে রয়েছেন এবং তারা যা কিছু চিন্তা করছে, যে কথা বলছে এবং যে কাজ করছে -কিছুই বাবার অজানা নয়।

কয়েক বছর আগে পুট্টাপর্তীতে এক ভক্ত এলে বাবা তাকে বললেন যে তার বাড়ীর ভজন শুনে তাঁর কানে যন্ত্রণা হচ্ছে! তিনি জানালেন এর কারণ। বললেন, "এক প্রতিবেশী এসে ভজনে যোগ দিয়ে বেসুরো গলায় গাইছে। সুর ও তালজ্ঞান এর একেবারেই নেই এবং অন্যের সাথে গলাও ঠিকমত মেলাতে পারে না।" যন্ত্রণার কথা অবশ্য বাবা ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন কিন্তু ঐ কর্কশ গলার কথা তিনি কি ক'রে জানলেন যদি না বাস্তবিকই তিনি স্বকর্ণে শুনে থাকেন?

বাবা লোককে অবাক ক'রে দেন তার মনের গুপ্ত চিন্তা এবং অত্যন্ত গোপন কোন কর্মের কথা প্রকাশ ক'রে। 'বই-এর খোলা পাতার' মত তিনি তা পড়তে পারেন। একবার পুলিশের এক ইন্সপেক্টর জেনারেল বাবার সঙ্গে ইণ্টারভিউএর জন্য ঘরের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় তার বন্ধুকে একটু গর্ব ক'রে বললেন, "আমার জীবনের একটি গোপন ঘটনার কথা যদি তিনি বলতে পারেন তবে আমি তার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।" ভদ্রলোকের ডাক এলো। তিনি ভেতরে গেলেন এবং ইণ্টারভিউ শেষ হ'লে বেরিয়ে এলেন। এবারে কিন্তু ভদ্রলোক খুব খুশি, চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, "কি আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি আমার আদ্যন্ত সবকিছু জানেন, এমনকি সরকারী, বেসরকারী যাবতীয় ব্যাপার!"

তীর্থযাত্রা বা সমুদ্রযাত্রার পূর্বে দর্শন করতে এলে অনেক সময় বাবা ভক্তদের রহস্য ক'রে বলেন, 'চারজন যাত্রীর জন্যে তিনটি টিকিট কাটবে'—এর অর্থ, ভক্তরা তিনজন তো স্থূলদেহের যাত্রী এবং বাবা সদাসর্বদা ভক্তদের সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদেহের যাত্রী বলে তাঁর কোন টিকিটের প্রয়োজন নেই!

১৯৪৯ সালে কাশ্মীরে এক পাইলটকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাবা বাঁচান তাঁর স্থূলদেহ পুট্টাপর্তীতে ত্যাগ করে। যারা পুট্টাপর্তীতে বাবাকে অচেতন অবস্থায় প'ড়ে থাকতে দেখেছিল, তারা পরে খোঁজ খবর নিয়ে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এনেছে। বাবা ১২ ঘণ্টা দেহের বাইরে ছিলেন। দেহে

ফিরে এসে বাবা বলেছিলেন, তিনি শুধু যে পাইলটের হাত থেকে বিষের পাত্র ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তাই নয়, যে আদালতে ঐ পাইলটের বিচার চলছিল তিনি সেই আদালত-কক্ষেও ঢুকেছিলেন। তিনি একজন সামরিক বিচারপতির মাধ্যমে একটি প্রতিবাদ উত্থাপন করেন যার ফলে মামলা বাতিল হয়ে যায় এবং তিনি আদালতকে বাধ্য করেন 'আসামী নির্দোষ' এই রায় দান করতে। বাবা বলেছিলেন যে এই পাইলটটি শিরডি সাইবাবার একজন গোঁড়া ভক্ত ছিল এবং এর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ করার মিথ্যে অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

শিরডি সাইবাবা সম্পর্কে শ্রীগুণাজী লিখেছেন, "তাঁর কর্মকেন্দ্র যদিও শিরডিতে ছিল, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল বহুদূর পর্যন্ত—বম্বে, কলকাতা, উত্তর ভারত, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ কানাড়া।" সত্য সাই অবতারের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। সুদূর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা, আমেরিকা, জাপান এবং জার্মানিতে ভক্তরা তাঁর অভয়হস্ত দর্শন করেছে। শ্রী জি. ভি. ভেঙ্কটমুণি সস্ত্রীক ইউরোপ ভ্রমণে যান। সেখান থেকে তাঁরা রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেক উৎসবে যোগ দেবেন বলে লণ্ডনের পথে প্যারিস শহরে আসেন। প্যারিসের দোকানে কেনাকাটা ক'রবার সময় তাঁরা টের পেলেন তাঁদের সঙ্গে যে ট্রাভেলার্স চেকগুলি ছিল, সেগুলি সব হারিয়ে গেছে। এই বিপদে তাঁরা খুবই ভেঙ্গে পড়লেন। মানিব্যাগ, বিছানা থেকে শুরু করে সব জায়গা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও সেগুলি পাওয়া গেল না। অজানা-অচেনা বিদেশে তাঁদের দুর্দশার কথা চিন্তা ক'রে তাঁরা খুবই কাতর হ'লেন। তখন তাঁরা আকুল হয়ে বাবাকে ডাকতে লাগলেন, যেমন চিরকাল বিপদে-আপদে পড়লে বাবাকে ডেকেছেন। হাজার হাজার মাইল দূরে বাবার কানে এঁদের আকুল কান্নার আওয়াজ পৌছালো। পরদিন, অন্য কি একটা জিনিস বের করতে গিয়ে ঐ একই মানিব্যাগে হাত ঢোকাতেই বেরিয়ে এলো চেকের হারিয়ে যাওয়া তাড়া সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়। এদের আনন্দ আর বিস্ময় অনুমান করা শক্ত নয়।

বাবার স্কুলের দুই সহপাঠী বড় হয়ে সেনাদলে ভর্তি হন। একবার তারা একটি দুর্ঘটনায় পড়েন। পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন লেগে ছড়িয়ে গেলে তারা

আগুনের মধ্যে আটকে পড়েন। বাবা বলেছেন এই ঘটনা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে ঘটেছিল। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর ছেলে দুটি দেশে ফিরলে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। পুট্টাপর্তীতে বাবা তৎক্ষণাৎ তাঁর স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে দুর্ঘটনাস্থলে চলে গিয়েছিলেন এবং ছেলে দুটির তাঁবুর চারপাশে জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে তাঁবু স্পর্শ করতে দেননি।

"সাই-সৎচরিত" গ্রন্থে আছে, "৯৫ বছরের বৃদ্ধ গৌলিভাবা পান্ধারপুর গিয়ে শিরডি সাইবাবাকে ভগবান বিঠ্ঠলরূপে দর্শন ক'রে আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ইনিই বিঠ্ঠলের অবতার, দীন-দরিদ্রের সহায়, করুণাময় ঈশ্বর'।"

গত বছর এক ভক্ত পরিবার শিরডি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাদের পান্ধারপুর যাওয়া হ'লো না। কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং বন্যার ফলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এঁরা পুট্টাপর্তী ফিরে আসেন। বাবার কাছে এলে তিনি পরিবারের বৃদ্ধ পিতা এবং মাতাকে বলেন, "তোমাদের বিঠ্ঠল দর্শন হয়নি, তাই না? তীর্থযাত্রার মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে বলে তোমরা মনে খুবই ব্যথা পেয়েছো বলে মনে হচ্ছে। তোমাদের যদি বিঠ্ঠল দর্শন করবার ইচ্ছা থাকে তবে আমার দিকে তাকাও।" এরা বাবার দিকে তাকিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতে লাগলো, কারণ বাবা ভক্তের খাতিরে বিঠ্ঠল রূপ ধারণ করেছিলেন।

শিরডির সাইবাবা সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি রাম, কৃষ্ণ, শিব এবং মারুতি-রূপ ধারণ করেছিলেন। "সাই-সৎচরিত" গ্রন্থে একটি ডাক্তার ভক্তের কথা আছে যিনি শিরডি সাইবাবাকে দর্শন করতে গিয়ে, 'বাবাকে দেখতে পাননি। তিনি দর্শন করলেন তাঁর প্রিয়তম দেবতা শ্রীরামচন্দ্র বাবার আসনে বসে।'

অসংখ্য ভক্ত সাক্ষ্য দেবেন যে সত্য সাইবাবাও ভক্তদের কাছে রাম, কৃষ্ণ এবং কামাক্ষীরূপে দর্শন দিয়েছেন।

বাবার ঈশ্বরত্বের এই বিশেষ দিক সম্বন্ধে বলতে গেলে পুট্টাপর্তীতে স্বামী অমৃতানন্দের অভিজ্ঞতা একটি মূল্যবান উদাহরণ। প্রশান্তিনিলয়মে পৌঁছানো মাত্র অমৃতানন্দ শুনলেন বাবা তাঁকে সম্বোধন করছেন "অমৃতম্" বলে। চমকে উঠলেন স্বামী অমৃতানন্দ। এই নামে, এই সুরে এই ভাবে তো একজনই তাঁকে ডাকতেন। তিনি হ'লেন রমণ মহর্ষি। অমৃতানন্দ বলছেন, "দক্ষিণ ভারতের

বিখ্যাত তপস্বী রমণ মহর্ষি আমাকে ঐ নামে ডাকতেন। তাঁর সঙ্গে আমি ১৭ বছর কাটিয়েছি। রমণ মহর্ষির গলার স্বর এবং বলবার ভঙ্গী অবিকল এইরকম ছিল!" পরে বাবা এই ৮৫ বছরের বৃদ্ধ স্বামীজিকে 'গণপতি হোমের' বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। স্বামী অমৃতানন্দ যখন মাত্র ৭ বছরের বালক তখন ৪১ দিন ব্যাপী এই যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। বাবা স্বামীজীকে এই যজ্ঞের খুঁটিনাটি সব বিবরণ দিলেন এবং প্রতিবার অগ্নিতে আহুতিদানের সময় যে দীর্ঘ জটিল মন্ত্র পাঠ করা হয়েছিল তাও বলে দিলেন। বাবা যে মন্ত্রের কথা বললেন তা এইভাবে আরম্ভ হয়েছে, "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গাং।" এইগুলি সব বীজমন্ত্র, শব্দের বীজ থেকে এর উৎপত্তি। বাবা স্বামীজিকে বললেন যে তিনি দিনে এক হাজার বার ক'রে ৪১ দিন এই মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং সমান সংখ্যক নারকেল যজ্ঞে আহুতি দিয়েছেন। বাবা বৃদ্ধ তপস্বীকে জিজ্ঞেস করলেন "কিন্তু এ সবের জন্য প্রতিদানে, শাস্ত্রে কি দেবার নির্দেশ আছে?" স্বামীজী উত্তরে বললেন যে যত্নশীল হয়ে, পরম শ্রদ্ধা সহকারে, যজ্ঞের রীতিনীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যদি যজ্ঞ সম্পাদন করা হয় তবে গণপতি দেবতা স্বয়ং স্বর্ণবর্ণ, জ্যোতিষ্মান গজানন মূর্তি ধারণ ক'রে ঐ হোমকুণ্ড থেকে উত্থিত হবেন, শুণ্ড দ্বারা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি গ্রহণ ক'রে দর্শন দেবেন এবং অক্ষয়শান্তি প্রদান করবেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি এই দর্শন পেয়েছিলেন? অমৃতানন্দ বললেন, সাত বৎসর বয়স্ক এক বালকের পক্ষে শুধু মন্ত্র এবং আহুতির সংখ্যার ওপর নির্ভর ক'রে ভগবানের দর্শন লাভ করা সহজ নয়। বাবা বাধাদান ক'রে বললেন, "না না। সেই সব মন্ত্র পাঠ এবং যজ্ঞের পুণ্যের জোরেই আজ তুমি আমার কাছে এসেছো। দীর্ঘ ৭৮ বছর পর, শাস্ত্রের প্রতিশ্রুত পুরস্কার আজ তুমি লাভ করবে।"

বাবা স্বামী অমৃতানন্দকে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে বললেন। অমৃতানন্দ দর্শন করলেন,—শাস্ত্রে যে ভাবে বর্ণনা করা আছে ঠিক সেই রকমই স্বর্ণবর্ণ, জ্যোতিষ্মান, গজানন, গণপতি রূপ! এই দিব্য-দর্শনের পর চারদিন ধরে স্বামী অমৃতানন্দ আনন্দসাগরে ডুবে ছিলেন—আহার, তৃষ্ণা এবং নিদ্রার অনুভূতি বিস্মৃত হয়ে।

শ্রীহেমাডপন্থ উল্লেখ করেছেন যে শিরডির সাইবাবা ছিলেন 'বৈদ্য শিরোমণি

এবং তিনি কখনো নিজের কথা ভাবতেন না। সর্বদা অন্যের কল্যাণের জন্যে কাজ ক'রে গিয়েছেন। এইসব কর্মের ফলে তিনি অনেকসময় তীব্র ও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।' শিরডি সাইবাবার বর্তমান অবতার সত্য সাইবাবা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। তিনিও ভক্তদের অনেক অসুখ তাঁর দেহে নিয়েছেন। যেমন মাম্‌স্‌, টাইফয়েড এবং অন্যান্য জ্বর, প্রসববেদনা, অগ্নিদগ্ধের ক্ষত ইত্যাদি।

একজন ডাক্তার মাদুরাই-এর কাছে কোন স্থান থেকে বাবাকে লিখেছিলেন 'হঠাৎ কোন কথা নেই বার্তা নেই আমার কান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগলো। সাংঘাতিক যন্ত্রণা হলো। সারাদিন কষ্টে কাটালাম। আবার কোন কথা নেই বার্তা নেই, যন্ত্রণা চলে গেল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো, আমি সুস্থ হলাম।' ঠিক যে সময় ডাক্তারের চিঠি পুট্টাপর্তী পৌছায় তখন বাবা স্বয়ং কানের যন্ত্রণা এবং রক্তপাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। বাবা প্রকাশ করলেন যে তিনি এক ভক্তের কষ্টকর যন্ত্রণা স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৫৯ সালের ২১শে জুন, বাঙ্গালোরে বাবার জ্বর হলো, টেম্পারেচার হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে হলো ১০৪·৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট। তখন বেলা দেড়টা। পাঁচ মিনিট পরে ভক্তরা স্বস্তি পেলেন যখন বাবার জ্বর নেমে গেল ৯৯ ডিগ্রীতে। রাত সাড়ে নটার আগে পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি, কেনই বা হঠাৎ এত জ্বর এলো আর কেনই বা হঠাৎ জ্বর নেমে গেল। রাতে, খোলা ছাদে, জোছনার আলোয় বসে খাওয়ার সময় বাবা মাদ্রাজের এক ভক্ত যুবককে নির্দেশ দিলেন "আগামীকাল তুমি তোমার মাকে গিয়ে বলবে যে, তিনি যেন আগুনের ব্যাপারে আরো সাবধান হন। বলবে যে বাবা আশ্বাস দিয়েছেন কখনও তাঁর কোন অনিষ্ট হবে না। বাবা সর্বদা তাঁর সাথে সাথে আছেন।" বাবা বললেন যে যুবকটির মা ঠাকুরঘরে বসে পূজো করার সময় প্রদীপ থেকে তাঁর শাড়ীর আঁচলে আগুন লেগে যায়। বাবার অতিথিদের মধ্যে একজন কৌতূহলী হয়ে ২২২ মাইল দূরে মাদ্রাজে ঐ মহিলার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। বাবা টেলিফোন তুললে ভদ্রমহিলা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন আগুন নেভাতে গিয়ে বাবার হাত পুড়েছে কিনা, কারণ বাবার এই প্রকার করুণার অনেক ঘটনা মহিলাটি জানতেন। বাবা বললেন, "না না। আমার হাত পোড়েনি। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে শুধু গায়ের তাপ বেড়ে গিয়েছিল।"

শিরডি সাইবাবার হাতও একবার পুড়ে গিয়েছিল একটি শিশুকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে। এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল শিরডি থেকে অনেক মাইল দূরে। শিরডিবাবা বলেছিলেন, "শিশুটি জলন্ত উনুনে পড়ে গেল। আমি তক্ষুণি আমার হাত দিয়ে জোরে ধাক্কা মেরে ছেলেটিকে বাঁচালাম। আমার হাত পুড়েছে বলে আমি কিছু ভাবি না। শিশুটির প্রাণ রক্ষা পেয়েছে—এতেই আমার আনন্দ।" করুণা প্রদর্শনের পদ্ধতি দুই অবতারের ক্ষেত্রেই একরকম।

শিরডি সাইবাবা সম্পর্কে লেখা অপূর্ব গ্রন্থ 'সাই-সৎচরিতের' কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে অনেক অসুখের কথা বলা হয়েছে যেগুলি শিরডিবাবা আদেশ করামাত্র ভাল হ'য়ে যেত! তিনি এইরকম আদেশ দিতেন—'তোমার আর দাস্ত হবে না'; 'বমি এক্ষুণি বন্ধ হবে'; 'তোমার উদরাময় ভাল হয়ে গেছে'; 'সাপের বিষ! খবরদার, আর ওপরে উঠিস্ না' ইত্যাদি।

সত্য সাইবাবাও একই প্রকার অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের ধারা অব্যাহত রেখেছেন এবং যত পুরানো ব্যাধিই হোক না কেন শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই তিনি তা সারাতে পারেন। কুপ্পম্ শহরের এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে মৃত বলে ঘোষণা করার পর 'মৃতদেহ' দু'দিন রেখে দেওয়া হ'য়েছিল। কারণ সৎকার ক'রবার জন্য বাবার অনুমতি পাওয়া যায়নি। তৃতীয় দিন বাবা 'মৃতদেহ'কে উঠে বসতে আদেশ দিলেন এবং 'মৃতদেহ' সেই আদেশ পালন ক'রে উঠে বসলো! সালেমের এক যুবক কঠিন উদরাময়ে ভুগছিল। বাবা তাকে আদেশ দিলেন 'আর দাস্ত হবে না' এবং দাস্ত বন্ধ হ'য়ে যায়! পুট্টাপর্তীতে একটি কিশোরী চোখে এত কম দেখতো যে একহাতে দেয়াল ধরে ধরে তাকে চলতে হ'তো। সূর্যের আলো তার চোখে সহ্য হ'তো না। রোদ লাগলে তার চোখ ভীষণ জ্বালা ক'রতো এবং মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হ'তো। সারাদিন সে অন্ধকার ঘরে কাটাতো। মহীশূর, মাদ্রাজ, বম্বের সব নামকরা চোখের ডাক্তারদের দেখান সত্ত্বেও কোন উপকার হয়নি। ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে তার দিন কাটতো। অবশেষে একদিন বাবাকে দর্শনের পরে, বাবা তাকে ব'ললেন, "বাড়ী যাও, দেখবে চোখ ভাল হ'য়ে গেছে।" শূন্যে হাত ঘুরিয়ে এক শিশি চোখে দেবার ওষুধ সৃষ্টি ক'রে বাবা তাকে ব'ললেন, "এই ওষুধ চোখে দেবে।

৩।১ ফোঁটা দিলেই হবে।" মেয়েটি বাড়ী গিয়ে টের পেল তার চোখ সম্পূর্ণরূপে ভাল হ'য়ে গেছে। বাবার আদেশ এইভাবে পালিত হয়েছিল।

'সাই-সৎচরিত' শিরডিবাবা সম্পর্কে বলছে—"তিনি যাদুকর হিসেবে বিখ্যাত হ'য়ে উঠলেন। কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল কোনরকম ওষুধ ব্যবহার না ক'রেই।" সত্য সাইবাবা সম্পর্কেও এইকথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ঐ গ্রন্থে আরো আছে, শিরডি সাইবাবা বলতেন "আমিই জননী, আদ্যাশক্তি, ত্রিগুণের আধার, দৃশ্য-জগতের চালিকাশক্তি। আমিই সৃষ্টি করি, আমিই পালন করি এবং আমিই সংহার করি।" আবার তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ক'রতেন যে তিনিই ভগবান বাসুদেব। একইভাবে বাবাও অসংখ্যবার ঘোষণা ক'রেছেন যে তিনি বিশ্বত্রাণ ক'রতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। ১৯৫২ সালে বাবার একটি কথায় এই মহাসত্যের আভাস পাওয়া যায়। বাবার ভগ্নীপতির আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত পরিবার এবং গ্রামের সবাই শোকে মুহ্যমান। সৎকারের কয়েকঘণ্টা পরে দেখা গেল বাবা পৈত্রিক গৃহের বাইরে রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে। শোকার্ত ভগ্নীর বিলাপের কাতর আর্তনাদ বাড়ীর ভেতর থেকে ভেসে আসছে। ভগ্নীর শিশুপুত্র দিদিমা ঈশ্বরাম্মার কোলে বাবার সামনে বসে আছে। বাবাকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে বাবা, মা, বোন ভাইয়েরা এবং আরো অনেক শোকার্ত ব্যক্তি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে আছেন। বাবা করুণ হাসি হাসলেন জিহ্বায় দুঃখসূচক শব্দ ক'রলেন এবং যেন মৃদু ভর্ৎসনাচ্ছলে বললেন, "একী? জন্ম মৃত্যু কিছুই যদি না থাকে তবে আমি আমার সময় কাটাবো কি করে।" বাবা কি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ—স্বয়ং ঈশ্বর নন?

শিরডি সাইবাবা প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারতেন। একবার আকাশ কালো ক'রে প্রচণ্ড ঝড়ের সূচনা হ'লো। ভীষণ বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ভেসে গেল। গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হ'য়ে বাবার শরণাপন্ন হ'লে বাবা সেই প্রাকৃতিক দানবকে আদেশ দিয়ে বললেন, "পাগলামি থামাও। শান্ত হও।" ঝড় কথা শুনলো, দুর্যোগ থেমে গেল। এই ঘটনার কথাও "সৎ-চরিতে" লেখা আছে।

তিনি একবার এক বিধ্বংসী আগুনকে শান্ত হবার আদেশ দেওয়ায় আগুন তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হয়।

সত্য সাইবাবার ভক্তদের স্মৃতিতেও এরকম অজস্র ঘটনা সযত্নে সঞ্চিত আছে। কারণ এতো সেই একই লীলার প্রবহমান ধারা। বৃষ্টিপাতের এক ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীচাল্লা আপ্পারাও লিখেছেন, "বিজয়া দশমীর দিন রাত্রে বাবাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করার সময় এই ঘটনা হয়। বাবা সুন্দরভাবে সাজানো একটি রথের মধ্যে বসে আছেন। শোভাযাত্রা যখন শুরু হয় তখন আকাশ থমথমে ছিল। কালো মেঘে ঝড়ের আভাস, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর কড়কড় শব্দে বাজ পড়ছে। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। শোভাযাত্রা যখন মন্দিরে ফিরে এলো তখন তিন ঘণ্টারও বেশী সময় কেটে গেছে। অথচ এর মধ্যে এককোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি। স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কার শক্তি আছে যিনি এতক্ষণ ধরে বৃষ্টিকে আটকে রাখতে পারেন? বাবা রথ থেকে নেমে ওপরে চলে গেলেন। আর সবাই যে যার ঘরে চলে গেল এবং তার পরই আরম্ভ হ'লো অবিশ্রান্ত বর্ষণ।"

একবার মারকারা সহরে সন্ধ্যাবেলা, খোলা মাঠে এক জনসভায় বাবা ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার আকাশে আসন্ন বৃষ্টির অশুভ ইঙ্গিত। দূরের পাহাড়ে বৃষ্টি নেমে গেছে। ধীরে ধীরে বৃষ্টি এগিয়ে আসতে লাগলো এবং ঠিক আধ মাইল দূরে মহাদেবপেটে এসে পৌঁছলো। বাবা কিন্তু শান্ত অবিচল। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে দেড় ঘণ্টা ধ'রে তাঁর ভাষণ দিলেন। ভাষণ শেষ করে বাবা বললেন, "এবার তোমরা বাড়ী যেতে পার। যে বৃষ্টি এতক্ষণ তোমাদের ভিজিয়ে শেষ ক'রে দিতো তা দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।" বাবার কথামত ঠিক দশ মিনিট পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামলো।

পুট্টাপর্তীর চিত্রাবতী নদী পাহাড়ী নদী। মহীশূর রাজ্যের নন্দীপর্বতে এর উৎপত্তি এবং ঐ অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হ'লে চিত্রাবতীতে হঠাৎ ঢল নামে নদীর দুই তীর ছাপিয়ে জলস্রোত নেমে আসে। আশে পাশের কয়েক মাইল এলাকা তখন কয়েক ফুট জলের তলায় ডুবে যায়। এই রকম আকস্মিক বন্যা হওয়ার ফলে পুট্টাপর্তীতে পুরোনো মন্দির, ভজন করার চালাঘর, রান্নাঘর এবং কাছাকাছি জায়গায় প্রায়ই জল ঢুকে পড়ে। সেই জন্যেই প্রশান্তি-নিলয়ম

মন্দিরটি একটু উঁচু জায়গায় নির্মাণ করা হ'য়েছে। এই রকম বন্যা হ'লে বহুবার বাবা জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আদেশ দিয়েছেন "যথেষ্ট হয়েছে—এবার ফিরে যাও।" বন্যার জলও বাবার কথা শুনে সরে গেছে। কয়েক বছর আগে, দশেরা উৎসবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার সময় প্রশান্তি-নিলয়মের সব জায়গায় তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু পরিবেশনের জায়গায় এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি।

১৯৬৩ সালে বাবা পূর্ব গোদাবরী জেলায় গিয়েছিলেন। রাজামন্ত্রী যেতে হ'লে গোদাবরী নদী পার হ'তে হয়। বন্যার ঘোলা জলে নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তীব্র স্রোত বইছে, পুলিশের অনুমতি ছাড়া খেয়া পারাপার নিষিদ্ধ। সারাদিন ধরে টিপটিপ বৃষ্টির সঙ্গে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—পথঘাট কাদায় প্যাচপ্যাচ ক'রছে। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাবা শেষ খেয়া পার হ'য়ে রাজামন্ত্রী পৌঁছলেন। রাজামন্ত্রী থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে মিথিপাড়ুতে এক বাংলোর খোলা বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে বাবা গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বাইরে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখা গেল গোদাবরী স্ফীত হ'য়ে তার আঁচলে মাঠ-ঘাট সব ঢেকে দিয়েছে এবং চারদিক থেকে বৃষ্টির চলমান পর্দা মিথিপাড়ুর দিকে এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আসছে। কিন্তু বাবা যেখানে ছিলেন সেই এলাকার ধারে কাছে বৃষ্টি এলো না আর সভাও চললো অনেক রাত পর্যন্ত। বাবার ইচ্ছাই বৃষ্টির গতিকে রুদ্ধ করেছিল এবং তাকে এক পাও আর এগোতে দেয়নি।

"সাই-সৎচরিতে" আছে শিরডির সাইবাবা ভীমাজি প্যাটেলের অসুখ, দুটি স্বপ্নের মাধ্যমে সারিয়ে দিয়েছিলেন। "তিনি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অনেককে নির্দেশদান ক'রেছেন। একজন মদ্যপায়ীকে তিনি স্বপ্নে দেখা দেন। মাতালটির বুকের ওপর চেপে বসে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'আর কক্ষণো মদ ছোঁব না' বলে প্রতিজ্ঞা করে। তিনি স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কয়েকজনকে নানা মন্ত্র ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।"

বর্তমান সাইবাবাও স্বপ্নের মাধ্যমে অনেক যন্ত্রণাকাতর রোগীর দেহে 'অপারেশন' ক'রেছেন। বাঙ্গালোরের থিরুমল রাওয়ের জীবনে এই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি ঘুম থেকে উঠে টের পেলেন তাঁর যন্ত্রণা আর সেই

এবং বিছানা রক্তে ভিজে গেছে। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন তাঁর অপারেশন হচ্ছে এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। বাবা সার্জন হয়ে, তাকে কৃপা করলেন।

বাবা এবং তাঁর ভক্তদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বপ্নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তিনি ভক্তদের সাবধান করেন, শিক্ষা দেন, নির্দেশদান করেন, চিকিৎসা করেন এবং 'অপারেশন'ও করেন। এইসব স্বপ্নের সময় এবং পরিকল্পনা বাবাই স্থির করেন। বহু ভক্তকে স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে দীক্ষিত ক'রেছেন। অনেক সাধককে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। পরে এই ভক্তরা পুট্টাপর্তী এলে, তিনি তাদের আধ্যাত্মিক সাধনায় সফল হবার সঠিক পদ্ধতি এবং অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন।

শিরডি সাইবাবা যেভাবে মন্থপের বুকের ওপর চেপে বসে তাকে আর মদ স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করেছিলেন, সত্য সাইবাবাও সেইরকম একবার তাঁর এক ভক্তের অবাধ্য জামাতাকে চলন্ত ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে একাকী ভ্রমণকালে স্বপ্নের মধ্যে 'প্রহার' করেছিলেন। ট্রেনটি পরের স্টেশনে এসে থামামাত্র জামাতাটি ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে এবং প্ল্যাটফর্মের অনেকে তার দুই গালে চপেটাঘাতের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পায়।

পুট্টাপর্তীর হাসপাতালে এক উন্মাদ রোগীও এইভাবে স্বপ্নের মধ্যে বাবার কাছে 'প্রহৃত' হয়েছিল। প্রতিবার প্রহারের সময় লোকটি আর্তনাদ ক'রে উঠেছিল আর চিৎকার ক'রে বলেছিল এবার থেকে সে ঠিক সভ্য আচরণ করবে এবং আর প্রহার না করতে বাবার কাছে একভাবে কাকুতি-মিনতি করছিল। ডাক্তাররা বিছানার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখেছিল এবং লোকটির কুৎসিত গালাগালি দেবার স্বভাব ভাল করার জন্য বাবার এইরকম রহস্যময় চিকিৎসাপদ্ধতির কথা অবাক হয়ে ভাবছিল। এই 'প্রহার' রূপ চিকিৎসায় লোকটি দেহে যে যন্ত্রণা ভোগ করে, তার ফলে সে চিরকালের মত ঐ কুস্বভাব ত্যাগ করেছিল এবং সেদিন থেকে সে সর্বদা ভজন গেয়ে সময় কাটাতো!

'সাই-সৎচরিত' গ্রন্থে একটি পাঞ্জাবী বালকের কথা আছে। বালকটি স্বপ্ন দেখে যে শিরডি সাইবাবা তাকে শিরডি যেতে আদেশ দিচ্ছেন। ছেলেটি এর

আগে কখনো শিরডিবাবার নাম শোনেনি বা শিরডি নামক স্থানটি যে কোথায় তাও তার জানা ছিল না। ভাগ্যক্রমে, এক দোকানে সে শিরডিবাবার ছবি দেখতে পায় এবং পথে অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ অবধি শিরডি এসে পৌছায়।

অবিকল এই ধরনের অনেক ঘটনা সত্য সাইবাবার ক্ষেত্রেও হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কোন কলেজের এক অধ্যক্ষের ছেলে মারাত্মক ধরনের হৃদ্‌রোগে ভুগছিল। একদিন অধ্যক্ষ ছেলের এক স্বপ্নের কথা শুনে খুব অবাক হলেন। ছেলেটি স্বপ্ন দেখেছে সে পুট্টাপর্তী নামে একটি জায়গায় গেলে তার অসুখ নাকি ভাল হয়ে যাবে! পুট্টাপর্তী কোথায় জানবার জন্ত ভদ্রলোক খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেন, সব এলাকার ট্রেনের টাইম টেবিল ঘাঁটলেন, এক কপি পোস্ট-অফিস ডাইরেকটরী আনালেন এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে পুট্টাপর্তী নামে সত্যই একটি স্থান আছে। আরো খোঁজ করার পর খুব মূল্যবান একটি সংবাদ পেলেন যে পুট্টাপর্তীতে শ্রীসত্য সাইবাবা নামে একজন মহাপুরুষ বাস করেন এবং তিনি নাকি সবরকম রোগ অলৌকিক উপায়ে সারাতে পারেন।

বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক ঋষি ত্যাগরাজের একজন পরম ভক্তকে বাবা কি ভাবে তাঁর কাছে ডেকে এনেছিলেন, সে এক সুন্দর কাহিনী। ১৯৫১ সালে ভেঙ্কটগিরির রাজা এই মহিলা ভক্তের কাছ থেকে এক চিঠি পেয়ে খুব আশ্চর্য হলেন। মহিলাটি লিখছেন, "শ্রীত্যাগরাজ আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন। তিনি আমাকে ভেঙ্কটগিরি যেতে আদেশ দিয়ে বললেন যে পৃথিবীতে ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমানে ইনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করছেন এবং শীঘ্রই ভেঙ্কটগিরিতে আসছেন। আমি যেন তাঁর কৃপালাভ করবার জন্ত ভেঙ্কটগিরি যাই। তিনি আরো বললেন এই নররূপী ভগবান, শ্রীসত্যসাই নাম গ্রহণ করেছেন। আপনি বিস্তারিত জানাবেন। আপনার কাছ থেকে খবর পেলেই আমি ভেঙ্কটগিরি যাত্রা করবো।" স্বপ্নের আদেশমত ভদ্রমহিলা ভেঙ্কটগিরিতে যেদিন বাবার দর্শন পান সেদিন জন্মাষ্টমী ছিল। ত্যাগরাজের সেই মহিলা ভক্তকে বাবা অপার করুণা প্রদর্শন করেন। বাবা ঐ মহিলাকে তাঁর দিব্য উপস্থিতিতে ত্যাগরাজের ভজন দুঘণ্টা গাইবার দুর্লভ সুযোগ প্রদান করেন। মহিলাটি বাবার কাছে আরও অনেক করুণা পেয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের একটি মূর্তি সৃষ্টি করে বাবা মহিলাকে দেন। এই মূর্তি গ্রহণ করার পর মহিলা ভক্তটি ২৪ ঘণ্টা জ্ঞানহারা হয়ে আনন্দসাগরে ডুবেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রামনাম জপ করেছেন এবং এই নাম মুখে নিয়েই তিনি অমরধামে গমন করেন।

এইভাবেই শত শত ব্যক্তি কোন এক দুর্নিবার অলৌকিক নির্দেশ লাভ করে পুট্টাপর্তী ছুটে আসেন। সুকুমার মেনন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন টেলিফোনে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। বাবা টেলিফোনে ভদ্রলোককে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন। আশ্চর্যের কথা, অনুসন্ধান করে পরে জানা গিয়েছিল যে এই টেলিফোন কল কোন জায়গা থেকে বুক করা হয়নি এবং কোন এক্সচেঞ্জের মধ্যে দিয়েও আসেনি, তবুও মেননের ঘরে টেলিফোন বেজেছিল এবং তিনি বাবার কণ্ঠস্বরও শুনেছিলেন। আর বাবা তখন বাঙ্গালোরে এক গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। সুকুমার মেনন এই রহস্যপূর্ণ টেলিফোনের ব্যাপার এবং বাবার সঙ্গে টেলিফোনে কি কথা হয়েছিল এসব জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। পরে বাবাকে এই ঘটনা জানানো হলে তিনি বলেন, "মেনন লিখেছে বলে তোমরা আজ এই ঘটনা জানতে পারছো। কিন্তু মনে রেখো, করুণাবর্ষণের জন্য আমাকে যত কাজ করতে হয় এটি তার এক কণা অংশমাত্র।"

শিরডি সাইবাবার জীবনের আর একটি দিক প্রকাশ করতে গিয়ে 'সাই-সৎচরিতে' যেসব ঘটনার কথা লেখা হয়েছে তার সাথে পুট্টাপর্তীতে বর্তমানে যেসব ঘটনা ঘটছে তার মিল দেখে মনে হয় এখনকার ঘটনাগুলিই যেন ঐ বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'সাই-সৎচরিতে' আছে, 'তিনি ইচ্ছা না করলে ভক্তরা তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারতো না। স্বেচ্ছায় কেউ সেখানে যেতে পারতো না। তাঁর ইচ্ছা না হলে কেউ সেখানে বেশীক্ষণ অবস্থানও করতে পারতো না এবং বাবার অনুমতি না পেলে কেউ সেস্থান ত্যাগও করতে পারতো না।'

একবার বুক্কাপট্নম্ থেকে বিভিন্ন জায়গার দর্শনার্থীদের নিয়ে গোরুর গাড়ীর এক লম্বা মিছিলকে পুট্টাপর্তী অভিমুখে আসতে দেখে বাবা উৎফুল্ল হয়ে গান গেয়ে ওঠেন "এসেছে, এসেছে। বাবার যাত্রীদল এসেছে।" লেখক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "পুট্টাপর্তীতে যারা আসে, তারা বাড়ী

ফিরে গিয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এবং আরো পাঁচজনকে বলে বলেই যাত্রীসংখ্যা এইভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।" বাবা সঙ্গে সঙ্গে লেখকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন, "কখনই না। আমি না ডাকলে আমার কাছে কেউ আসতে পারে না। একশো লোকও যদি জোর করে তাকে ধরে আনার চেষ্টা করে তবুও না।" যারা পুট্টাপর্ত্তী এসেছে তাদের প্রত্যেকেই পুট্টাপর্ত্তী থেকে বিদায় নেবার সময় প্রার্থনা জানায়, "আবার যাতে তোমার কাছে আসতে পারি তার জন্ম তোমার কৃপা চাই বাবা।" ভক্তরা ভাল করেই জানে যে বাবার ইচ্ছা না হলে, কেউ এই তীর্থক্ষেত্রে আসতে পারে না। বাবা যদি বলেন 'থেকে যাও' তখন তাদের থেকে যেতে হয়, তাদের 'অফিসের ছুটি' মঞ্জুর হোক বা না হোক। বাবা যখন বলেন 'বাড়ী যাও' তখন শত অনিচ্ছাসত্বেও তাদের বাড়ী যেতে হয়। কারণ বাবার আদেশ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে পালন করে তারা বাড়ী পৌছে দেখে, কোন ভীষণ জরুরী কাজ তাদের জন্ম হয়তো অপেক্ষা করছে।

সত্য সাইবাবার ভক্তরা বাবার অভয়বাণী শুনেছে—

"আমি থাকতে তোমার কিসের ভয় ?"

"আমার ওপর নির্ভর করলে আমিও তোমাকে দেখবো।"

"আমাকে দর্শন করামাত্র তোমার সব অপরাধ স্খালন হয়ে যাবে।"

"আমি তোমার সব বোঝা বহন করবো।"

"আমার কাছ থেকে যত পার আনন্দ নিয়ে যাও, আর তোমার সব দুঃখ আমার কাছে ফেলে যাও।"

শিরডি সাইবাবাও অবিকল এরূপ কথা বলে বহু ভাগ্যবানকে আশ্বাস দিয়েছেন। 'সাই-সৎচরিত' গ্রন্থে আছে—

"আমি পূজার জন্ম কোন উপচার চাই না—তা সে অষ্টোপচারই হোক বা ষোড়শোপচারই হোক। যেখানে পূর্ণ ভক্তি আছে—আমি সেখানেই আসন পাতি।"

"আমার ভাণ্ডার সর্বদা পূর্ণ। তা উপচে পড়ছে। আমি চাই তোমরা গাড়ী বোঝাই করে এই ঐশ্বর্য নিয়ে যাও। এ সুযোগ আর ফিরে আসবে না।"

"জোর জবরদস্তি করে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয় এবং অপরের মতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করাও উচিত নয়।"

"আমার ভক্তের কোন অনিষ্ট হবে না। নাস্তিক, অধার্মিক এবং খারাপ লোকের সংস্রব এড়িয়ে চলবে। সকলের প্রতি বিনয়ী এবং নম্র হবে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমাকে দেখার চেষ্টা করবে।"

"এই বিশ্বের দৃশ্যমান যাবতীয় চর, অচর, কীট, পতঙ্গ সব আমারই দেহ, আমারই আকার।"

"আমার ভাণ্ডার সব সময় পূর্ণ। যে যা চাইবে, আমি তাকে তাই দিতে পারি। তবে সে আমার দান গ্রহণ করার যোগ্য কিনা তা আমাকে দেখতে হবে।"

"তোমার সব মন প্রাণ আমায় ঢেলে দাও। আমিও তোমাকে সেই ভাবে দেখবো।"

"আমাকে জানতে হলে ধ্যান করা দরকার। অবিরত ধ্যানে তোমার চিত্তরঙ্গ স্থির হবে।"

"তৃষ্ণার্তকে জল দাও, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও। দিতে ইচ্ছা করলেই দিয়ো, ইচ্ছে না করলে দিয়ো না। তাই বলে এদের ওপর কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠো না।"

"কোথাও প্রবেশের জন্য আমার কোন দরজার প্রয়োজন হয় না। আমি সর্বত্র বাস করি।"

"খালি পেটে ভগবৎ সাধনা হয় না।"

"অহংকার, গর্ব বিসর্জন দিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো। তোমার হৃদয়ের মধ্যেই আমি আছি।"

'সাই-সৎচরিত' গ্রন্থে আছে শিরডি সাইবাবা এক ভক্তকে ঠিকুজি, কোষ্ঠী, গণক, জ্যোতিষী এদের ওপর অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করতে বলেছিলেন, কারণ এতে মানুষের মন দুর্বল হয়।

সত্য সাইবাবাও অনুরূপ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। হায়দ্রাবাদের এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছিলো যে বাবা তাকে হাত দেখাতে বলেন এবং একটি ধারালো ছুরি দিয়ে হাতের ওপর এক রেখা কাটেন। পরের দিন সকালে তার হাতে নতুন ভাগ্যরেখা অঙ্কিত দেখে সে যেমন ভয়ও পেলো আবার আনন্দিতও হ'লো।

যিনি করতলে নতুন রেখা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন তাঁর কাছে করকোষ্ঠী গণনার কি মূল্য? যিনি গ্রহকে বদলে দেবার শক্তি রাখেন তাঁর কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রের কি দাম? তাই এইসব অবতার পুরুষরা—যাঁরা নিজেরাই ভাগ্যাধিপতি এবং ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁরা যখন এই ধরনের ভাগ্যবিচারের ওপর মানুষের আস্থা স্থাপনকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন, তখন এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

'সাই-সৎচরিত' গ্রন্থে আবার ফিরে আসা যাক। "তাঁর কাছে আসার জন্যে বা কোন পুণ্যদিবস পালনের জন্য বা তীর্থযাত্রার জন্য কেউ টাকা ধার করে দেনাগ্রস্ত হোক, বাবা একেবারেই তা পছন্দ করতেন না।"

"বাবা আগে থেকেই ভক্তদের বিপদাপদের আভাস পেতেন এবং বিপদের সময় তাদের রক্ষা করতেন।"

"বাবা তাঁর বিভিন্ন ভক্তদের মনের ইচ্ছাকে সম্মান দিতেন এবং যার যে ভাবে তাঁকে পূজো করতে ভাল লাগে সেই ভাবেই পূজো করার অনুমতি দিতেন।"

"বাবা নিরতিশয় ক্ষমাপরায়ণ ছিলেন, কখনও বিরক্ত হতেন না। তিনি ছিলেন সরল, কোমল, সহিষ্ণু এবং সদা সন্তুষ্ট—যার কোন তুলনা মেলা ভার।"

"ভক্তদের মনের সব কথা তিনি জানতেন এবং বুঝতেন।"

"তিনি ভক্তদের কুচিন্তাকে দমন করাতেন এবং সৎচিন্তায় উৎসাহ দিতেন।"

শ্রীসত্য সাইবাবাও অবিকল একই কথা বলেছেন।

ভগবান রমণ মহর্ষির তপস্বী সঙ্গী স্বামী অমৃতানন্দ স্বীকার করেছেন যে, তাঁর জানা যে কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা যোগাবিদ্যায় শ্রীসত্য সাইবাবার জ্ঞান অনেক বেশী। সত্য সাইবাবার জন্মগ্রহণের বহু পূর্বে স্বামী অমৃতানন্দ যে ভ্রান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে যোগাভ্যাস করতেন, সাইবাবা সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'সাই-সৎচরিতে' লেখা আছে—"শিরডির সাইবাবা যাবতীয় যৌগিক পদ্ধতি উত্তমরূপে জানেন।"

অনেক উৎসাহী যুবক বইএর সাহায্যে যোগসাধনার চেষ্টা করে। এইরকম এক ফরাসী যুবককে সত্য সাইবাবা হাতে-কলমে যোগসাধনা শিখিয়েছিলেন। সঠিকভাবে যোগচর্চা না করার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বহু ব্যক্তি বাবার কাছে চিকিৎসা এবং সংশোধনের জন্য আসে।

'সাই-সৎচরিতে'র নিম্নের কথাগুলি বর্তমান সাইবাবা সম্বন্ধেও ভালভাবে বলা চলে। "তাঁর কাছে সব কর্তব্যই সমান। সম্মান বা অসম্মান দুই-ই তাঁর কাছে এক।"

প্রশান্তি-নিলয়মের সামান্যতম কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপরও বাবার তীক্ষ্ণ নজর আছে। তিনি মেঝের ওপর বসেন, মাদুরে শয়ন রেকন, রোদ বা বৃষ্টির ভেতর হাঁটতে দ্বিধা করেন না, হিমালয়ে বরফের ওপর নগ্নপদে হাঁটেন, দীর্ঘ ভ্রমণে যাবার সময়, অল্প জায়গায় ঠাসাঠাসি করে বসার অসুবিধা হলেও, তাঁর গাড়ীতে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করতে তিনি ভক্তদের ডেকে ডেকে তোলেন এবং আহার বা পানীয় ছাড়াই দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেন। আমাদের দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তি যা খায়, বাবাও সেই রকম খাদ্য গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "আমি চাই না আমার জন্য কারো অসুবিধা হয় বা বেশী খরচ হয়।"

শিরডি সাইবাবা সম্বন্ধে 'সাই-সৎচরিত' লিখছে—"বাবা অন্যের মনের কথা জানতে পারতেন, যেন কোন বেতার-সংকেত পেয়েছেন।"

"বাবা তাঁর স্পর্শ দ্বারা বিচিসমেত খেজুরকে বিচিহীন এক ধরনের খেজুরে পরিবর্তিত করেছিলেন।"

"বাবা তাঁর ভক্তদের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় বিষয়েই নির্দেশ দিতেন।"

"বাবা, জাতিতে জাতিতে বা মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ দেখতে পেতেন না।"

"যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন ক'রতো বাবা তাদের সর্বদা স্নেহ করতেন এবং উৎসাহ দিতেন।"

"বাবা কুৎসা প্রচার ঘৃণা ক'রতেন এবং বলতেন—বিষ্ঠা ভক্ষণ করা এবং কুৎসা প্রচার করা এক ব্যাপার।"

"শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পান সেটা যাতে তার মনঃপূত হয় এবং এই অর্থ দিতে অযথা বিলম্ব না করা হয়—এ বিষয়ে বাবা খুব জোর দিতেন।"

সত্য সাইবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার, তাঁর কথা শোনার এবং তাঁকে

অনুসরণ করবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের কাছে ওপরের প্রত্যেকটি উক্তি স্বয়ং সত্য সাইবাবার কথা, উপদেশ এবং মনোভাব বলে মনে হবে।

১৯৫৮ সালে, আদালত কর্তৃক গঠিত এক কমিশন, বাবার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে, বাবা তাঁর পূর্বদেহে অবস্থান কালে অনুরূপ এক ঘটনার উল্লেখ করেন এবং পূর্বদেহে তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন বর্তমানে সেই একই উত্তর কমিশনকে দেন। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, "আমি যে কোন নামে সাড়া দিই।" বাবা বলেছিলেন যে জগতের সব কিছুরই মালিক তিনি এবং তাঁর বাসস্থান জগতের সর্বত্র। এই ধরনের উত্তর শুনে আইন-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁকে "দুর্বোধ্য" বলে বর্ণনা করেছিলেন, যদিও অধ্যাত্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে একথা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ছিল। ঐ নির্ভুল উক্তি ঈশ্বরের অবতার ছাড়া আর কারুর মুখনিঃসৃত হ'তে পারে না।

প্রকৃত সত্য হ'লো শিরডি সাইবাবাই আবার এসেছেন! সত্য সাইবাবা একবার বলেছিলেন যে এই দেহ পর্তীতে জন্মগ্রহণ ক'রেছে এবং পূর্বদেহ পত্রিতে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল। পূর্ব-জন্মের মত এই জন্মেও একজন মুসলমান তাঁকে পুত্র-স্নেহে ভালবাসতেন। এই জন্মেও তিনি বাল্যকালে, উরভকোণ্ডায় হারিয়ে যাওয়া ঘোড়ার সন্ধান দিয়ে লোকের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকর্ষণ ক'রেছেন। বর্তমান অবতারের মধ্যেও সবার চোখে পড়বে সেই একই প্রকার বৈশিষ্ট্য—স্নেহময়ী জননীর উৎকণ্ঠা, ব্যাখ্যার সরলতা, জ্ঞানের গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গীর সর্বজনীনতা, বিশ্বজয়ী প্রেম, সর্বব্যাপকতা এবং সর্বশক্তিমত্তা।

সত্য সাইবাবা বহুবার বলেছেন যে তিনি শিরডিতে ভাবসমাধিগ্রস্ত অবস্থায় গমন ক'রেছেন। ১৯৫০ সালে পূর্ণিমা উৎসবের দিন, পুট্টাপর্তীতে একবার মাদ্রাজের এক যুবকের সাথে বাবা মধ্যাহ্ন ভোজন ক'রছিলেন। যে মহিলার ওপর পরিবেশনের দায়িত্ব ছিল, তিনি জানতেন না যে ঐ দিনটি সাই ভক্তদের কাছে একটি পবিত্র দিন। হঠাৎ বাবার ভাব-সমাধি হ'লো এবং এই অবস্থায় বাবা আদেশ দিলেন, "একে চাপাটি দাও", "ক্ষীর দাও।" তিনি আরো অনেক অপরিচিত মিষ্টি ও খাদ্যের নাম ব'লে গেলেন। সমাধি ভঙ্গ হ'লে, মহিলাটি অপ্রস্তুত হ'য়ে বাবাকে বললেন, "আমি যে সব খাবারের নাম কখনো

শুনিনি আর রান্নাও করিনি সেগুলি যদি আমাকে পরিবেশন ক'রতে বলেন তবে আমি সেসব খাবার কি ক'রে যোগাড় করি?" বাবা মহিলাটির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বললেন কি ক'রে তিনি শিরডি গিয়েছিলেন এবং যেসব খাবারের নাম ক'রেছেন ওগুলো মারাঠী খাবার। এরপর বাবা চাপাটি এবং মারাঠী মিষ্টি স্বয়ং সৃষ্টি ক'রলেন এবং যুবকটিকে খেতে দিলেন।

১৫ বছর বয়সে, অবতারত্ব ঘোষণার পর, বাবা যখন পুট্টাপর্তী আসেন, সেই সময় সবাইকে তিনি একটি ফল দেখিয়েছিলেন যে ফল এর পূর্বে কেউ দেখেনি বা খায়নি। বাবার পিসিমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এটা কি ফল?" বাবা বলেছিলেন এই ফল শিরডি থেকে আনা হয়েছে এবং সন্ধ্যাবেলা ফলটি কেটে সবাইকে ভাগ ক'রে খাওয়াবেন। পিসিমা আব্দার ক'রে বললেন সবাইকে একটি ক'রে গোটা ফল দিতে হবে—নইলে তৃপ্তি ক'রে খাওয়াই যাবে না। বাবা ঢাকনা সমেত একটি বড় ঝুড়ি চাইলেন। ঝুড়িতে একবার টোকা দিতেই ঝুড়িটি ফলে ভরে গেল। সন্ধ্যাবেলা একশোর বেশী লোক হ'য়েছিল, তবুও পিসীমার সন্দেহ হ'লো হয়তো প্রত্যেকের ভাগ্যে একটা ক'রেই জুটবে না কারণ ঝুড়িতে মাত্র ৩০টি কি ৪০টি ধরে। তিনি বাবাকে এ কথা জানালেন। এর পরই অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। ভজনের পরে সেই একই ঝুড়ি থেকে বাবা উপস্থিত প্রত্যেকের হাতে একটি করে ফল দিলেন এবং বলাবাহুল্য এই অপরিচিত ফলের স্বাদ খুবই মিষ্টি ছিল।

বাবার পিসিমা আর একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বলেছেন। ওঁদের পরিবারের অনেকে বাবার অবতারত্ব ঘোষণাকে অলীক কাহিনী বলে মনে ক'রতো, কারণ এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না—এই ব্যাখ্যাই এদের কাছে সর্বাপেক্ষা সহজ বলে মনে হ'য়েছিল। এই মহিলাও এই ধারণা ত্যাগ ক'রতে পারছিলেন না তাই তিনি বাবাকে সমানে অনুরোধ ক'রছিলেন, বাবা যেন কৃপা করে এমন কিছু তাঁকে দেখান যা তাঁর হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করে। মহিলাটি খুব সরলমনা ছিলেন এবং জীবনে অনেক দুঃখকষ্টও পেয়েছেন বলে বাবা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। বাবা তাঁকে জানালেন, "আজ সন্ধ্যার সময়ে আমি তোমাকে আমার পূর্বরূপ দেখাবো।" মহিলাটি সরলভাবে স্বীকার ক'রেছেন যে এই কথা শোনার পর

আনন্দে তিনি প্রার্থনা ক'রতে লাগলেন ভগবান যেন একটিবারের জন্যও সেই দিনটিকে ছোট ক'রে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নিয়ে আসেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে বাবা হাত দিয়ে মহিলাটির চোখ বন্ধ ক'রে অনেক ঘর পেরিয়ে, ভেতরের একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌছে তিনি মহিলাটির চোখ থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন এবং ঘরের একটি কোণা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সেদিকে তাকাতে ব'ললেন। মহিলাটি বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন সেই কোণে শিরডি সাইবাবা ব'সে আছেন তাঁর সেই বিখ্যাত ভঙ্গীতে —ডান পা ভাঁজ করে বাঁ পায়ের ওপরে তোলা, বাঁ পা সামনে একটু বাড়ানো। সামনে ধূপকাঠি জ্বলছে, তার ধোঁয়া ওপরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দেহ এক অদ্ভুত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত আর সুমিষ্ট সৌরভে কক্ষের বাতাস আমোদিত। ২/১ মিনিট পরে বাবা বললেন, "দেখা হয়েছে?" মহিলাটির মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারিত হ'লো, "কি অপরূপ।" এরপর তাঁর চোখ আবার হাত দিয়ে চেপে ধরে বাবা তাঁকে বাইরের ঘরে নিয়ে এলেন।

বাবা প্রায়ই বলেন যে, শিরডি সাইবাবা আর তিনি যে এক এবং অভিন্ন এ নিয়ে বাদানুবাদ করা অর্থহীন এবং নিষ্প্রয়োজন। যেমন একই সন্দেশ বা মিষ্টির যদি দু'রকম আকৃতি হয়, একটি চৌকো আর একটি গোল—দু'রকম রং হয়, হলদে আর লাল, আর কেউ যদি কোনটিই মুখে না দেয়, তবে সে কি ক'রে বলবে যে দুটো সন্দেশই একই জিনিসে তৈরী এবং একই রকম তার আস্বাদ? স্বাদ গ্রহণ ক'রতে হবে, অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রতে হবে, একমাত্র এই পথেই শিরডি সাইবাবা ও সত্য সাইবাবার অভিন্নতা হৃদয়ে ধারণা করা যাবে। এইটিই হ'লো মূল কথা।

বর্ষার মেঘ

সাধারণ সভায় বাবার ভাষণ শোনবার সৌভাগ্য যারা লাভ ক'রেছেন তারা চিরকাল সেই রোমাঞ্চকর এবং প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতার সুমধুর স্মৃতি তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সযতনে তুলে রাখবেন। এই স্মৃতির ঔজ্জ্বল্য কোনদিন ম্লান হবে না। বাবা সাধারণত তেলেগুতে ভাষণ দেন, যদিও ভক্তদের সঙ্গে তামিল, কানাড়া, হিন্দী, সিন্ধি, ইংরাজী ইত্যাদি নানা ভাষায় কথা বলেন। তিনি সর্বজ্ঞ, তাই যে কোন ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে পারেন। সহজ সরল ভাষায় এবং অত্যন্ত সাবলীলভাবে ভাষণ দেন। দেশের মানুষের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানারকম ছোট ছোট উপাখ্যান, উদাহরণ, প্রবাদবাক্য মিশিয়ে তিনি তাঁর ভাষণ এমন হৃদয়গ্রাহী ক'রে পরিবেশন করেন যে শ্রোতাদের অন্তরে তা গভীর ভাবে মুদ্রিত হ'য়ে যায়।

তাঁর ভাষণকে বক্তৃতা বললে বাবা আপত্তি করেন। কারণ—এই ভাষণে কোন পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। শ্রোতাদের মাথার ওপর নির্বিচার বর্ষণ বা জনতার মন যুগিয়ে কথা বলে তাদের কাছ থেকে সস্তা হাততালি কুড়োনো এর উদ্দেশ্য নয়। বাবা তাঁর ভাষণকে "সম্ভাষণ" বা কথোপকথন বলা পছন্দ করেন। বাবা যেভাবে প্রতিটি ব্যক্তিগত সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেন এবং প্রতি ব্যক্তির সন্দেহ নিবারণ করেন, সেই দিক দিয়ে বিচার করলে এই নামকরণ খুবই সার্থক। তাঁর ভাষণ শুনলে সব সময়েই মনে হয় তিনি যেন একটিমাত্র ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন। ২/১ মিনিটের মধ্যেই বাবা শ্রোতাকে এমনভাবে আকর্ষণ ক'রে একটি বিন্দুতে তার মনকে টেনে আনবেন যে, শ্রোতার খেয়ালই থাকবে না যে সে হাজার লোকের মাঝখানে বসে আছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে শুনে চলেছে বাবার কথা। বাবা হয়তো বলছেন অশান্তির কারণ কি এবং এই রোগ দূর করতে গেলে কি চিকিৎসার প্রয়োজন—শ্রোতাও বাবাকে ততক্ষণে ভালবেসে ফেলেছে এবং নিশ্চিন্ত মনে বাবার হাতে নিজেকে সমর্পণ

ক'রে দিয়েছে তাঁর চিকিৎসায় থেকে মনে শান্তি পাবার জন্যে। যে সুন্দর কান্তি দর্শনে তৃষ্ণার শান্তি হয়, যে কণ্ঠস্বর শ্রবণে হৃদয় জুড়িয়ে যায়, যে স্বর্গীয় হাসিতে আলোর ঝর্না ঝরে পড়ে এবং যে লীলায়িত ভঙ্গিমা বক্তব্যকে করে প্রাঞ্জল—শ্রোতার মনে হবে এ সব যেন তার অতি আপনার ধন। তাঁর আন্তরিক উপদেশ, তাঁর প্রেমের আহ্বান শ্রোতার হৃদয়কে এমনভাবে দোলা দেবে যে, বাবার ভাষণ সমাপ্ত হবার আগেই সে তার সম্পূর্ণ সত্তা নিজের অগোচরে বাবার কাছে সমর্পণ ক'রে বসে থাকবে। বাবা একজন সাধারণ বক্তা বা ধর্মপ্রচারক বা শিক্ষক নন। তিনি হলেন গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণে দগ্ধ, প্রখর তপন তাপে শুষ্ক হৃদয়ে, তাপহরা, তৃষ্ণাহরা, 'নিখিল-চিত্ত-হরষা প্রথম বরষার শ্যামল-সুন্দর মেঘ। তিনি এসেছেন, দিকে দিকে জেগে ওঠা অশ্রুভরা বেদনাকে নব ধারাজলে স্নান করিয়ে, ব্যথিত হৃদয়ে আনন্দের ফসল ফলাতে। তিনি হলেন তৃষ্ণার শান্তি। তিনি হলেন এই নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।

বাবা বালক বয়সেই ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর ৩২ বছর বয়স থেকে তিনি সদুপদেশ এবং ধর্মশিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করবেন। তার আগে মাঝে মাঝে, প্রশান্তি-নিলয়মে বা চিত্রাবতীর বালুচরে ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে তিনি তাদের ধর্মোপদেশ দিতেন। কয়েকবার তিনি বুক্কাপট্টনামে সত্য সাইবাবা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ দিয়েছেন। নিলয়মে বা চিত্রাবতীর বালুচরে ধর্মালোচনা সাধারণত এইভাবে হতো—প্রথমে কোন ভক্ত সামাজিক আচরণ বা আধ্যাত্মিক সাধনার ওপর কোন প্রশ্ন করতেন এবং বাবা মূল প্রশ্নের সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করতেন। একবার পরলোক সম্পর্কে এক প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে দেহমুক্ত আত্মার অভিযান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৃতদেহ সৎকার-প্রথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, প্রেতাত্মার অস্তিত্ব, মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ, এবং পিতামহের নামানুসারে পৌত্রের নামকরণ-প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে বাবা এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সাধারণ কথাবার্তা বলার সময় ঘরোয়া ভাবেও এই ধরনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। আত্মবিশ্বাসকে মজবুত করলে তবেই হবে বীর্যের প্রকাশ—বাবা এই শক্তি ভক্তদের মনে সঞ্চার করতে সর্বদা আগ্রহী। তিনি একজন মহান শিক্ষাগুরু।

একবার হর্সলি হিলে বাবার সঙ্গে এক সপ্তাহ থাকবার সৌভাগ্য কয়েকজন ভক্তের হয়েছিল। প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় বাবা এদের নিয়ে বসতেন এবং যোগসাধনার ওপর বিভিন্ন প্রশ্নের সহজ মীমাংসা ক'রে দিতেন। তিনি উপস্থিত প্রত্যেককে তাঁর কাছে খোলাখুলিভাবে মনের কথা প্রকাশ করার জন্য বলতেন, এবং তারা কোন পদ্ধতিতে যোগসাধনা করছে, যোগ সম্বন্ধে তাদের ধারণা এবং আদর্শ কি, ঈশ্বরের কোন রূপ এবং নাম তাদের ভাল লাগে, তাদের চরিত্র গঠনে কোন ধর্মগ্রন্থ সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, পরমাত্মা সম্বন্ধে কি চিত্র তারা মনে অঙ্কিত করেছে এবং যোগসাধনা ক'রে তারা কোন লক্ষ্যে পৌছতে চায় ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসায় আগ্রহসহকারে সাহায্য করতেন। প্রতি হৃদয়ের অন্ধকার গুহা তিনি জ্ঞানের আলোয় প্লাবিত ক'রে দিতেন। একাজ তিনি ক'রে আসছেন তাঁর শৈশব থেকে। তাঁর পিতামহ, কোণ্ডাম্মা রাজু এই কারণেই ছোট বেলায় তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ছোট্ট গুরু'। ১৯৫০ সালে পরলোকগমনের মাত্র কয়েকদিন আগেও তিনি বাবার ধর্মালোচনা শুনেছিলেন এবং তখন গর্বে ও আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠেছিল।

স্কুলজীবনে বাবা খেলার সঙ্গীদের বিড়ি সিগারেট খেতে নিষেধ করতেন। অত্যধিক মসলাযুক্ত খাবার বা বাসি খাবার তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। বন্ধুদের সাবধান ক'রে বলতেন তারা যেন সিনেমা না দেখে। তিনি সবাইকে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে, বিভূতি ব্যবহার করতে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকার অভ্যাস গঠন করতে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

স্কুলজীবনে, কমলাপুরমে থাকার সময় তিনি অনেক গান রচনা করেছিলেন। এগুলির বিষয় ছিল, মদ্যপানের ভয়াবহ কুফল, নিরক্ষরতার মারাত্মক পরিণতি, অস্পৃশ্যদের চরম দুরবস্থা, এবং গ্রাম্য কলহের শোচনীয় ফল ইত্যাদি। তিনি একটি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন যার নাম দিয়েছিলেন 'দিনবদল'। জনসাধারণের মন ভোলানোর জন্য ক্ষমতালোভীরা যে সব চাতুরীর সাহায্য নেয়, লোকসঙ্গীতের সুরে রচিত গানের মাধ্যমে তিনি এই নাটকে তা প্রদর্শন করেন। এই নাটকে এক মহাকবির চরিত্রও আছে যিনি সত্যদ্রষ্টা ছিলেন এবং অত্যন্ত দুরবস্থায় দিন কাটাতেন। তাঁর সাবধান বাণীতে কেউ কর্ণপাত করতো না, গরীব বলে সবার কাছে তিনি ছিলেন অবহেলিত এবং নিগৃহীত। শুধু

এক দরিদ্র চাষী এই মহাকবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই নিদারুণ অবস্থার পরিণতিতে মহাকবির সন্তানরা নিঃস্ব, অসহায় হয়ে পড়লো। গ্রামের কিছু নিষ্কর্মা, গুণ্ডাপ্রকৃতির ছেলের দল পিতা কর্তৃক সত্যের বাণী প্রচারের অপরাধে, আক্রোশবশত তার পুত্রদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাতে লাগলো। অবশেষে দিন বদলালো। ছেলেরা সংগ্রামে জয়ী হয়ে ক্ষমতা অধিকার করলো। দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে তারা স্বর্ণযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলো। মহাকবির অমরগাথা লোকেরা আবার তাদের কণ্ঠে তুলে নিল এবং তাঁর মহান আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হলো।

গ্রামের অভিনেতারা নাটকে তাদের ভূমিকার সংলাপ লিখে দেবার জন্যে বাবার কাছে প্রার্থনা জানাতো। বাবা স্বয়ং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলে, নিজের সংলাপ নিজেই রচনা করতেন এবং স্বরচিত গান গাইতেন। উচ্চস্তরের নৈতিক ভাবে ভরা এইসব রচনার উন্নত ধরনের শৈলী, শব্দনির্বাচনের দক্ষতা, এবং আবেদনের গভীরতা নাটকের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা এই অংশকে অধিক চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতো।

বাবার ভূমিকা প্রধানতঃ শিক্ষাগুরুর ভূমিকা। তিনি একবার ঘোষণা করেছিলেন, "আমি এমন কোনও কথা বলি না যার কোন গভীর অর্থ নেই। আমি এমন কোনও কাজ করি না পরিণামে যার কল্যাণ হবে না।" তাঁর সাধারণ কথাবার্তাও মনোজ্ঞ উপদেশে পূর্ণ। একবার এক মহিলা তাঁর শিশুর কান্না কিছুতেই থামাতে পারছিলেন না দেখে বাবা বললেন "কি কাণ্ড! তোমার কোলে বসে থেকেও ও 'মা' 'মা' বলে কাঁদছে, অথচ এই বোধ ওর এখনও হয়নি যে, যার জন্য সে কাঁদছে সেই মা-ই ওকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এখানেও সবাই তাই করছে। এদের এই বোধ নেই যে ভগবানই এদের মা, তাঁর কোলেই এরা রয়েছে, তবুও মিছিমিছি 'মা' 'মা' বলে কান্নাকাটি করছে।"

একবার এক সভায় ছাপানো প্রোগ্রামে "স্বাগত ভাষণ" লেখা দেখে বাবা বললেন "আমি তোমাদের হৃদয়ের মধ্যেই আছি। তাই আমাকে আলাদা ক'রে অভ্যর্থনা জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাছে অভ্যর্থনা পেলে তবেই আমি আসবো আর না পেলে চলে যাবো, এ ধারণা ঠিক নয়।" সবসময়ের জন্য তিনি সদ্‌গুরু, সদ্বান্ধব, দার্শনিক এবং উপদেষ্টা। যারা তাঁর

কাছে আত্মসমর্পণ করে বা যাদের তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে শিক্ষাদানের জন্য বেছে নেন, অসীম ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে, তিনি তাদের চরিত্র ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলেন।

প্রশান্তি-নিলয়মে বা অন্য কোথাও, গীতা, রামায়ণ, ভাগবত বা উপনিষদ পাঠের সময়, বাবা কিছুক্ষণ শ্রোতাদের একভাবে লক্ষ্য করেন এবং যখন টের পান যে শ্রোতারা কোন এক সূত্র ঠিকমত বুঝতে পারছেন না, তখন সেই শব্দ বা শ্লোকের সূত্রের ওপর তিনি তাঁর মনোগ্রাহী প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়, সূত্রের অস্পষ্টতা দূর করেন এবং জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সবরকম শ্রোতার মন আনন্দে ভরে ওঠে। এইভাবে তিনি এইসব পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বহু জটিলতার সহজ সমাধান করেছেন।

প্রশান্তি-নিলয়মে ভাষণ দেবার সময় বাবা প্রায়ই দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। একবার এক সাবধানবাণী উচ্চারণ ক'রে বললেন, "তোমরা এখন আর ছেলে মানুষ নও। তোমাদের প্রমোশন পেয়ে নিচু থেকে উঁচু ক্লাসে উঠতে হবে।" অত্যন্ত দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব তিনি ছোট ছোট গল্প, উপাখ্যান, প্রবাদ এবং রূপকের সাহায্যে জলের মত সহজ ক'রে বুঝিয়ে দেন। সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে একবার তিনি বললেন যে সৎসঙ্গ থেকে কি ভাবে ধীরে ধীরে মানুষের মনে নিঃসঙ্গের ভাব জন্মায়, অর্থাৎ সৎসঙ্গ থেকেই কিভাবে অনাসক্তি আসে।

একবার শিবরাত্রির উৎসবে বাবা বললেন, "মনের অধিপতি চন্দ্র। চন্দ্রই মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রতিমাসে পূর্ণিমার পর এই চাঁদ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে চতুর্দশীর দিন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। শিবরাত্রিতে তাই মানুষের লক্ষ্য হবে তার মনের খেয়ালী বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করা। এই রাত্রে সাধনায় উন্নতি লাভ করার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত যাতে তার মনের শুভশক্তি দ্বারা অশুভশক্তি পরাজিত হয়। মনের কুপ্রবৃত্তির ওপর শুদ্ধাত্মার জয় হয়। মহাদেবের চরণে এই রাত্রিকে এইভাবে উৎসর্গ করতে হয়।"

জুন মাসের শেষে উত্তরায়ণ শুরু হয়। এইদিন মানুষের বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী সূর্যদেবের, স্বর্গপথে দীর্ঘ ছ'মাস ব্যাপী উত্তরাভিমুখী যাত্রা শুরু হয়। এই উপলক্ষে বাবা বলেন, "স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটো। স্বয়ং সূর্যদেব উত্তর দিকে আত্মোপলব্ধির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ, কৈলাস পর্বতস্থিত শিবালয় অভিমুখে ধাবিত হচ্ছেন। এই সময় হলো আত্মিক উপলব্ধি ও সাধনার শ্রেষ্ঠ সময়।"

"গুরুপূর্ণিমা" উৎসবের দিনে বাবা ভক্ত ও সাধকদের স্মরণ করিয়ে বলেন গুরুকে শ্রদ্ধা করবে। কারণ তাঁরা প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি। কি কি অত্যাবশ্যক গুণ থাকলে গুরু হওয়া যায় বাবা তার বর্ণনা দেন। প্রকৃত গুরু এবং ভণ্ড গুরুর মধ্যে কিভাবে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে তাও তিনি এদের বলেন। বাবার প্রতিটি ভাষণ দিব্য সৌরভে সুরভিত এবং মৌলিকতায় অভিনব। এই ভাষণ শুনলে রোমাঞ্চিত হতে হয়, চমৎকৃত হতে হয় এবং সর্বোপরি আনন্দ-শিহরণ তো আছেই।

বাবা বলেন যে, ভাষণের মাধ্যমে তিনি ভোজ-উৎসবের আহার পরিবেশন করেন না—করেন রোগীর পথ্য পরিবেশন। তাই তিনি শ্রোতাদের আবেদন জানিয়ে বলেন, তারা যেন এই 'পথ্যের' এক কণাও অপচয় না করে, একদানা 'খাদ্য' অর্থাৎ ভাষণের একটি শব্দও যেন অবহেলা ভরে ছুঁড়ে না ফেলে। তিনি 'মহাবৈদ্য' রূপে এসেছেন ভবরোগ দূর করতে। বাবার প্রত্যেক ভাষণ আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল—একটি ভাষণ অপরটি থেকে তথ্য বা ভঙ্গীর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বলেন, "আমি 'লেকচার' দিই না—'মিক্সচার' দিই।" প্রত্যেকের জন্য তিনি একই 'প্রেসক্রিপসন' করেন না।

চিট্টুরে হাইস্কুলের ছাত্রদের বাবা বুঝিয়ে ব'ললেন, পরীক্ষার পড়া কিভাবে তৈরী ক'রতে হবে এবং পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র পাবার পর কিভাবে গুছিয়ে উত্তর লিখতে হবে। তিনি বললেন, "যে প্রশ্নগুলির উত্তর তুমি ভালোভাবে দিতে পারবে বলে মনে করো, আগে সেইসব প্রশ্নের পাশে দাগ দিয়ে দেবে। এগুলির উত্তর লেখার পর বাকি প্রশ্নগুলিতে হাত দেবে। এই নিয়ম মেনে চললে তোমার মন প্রফুল্ল হবে আর নিজের ওপর বিশ্বাস বাড়বে।" তিনি ছাত্রদের ক্লাসঘরের সমস্যা এবং ফুটবল খেলার মাঠের অভাব নিয়ে আন্তরিক আলোচনা ক'রলেন যে তা মনে রাখার মত।

পেনুকোণ্ডাতে জেলা ক্রীড়ানুষ্ঠানের পারিতোষিক বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব ক'রবার সময় বাবা বললেন যে, কোন প্রতিযোগিতায় যোগদানের ব্যাপারে বা জয়লাভের জন্য যেভাবে বর্তমানে স্কুলের বিরুদ্ধে ছাত্রকে ব্যবহার করা হয় তাতে প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।

প্রতিযোগিতায় কে বিজয়ী হ'লো বা কে পরাজিত হ'লো, বাবা বললেন যে,

সেটা একটা বড় ব্যাপার নয়, তার চাইতে, কিভাবে সেই সেই জয় বা পরাজয়কে গ্রহণ করা হ'লো সেইটাই আসল কথা।

মাদাকাশিরায় অনুরূপ এক অনুষ্ঠানে বাবা 'বহুমতি' শব্দটি নিয়ে খেলা ক'রলেন এবং দুই অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার ক'রলেন। 'বহুমতি' মানে 'পারিতোষিক'ও হয়, আবার 'অব্যবস্থিতচিত্ততা'ও হয়। বাবা ব'ললেন, "আমি সব সময় 'একমতি' বা 'একাগ্রচিত্ততা' বিতরণ করি, কখনও 'বহুমতি' বা 'অব্যবস্থিত চিত্ততা' বিতরণ করি না।" যারা জয়লাভ ক'রে প্রাইজ পেল, বাবা তাদেরকে ব'ললেন, পরাজিতদের ধন্যবাদ দিতে, কারণ এরা আর একটু চেষ্টা ক'রলে হয়তো জয়লাভ ক'রতে পারতো এবং সেক্ষেত্রে প্রাইজগুলি বিজয়ী পক্ষের হাতছাড়া হ'তো।

ভেঙ্কটগিরি শহরে বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাবা, ছাত্রীদের সদভ্যাস আয়ত্ত করার ওপর ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "বই খাতার প্রতি খুব যত্ন নেবে। তোমাদের পিতামাতা কত কষ্ট ক'রে তোমাদের জন্য বই খাতা কিনে দিয়েছেন। বাড়ীতে তোমার ভাইবোনদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ক'রে গৃহের পরিবেশ অশান্তিময় ক'রে তুলো না। ধনী সহপাঠীকে হিংসা করো না। সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে। কখনো জাঁক দেখাবে না। সব সময় সত্য কথা ব'লবে। কাপুরুষরাই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠবে। তারপর স্নান সেরে একলা স্থিরভাবে বসে ঈশ্বরের ধ্যান ক'রবে। রাত নটায় শুতে যাবে এবং শোবার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ব'লবে তিনি যেন কৃপা ক'রে তোমার সারাদিনের কর্ম গ্রহণ করেন। কারণ সেই কর্মগুলি সৎভাবে এবং কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে করা হ'য়েছে। তিনি যেন তোমাকে, তোমার ভাইবোনদের, যারা তাঁরই সন্তান, সেবা করার শক্তি দান করেন। প্রাতঃকালে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা ক'রবে যে, যে দিনটি তিনি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছেন তা যেন তোমার এবং অপরের মঙ্গলের জন্য সৎকাজে অতিবাহিত হয়।"

মিত্তিপাড়ু গ্রামের কৃষকদের উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের বিষয়ের ওপরেই বাবা ভাষণ দিলেন। তিনি ব'ললেন, "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সামান্য ধূলো-বালির ভেতর থেকে তোমরা সৃষ্টি ক'রছো অসামান্য খাদ্য—যা মানুষ আর পশু উভয়েরই

পুষ্টি যোগায়। এই কাজ কত পুণ্যময় যা তোমরা প্রতিদিন ক'রে চ'লেছো। আজ তোমাদের এখানে এসে আমি ভীষণ আনন্দ পেলাম। তোমাদের সমস্যা অনেক, তোমাদের আত্মবিশ্বাসও অগাধ। প্রকৃতির কোলে খোলা হাওয়ার মধ্যে তোমরা কাজ ক'রছো—মাথার ওপর নীল আকাশ, চারধারে সবুজ ক্ষেত। ফসলের এই প্রাচুর্য, প্রান্তরের এই বিশালতা এবং আকাশের এই শোভা—সবকিছুর মধ্যে, যে ঈশ্বর বিরাজ ক'রছেন, তোমরা যখন আলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাঠে যাও, তখন যদি একবারটি তাঁর নাম গান ক'রতে ক'রতে যাও তাহ'লে কত ভাল লাগে বলতো? এই সুন্দর বাতাস পবিত্র ক'রে তোলো তাঁর মহিমা কীর্তন ক'রে। নিজেদের মধ্যে রাগারাগি ক'রে বা কটু কথা ব'লে এই বাতাস দূষিত ক'রো না।"

চিত্রাবতীর তীরে, বুদিলি গ্রামেও তিনি একই কথা বলেন। তিনি বলেন যে আমাদের দেশের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হ'লো গ্রাম এবং কৃষকদের পবিত্র মধুর জীবন। সুযোগ সুবিধা পেলে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, দলাদলির বিপদ এবং মন্দিরে মন্দিরে পূজার্চনা আর কীর্তন গানের ধর্মীয় ঐতিহ্যগত মূল্য সম্বন্ধেও তিনি বলেন। গ্রামের মন্দিরের দালানের একধারে একটা ভাঙাচোরা গোরুর গাড়ী এনে ফেলে রাখা হ'য়েছে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন যে, এর দ্বারা মন্দিরের পবিত্রতার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশিত হয়। গ্রামের যুবকদের তিনি বিশেষভাবে উপদেশ দিয়ে ব'ললেন, তারা যেন তাদের সমস্ত বুদ্ধি আর ভক্তি এই মন্দিরের সেবায় ঢেলে দেয়।

একবার হাসপাতাল সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনতা এবং সভার উদ্যোক্তাদের তিনি অমূল্য উপদেশ দেন। সত্য সাই হাসপাতালে বাবা একবার দুঃখ ক'রে বলেছিলেন যে, বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগে রুগীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ডাক্তাররা তাদের রিপোর্টে হাসপাতালের উন্নতি সম্পর্কে কিছু লিখছে না। তিনি ব'ললেন যে, তিনি সেইদিনই খুশি হবেন যেদিন দেখবেন প্রত্যেকেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হ'য়েছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় প্রধানত মনে শান্তি অর্জন ক'রতে পারলে। তিনি বললেন, "দুশ্চিন্তা, লোভ, অকারণ বিক্ষোভ, এবং উদ্বেগ—এইসব মানসিক বৃত্তিদ্বারা শারীরিক রোগও জন্মাতে পারে। অসুখ মানে সুখের অভাব। সবচেয়ে ভাল ওষুধ হ'লো মনের

সন্তোষ। দেহের প্রতি অতি অবশ্য যত্ন নিতে হবে, কারণ দেহ হ'লো তরী যা বেয়ে আমরা সংসার-সমুদ্রের পারে যাবো। সুতরাং মাত্রাতিরিক্ত উপবাসাদি সংযম পালন ক'রে দেহের শক্তি ক্ষয় করা ঠিক না। বই এবং চার্ট দেখে যোগ ব্যায়াম করাও উচিত নয়—এই বদভ্যাস শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উর্বর ক্ষেত্র। সুশীল হও, বীর্যবান হও, সৎ হও, মিতাচারী হও, সহিষ্ণু হও এবং আনন্দে থাকো। এইগুলি সমস্তই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম। সুস্বাস্থ্যের পক্ষে মহামূল্য সম্পদ হ'লো সৎ চরিত্র।

দেশের নানা স্থানে ভক্তরা প্রশান্তি-নিলয়মের রীতি অনুসারে, নিয়মিত ভজন অনুষ্ঠান করেন। বছরের কোন বিশেষ দিনে তাঁরা ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অখণ্ড ভজনও করেন। বাঙ্গালোরে একবার এইরকম এক অখণ্ড ভজনের শেষে বাবা তাঁর ভাষণে ব'ললেন যে, মানুষের জীবনকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির এক অখণ্ড ভজনে পরিণত ক'রতে হবে। সত্য সাইবাবার ভক্তদের পক্ষে এইরূপ সর্বক্ষণ ঈশ্বরচিন্তা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা প্রমাণ পেয়েছে যে বাবা সর্বত্র তাদের সঙ্গে আছেন এবং অন্তরে বিরাজ ক'রছেন। বাবা স্বয়ং উপযাচক হ'য়ে তাদের একান্ত গোপনীয় কোন আচরণ বা ধারণা সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করেন যে তারা অবাক হ'য়ে ভাবে, বাবা কি ক'রে জানলেন এসব কথা যা শুধু তারা নিজেরা ছাড়া আর কেউ জানতো না। একবার রাজামণ্ড্রির একটি ছাত্র যখন বাবাকে বলে যে সে অন্য সব কাজ বন্ধ রেখে একমনে শুধু পরীক্ষার পড়া তৈরী ক'রেছে, তখন বাবা তৎক্ষণাৎ তাকে ব'লে উঠলেন, "কি বললে? তুমি একদিন রাত্তির বেলা কি হোস্টেলে নেমতন্ন খেতে যাওনি আর তারপর অনেক রাতে বাড়ী ফেরোনি? আর একদিন তোমার গ্রামের আত্মীয়দের সঙ্গে কি বাজারে কাপড়চোপড় কিনতে বেরোওনি?"

বাঙ্গালোরে একবার ভজনের পর বাবা দুঃখ ক'রে ব'ললেন, "এত ভজনমণ্ডলী গঠিত হয়েছে, সভা-সমিতি করে এত ধর্মালোচনা হচ্ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে মানুষের নৈতিক আচরণে কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না কেন? এর কারণ আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বললেন, ভজন করা যেন একটা আনুষ্ঠানিক, নিয়মমাফিক এবং একঘেয়ে ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মুখে যা বলা হচ্ছে কার্যক্ষেত্রে তা পালন করা হচ্ছে না।"

বাবা বলেন বিশ্বাসের অর্থ অন্ধ বিশ্বাস নয়। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রসর হতে হলে জিজ্ঞাসু মন একটি অত্যাবশ্যক গুণ। তিনি বলেন, "সাধনার পথে এসে নিজে পরীক্ষা করে দেখো। প্রশান্তি-নিলয়মে এসো, এখানে অবস্থান করো, আমার সাথে ঘোরো, আমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করো, আমার কথাবার্তা বুঝতে চেষ্টা করো। মন দিয়ে আমার কথা শোনো এবং আমাকে লক্ষ্য করো। তারপর তোমার নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ো। অভ্যন্তরে প্রবেশ করো, গভীরতার সন্ধান নাও। নিজে মুখে দাও এবং স্বাদ চেনো। ভগবানকে জানতে হ'লে সাধনা করা চাই—অকপট এবং অনলস সাধন। বিশ্বাসের এক কণা আগুনকে যদি বিরাট অগ্নিকুণ্ডে পরিণত ক'রতে চাও, তবে এমন যত্ন নেবে যাতে আগুন নিভে না যায়। মাঝে মাঝে তোমার নিজের মনের গভীরে আশ্রয় নাও—নীরবে এবং একাকী।" এই হ'লো বাবার উপদেশ।

ত্রিবান্দ্রমে বাবা প্রশ্ন তুললেন, "এ কেমন কথা, এই রাজ্যে শিক্ষার এত উন্নতি হ'য়েছে, সাক্ষরের সংখ্যা এত বেড়েছে, অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে বিদ্যাদানের এত আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যার্জনের উৎসাহ এত ব্যাপক হ'য়েছে, কিন্তু তবুও মানুষের মনে শান্তি নেই।" তিনি তখন ব'ললেন যে, বাতাসের যেমন দ্বিমুখী স্বভাব—মনেরও ঠিক তাই। যে বাতাস আকাশের সব মেঘকে একত্র ক'রে বারিধারা আনে সেই বাতাসই আবার আকাশের সব মেঘ এলোমেলো ক'রে তাড়িয়ে দেয়। মনের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর স্বভাবকে কি করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, বাবা তার উপায় ও প্রণালী সম্বন্ধে বললেন। তিনি বললেন, "আমি কখনোই কাউকে নাস্তিক বা অবিশ্বাসী ব'লতে রাজী নই, কারণ সকলকেই ঈশ্বর সৃষ্টি ক'রেছেন এবং প্রতিটি মানুষ তাঁর করুণার পাত্র। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে প্রেমের ঝরনা এবং সত্যের কঠিন শিলা আছে। ঈশ্বরই সেই প্রেম—তিনিই সেই শিলা। প্রত্যেকের অন্তরাত্মার গভীরে দেবত্ব বর্তমান। রাম নামের তুরপুন দিয়ে একমনে, একভাবে খুঁড়ে চ'ললে এই উৎসের স্তর ভেদ করা যায় এবং তখন অন্তরস্থিত দেবত্বের ফোয়ারা তীব্রবেগে উৎসারিত হয় এবং আনন্দে তার তৃপ্তিতে সাধকের মন ভরে ওঠে।"

নাজ্‌ভিদে ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় দলাদলি এবং পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে

বাবা ব'ললেন যে, জাতি, বর্ণ, ঐশ্বর্য এবং দারিদ্র্য—ঈশ্বর এসব কিছুর ঊর্দ্ধে। এই বিশ্বাস করা মূর্খতা যে ঈশ্বর পূজার্ঘ চান আর না পেলে ক্রুদ্ধ হন। যে সব ধর্মীয় গুরু চাঁদা সংগ্রহ করে এবং দাতার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, যাদের নজর একমাত্র টাকার থলির দিকে, যারা জনসংযোগের সবচেয়ে সহজ, স্বাভাবিক এবং সুবিধাজনক পথ বাক্যালাপকে বর্জন ক'রে, সাধারণ লোকের কাছে একদিকে মৌনী সাজে আবার অন্যদিকে নিজেদের সব কাজকর্মই ইসারা ইঙ্গিতে বা অন্ত উপায়ে নির্বাহ করে—এই ধরণের সব গুরুদের সম্বন্ধে বাবা সকলকে সতর্ক ক'রে দেন। আর্কোনাম গ্রামে, দিব্য জীবন সমিতির সম্পাদক তাঁর রিপোর্ট পাঠ করার সময় যখন ব'ললেন যে বার্ষিক চার আনা চাঁদা দিলে যেকোনো ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য হ'তে পারবে, তখন বাবা ব'ললেন যে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে সভ্য হবার অনুমতি দেবেন যদি তার চারটি সদ্‌গুণ থাকে—চার আনা নয়!

মাদ্রাজে, ভারতীয় যুব সংঘের সভায় তিনি উপস্থিত বয়স্ক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানালেন তাঁদের আচরণ দিয়ে যুব সমাজের সামনে সততা, যোগ্যতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার মহান আদর্শ স্থাপন ক'রতে। তিনি ব'ললেন, "নিজেদের প্রখ্যাত ব'লে দাবী করে, এধরণের অনেকে সভা সমিতিতে বড় বড় ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে শ্লোকের পর শ্লোক আউড়ে যায়। কিন্তু অন্যদিকে নিজেদের হীন আচরণ, শঠতা এবং কলহদ্বারা তারা ঐসব ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করে। বক্তা, বিষয় এবং পরবর্তী আচরণ—কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।" গোখেল হলে এক ভাষণে বাবা ব'ললেন, "মানুষকে চারটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতেই হবে। আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কোথায় চলেছি এবং আমি কতদিন আছি?" তিনি ব'ললেন যে, ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এই জিজ্ঞাসারই উত্তর দেওয়া হ'য়েছে। তিনি দেখালেন, কেমন করে জ্ঞানের সাহায্যে এই সত্য জানা যায়। তবে একভাবে নাম স্মরণদ্বারা ঈশ্বর কৃপালাভ হ'লে তখন পলকের মধ্যে এই সত্য জানা যায়।

জাতির নৈতিক জীবনে বর্তমান গভীর সংকটের কারণ বিশ্লেষণ ক'রে তিনি ব'ললেন, অহেতুক নিন্দা আর বিদ্রূপ করার প্রবণতা বর্তমান যুগের দুটি প্রধান রোগ। এই রোগ থেকেই অশ্রদ্ধা আর অবিশ্বাস সংক্রামিত হয়। যে ব্যক্তি

সর্বক্ষণ ঈশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে কাটায়, তার জীবন নিরাপদ এবং সুখের, কারণ নিন্দুকেদের সমালোচনার বর্শা তাকে বিদ্ধ ক'রে যন্ত্রণা দিতে ব্যর্থ হবে। তাই সমস্ত সৎব্যক্তির এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে এই নিন্দুকদের দেখিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে ধর্মপথে থেকে তাদের জীবন কত মধুর হ'য়েছে, সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করে জীবনের পথে চলাতে তাদের যোগ্যতা, আন্তরিকতা এবং সাহস কত বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারা ভারত সাই-সমাজের সভায় তিনি ব'ললেন, "কোন একটি শব্দের অর্থ খুঁজতে তোমাদের অনেক সময় অভিধান খুলতে হয়, কিন্তু অভিধানের পাতা ওলটাতে ওলটাতে অন্য অনেক শব্দের ওপর তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, আর তখন একই সাথে সেইসব শব্দের অর্থও জানা হ'য়ে যায়। সেই রকম, আমার কাছেও হয়তো কোন বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা আগমন ক'রো, কিন্তু এখানে আসার পর তোমরা টের পাও যে, অন্যান্য অনেক সমস্যার মীমাংসা, কোন তীব্র যন্ত্রণার উপশম, সর্বোপরি—আত্মিক শান্তি অর্জন—এসব কাজও আমাকে দিয়ে করানো যেতে পারে।" সুযোগ পেলেই বাবা শ্রোতার মর্মে এই কথা গেঁথে দেবার চেষ্টা করেন যে তার নিজের প্রয়াস, নিজের বিচারশক্তি, নিজের আত্মত্যাগ, নিজের একাগ্রতা—একমাত্র এই গুণগুলির সাহায্যেই তার যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—সেই শান্তি—লাভ করা যায়।

রয়াপুরমে, 'শান্তি-কুটিরে' তিনি একদিন শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য একদিন ভগবদ্গীতার ওপর অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ এবং মনোরম ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এমন অনেক ঘটনার কথা বলেছিলেন যা কোন গ্রন্থে লেখা নেই। গীতা শব্দটি নিয়ে তিনি খেলা করেন এবং বলেন যে গীতাকে উল্টে দিলে তাগী হয় এবং তেলেগুতে তাগীর অর্থ 'পান করো'। তিনি ব'ললেন যে যতদিন না গীতামৃত পান ক'রে একে পরিপাক ক'রছো ততদিন এর ফল টের পাবে না। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য দেখানোর জন্য বা শাস্ত্রজ্ঞান জাহির করার জন্য গীতাপাঠ করা বা হাজার হাজার গীতাভাষ্য রচনা করা, অমূল্য সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুট্টাপর্তীর এক সভায় বাবা ব'লেছিলেন যে, দুটি মাত্র পথ আছে। একটি পথ চলে গেছে পার্থিব জগতের দিকে—সামাজিক জগতের দিকে, যে সমাজে

মানুষ বাস করে। অপরটি হ'লো, যে সাধনায় আত্মাকে জানা যায় সেই পথ, অর্থাৎ নিজের সত্তাকে জানার পথ। মানুষকে তার ডান হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ঈশ্বরকে ধরতে হবে আর বাঁ হাত দিয়ে সংসারকে। এই বাঁ হাতের মুঠি ক্রমশ আল্‌গা হ'য়ে আসবে। "এর জন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই। এ হ'তেই হবে। সেইজন্যেই তো একে বলা হ'চ্ছে left (বাম) অর্থাৎ যা ত্যাগ করা হ'য়েছে। কিন্তু ডান হাতের মুঠি শিথিল করা একেবারেই চ'লবেনা। যেহেতু এটা right (ডান) হাত, তাই ধরেও থাকতে হবে খুব tight (শক্ত) ক'রে। এই জন্যেই তো এর নাম right অর্থাৎ যা ঠিক—যা সত্য।" বাবার এই ধরনের কথা শ্রোতাদের স্মৃতিতে চিরদিন অম্লান থাকবে এবং তাদের আনন্দ আর পুষ্টি যোগাবে।

ভেঙ্কটগিরিতে একটি আধ্যাত্মিক আলোচনা-সভায় বাবা ব'ললেন, ভারত-বাসীর সর্বনাশের কারণ হ'লো, সহৃদয়তা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব। নেল্লোরের এক বিশাল জনসভায় একঘণ্টার ওপর ভাষণ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার শ্রোতাকে বাবা মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। বিবেক, অনুসন্ধান আর বিশ্বাসের কথা তিনি শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন। গুডুরে প্রেমের সম্মোহনশক্তির ওপর ভাষণদানকালে বাবা ব'ললেন, "তোমরা আমাকে প্রেমস্বরূপ ব'লে ডাকলে একটুও ভুল হবে না।"

পেড্ডাপুরমে তিনি সবাইকে উৎসাহ দান ক'রে ব'ললেন দুর্বলতা, কাপুরুষতা এবং হীনমন্যতা বর্জন ক'রে প্রত্যেককে বীর হ'তে হ'বে। পেশী হওয়া চাই লোহার মত মজবুত এবং স্নায়ু হওয়া চাই ইস্পাতের মত দৃঢ়। তিনি ব'ললেন, "তোমরা নিজেকে কখনো পাপী ব'লে মনে ক'রবে না। নিজেকে পাপী মনে করাই সবচেয়ে বড় পাপ। তোমরা প্রত্যেকে অমৃতের সন্তান এবং তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজ ক'রছেন। ঈশ্বর, সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি। তাহ'লে তোমরা কেন নিজেদের পাপী ভাববে?"

বাবা, প্রায়ই অবতার পুরুষদের দৈবলীলার নানা কাহিনী শিক্ষামূলক উদাহরণ হিসাবে তাঁর ভাষণে ব্যবহার করেন। তিনি এ সম্পর্কে এমন সব কাহিনী বলেন যেগুলি কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি, অথচ প্রামাণিকতায়

চিহ্ন তাতে সুপরিস্ফুট। ভারতবর্ষ, পাশ্চাত্যদেশ এবং মধ্য-প্রাচ্যের সমস্ত সাধুসন্ন্যাসীর জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস তিনি জানেন এবং খ্রীস্টান, মুসলিম ও পার্শী সাধুপুরুষদের জীবনের নানা ঘটনার কথা তিনি গল্পচ্ছলে বলেন। ধর্মালোচনায় কোন বিশেষ তত্ত্ব বোঝাবার সময় ভারতীয় সাধক ত্যাগরাজা বা পওহারী বাবার সঙ্গে সঙ্গে হাসান, হোসেন, মোজেস্, জেরোম এবং সেণ্ট পল-এর জীবনীও তাঁর কাছে সমান মূল্যবান। বাবাই বর্তমান, বাবাই অতীত, বাবাই ভবিষ্যৎ। তিনিই সনাতন সাক্ষী।

বাস্তবিকপক্ষে তাঁর অবতারত্বের এই বিশেষ দিক সম্বন্ধে নানা ভাষণে, বহুবার, তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রেছেন। তাঁর দীপ্ত মহিমার এই প্রকাশ সহসা যেন এক বিদ্যুতের ঝিলিক হ'য়ে আমাদের অন্ধকার চেতনা আলোকিত এবং রোমাঞ্চিত করে। তিনি বলেন, "আমাকে বৃথা পরিমাপ করার চেষ্টা করো না। বরং তুমি তোমার নিজের শক্তির বিস্তার কতখানি আগে সেইটা আবিষ্কারের চেষ্টা করো। তবেই তুমি আমার শক্তির বিস্তার ভালভাবে আবিষ্কার করতে পারবে। আমি তপস্যা করি না। আমি ধ্যান করি না। আমি অধ্যয়ন করি না। আমি সাধক নই, জিজ্ঞাসু নই, শিক্ষার্থী নই, এমন কি ঋষিও নই। আমি অবতীর্ণ হ'য়েছি অধ্যাত্মজগতের সব সাধককে পথ দেখাতে, তাদের কল্যাণ ক'রতে। আমি পুরুষ নই, নারীও নই। আমি যুবক নই, বৃদ্ধও নই। আবার সব কিছুই আমি। আমাকে স্তুতি ক'রো না। আমি চাই তুমি তোমার আপন অধিকারে নির্ভয়ে আমার কাছে আসবে। তুমি কি তোমার পিতার স্তুতি করো? যা কিছু তার কাছে চাও, সে তো তুমি পুত্রের অধিকারেই চেয়ে থাকো। তাই নয় কি? আমি এই পৃথিবীতে অযাচিতভাবে অবতরণ করিনি। সব দেশের সব ধর্মের ঋষিরা ব্যাকুলভাবে আমাকে ডেকেছিল, তাই আমি এসেছি। তুমি হয়তো আমাকে আজই প্রথম দর্শন করছো, কিন্তু আমি তোমাকে প্রথম থেকেই জানি। তোমার নাড়ী-নক্ষত্র সব আমি জানি। আমার কোন বিশেষ গুণ বা কর্ম নেই। কার্যকারণের কোন নিয়মে আমি আবদ্ধ নই। সুতরাং মায়া আমাকে কি ক'রে প্রভাবিত ক'রবে? আমি যদি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হতাম তবে তোমরা আমার সে রূপ দেখে পালাতে অথবা

আমাকে কোন প্রদর্শনীতে দেখাবার জন্তে রাখতে। আবার আমি যদি পাঁচ জনের মত সাধারণ রূপ নিয়ে আসতাম, তবে তোমরা আমাকে কেউ গ্রাহ্য ক'রতে না। সেই জন্যই আমি এই শরীর ধারণ ক'রেছি আর মাঝে মাঝে তোমাদের এইসব অলৌকিকত্ব আর মহিমা দর্শন করাই। আমার ব্রত হ'লো মানবসমাজকে প্রেম আর সত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনর্জীবন দান করা। আমি তোমাদের দেখাতে এসেছি সৎকর্ম ক'রে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করা যায় এবং পরিশেষে মৃত্যুতে লাভবান হওয়া যায়। তুমি যদি আমার দিকে এক পা এগিয়ে আসো, আমি তোমার দিকে তিন পা এগিয়ে যাবো। দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে কেউ আমার কাছে এলে আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাই, কারণ দুঃখ মোচনের জন্য যে জিনিসের তার বিশেষ প্রয়োজন তা যে আমার ভাণ্ডারে মজুত আছে। আত্মিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবাই আমার আপনার জন। সেইজন্যে যারা আমার উপাসক নয় তাদের অপেক্ষা আমার উপাসকরা যে বেশী আপন এ কথা ভাবা ঠিক না।" তাঁর ভাষণের যে বিদ্যুৎ ঝিলিকের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে, এইগুলি হলো সেই ঝিলিকের কয়েকটি নমুনা। তিনি একবার ব'লেছিলেন, "আমার ইচ্ছাই তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিকে আমার ভাষণ শুনতে এই পুট্টাপর্তীতে টেনে এনেছে।" তাঁর করুণা এবং তাঁর শক্তির এই হ'লো বিস্তার।

বাবার বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থ এবং মূল উদ্দেশ্য এই সব ঘোষণার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। বাবা প্রত্যেককেই তাঁর সর্বজয়ী প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। শ্রোতাকে আহ্বান করে তিনি যখন বলেন, "আমি কাউকে বর্জন করিনা—ক'রতে পারি না। আমার প্রকৃতিই তা নয়। ভয়ের কিছু নেই। আমি তোমারই। তুমিও আমারই।"—তখন শ্রোতা আর বাবার মধ্যে সুনিবিড় এক স্বর্গীয় বন্ধন সাথে সাথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে তাঁর বাণী বীজ হ'য়ে শ্রোতার অন্তরের গভীরে চলে যায় এবং সেখানে অঙ্কুরিত হ'য়ে সদাচরণ এবং উন্নত চরিত্রের এক বিশাল মহীরুহে ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করে। জনসভায় ভাষণ দেবার সময় মনে হয় তিনি যেন মাত্র একজনকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলি বলছেন। বাবার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো অজ্ঞানের তিমির থেকে মানুষকে আলোর মাঝখানে তুলে নিয়ে আসা

এবং মানুষের যথার্থ স্বরূপ—অবিনাশী ও অমর আত্মা সম্পর্কে তার চেতনা জাগিয়ে তোলা।

তিনি প্রেরণা সঞ্চার ক'রে বলেন, "তোমরা অপরাজেয়। জীবনের উত্থান-পতনের প্রভাব কখনোই তোমাদের স্পর্শ করতে পারে না। পথ চলার সময় তোমাদের ছায়া ধুলোকাদা, ঝোপঝাড়, পাথরবালির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে, কিন্তু এতে তোমাদের কোন ভাবান্তর হয় না এবং তোমরা অবিচলভাবেই এগিয়ে চলো। কারণ তোমরা জানো যে তোমাদের দেহের তো কিছু হয়নি—দেহ অবিকৃতই রয়েছে। সেইরকম তোমাদের এই দেহ হ'লো সেই অপরাজেয় আত্মার ছায়া, সুতরাং সেই দেহরূপ ছায়ার ভাগ্য নিয়ে তোমাদের মিছিমিছি ভাবনা করার কোন কারণ নেই।" বাবা নানা উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়েছেন এবং এইভাবে মানুষের মনে অদম্য সাহস সঞ্চার ক'রেছেন।

অনেকবার তিনি ব'লেছেন "আমার ব্রত হলো তোমাদের মন থেকে ভয় আর দুর্বলতা দূর করা। আর সে জায়গায় সাহস আর আনন্দ নিয়ে আসা। পাপী মনে ক'রে নিজেকে ঘৃণা ক'রো না। আসলে পাপ কথাটিই ঠিক না। বাস্তবিকপক্ষে কথাটি হওয়া উচিত ত্রুটি। একেই ভুল ক'রে পাপ বলা হয়। তোমরা যদি অন্তর থেকে অনুতপ্ত হ'য়ে 'আর আমার অন্যায় হবে না' বলে আমাকে কথা দাও, তবে আমি তোমাদের শত অন্যায় মার্জনা করতে রাজী আছি। অজ্ঞানতার দরুণ যে কু-অভ্যাসের ফাঁদে পড়েছিলে তার থেকে পরিত্রাণ লাভের শক্তি যোগাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাও।" এইভাবেই বাবা প্রতিটি হৃদয়ে আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। তাঁর সুমিষ্ট কথা, অপার করুণা এবং আন্তরিক উপদেশের ফলে কত লোক যে সংশোধিত হ'য়ে সেবাধর্মে নিজেদের নিয়োগ ক'রেছে তার সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব।

একবার নেল্লোরে এক সভায় ভাষণ দেবার পরের দিন সকালে একটি করুণ দৃশ্য দেখা যায়। মাঝবয়সী একটি লোক বাবার ঘরে ছুটে এসে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে শিশুর মত কাঁদতে থাকে। বাবা অন্তর্যামী, তাঁর কাছে এর কারণ অজানা নয়। তিনি উপস্থিত ভক্তদের শুধু ব'ললেন, "কালকের ভাষণে রামুর

গল্প।" এই বলে তিনি সবাইকে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে বললেন। আগের দিন বাবা তাঁর ভাষণে রামু নামে একটি ছোট ছেলের করুণ কাহিনী শুনিয়েছিলেন। রামু দোরে দোরে ভিক্ষে করে পেট চালায়। তার মা রোগে শয্যাশায়ী। একদিন এক বাড়ীর সামনে চেঁচিয়ে ভিক্ষে চাইলে বাড়ীর মালিক ভীষণ রেগে যায় এবং রামুর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে। রামু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায়। তার ভিক্ষাপাত্র রাস্তায় ছিটকে পড়ে এবং ঐ আঘাতে রামুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রামু বলে, "মা, মা, এখন তোমাকে কে খাওয়াবে?" এই করুণ কাহিনী শোনানোর পরে বাবা উপদেশ দিয়ে বলেন যে, প্রতি সন্তানকে অতি অবশ্য তার পিতামাতার প্রতি সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, কারণ পিতামাতার জন্যই পৃথিবীতে সন্তানের অস্তিত্ব। বাবার কথা শোনার পর ঐ লোকটির মনে ভীষণ অনুতাপ হয়, কারণ এর আগে একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল। বাবার মার্জনা পাবার জন্য সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠল এবং কাতরভাবে প্রার্থনা জানালো যাতে মায়ের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য কৃপা করে বাবা তাকে আশীর্বাদ করেন। বাবা অন্তর্যামী। বলার পূর্বেই তিনি সব জানতেন। তিনি পরম স্নেহভরে লোকটির পিঠে হাত বোলাতে লাগলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তখন বাবা তাকে ব'ললেন, "অনুতাপের উদয় হ'লেই প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যায়। শান্ত হও। আর কেঁদো না। আমি তোমার গ্রামে যাবো। তোমার মাকে সেখানে নিয়ে আসবে। আমি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে আশীর্বাদ করবো। এখন যাও। আমি গ্রামে পৌছানোর আগে তোমার মাকে নিয়ে এসো।"

বাবার করুণাঘন বাণীর ফলে এইরকম অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। একটি বৃদ্ধ পিতার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। অবহেলিতা পত্নী সাদরে গৃহে ফিরেছেন। জুয়া খেলা বা মদ্যপানের মত মারাত্মক নেশা চিরতরে পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রেমের বাণী প্রচারের জন্য বাবার অভিযান সবেমাত্র শুরু হয়েছে। যে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি বাবার এই প্রেমের বাণী স্বকর্ণে শুনেছেন, তাদের পক্ষে বাবার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা পরিষ্কারভাবে বোঝা সহজ হবে। ১৯৫৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, বাবার ৩২ বছর বয়সে একটি মাসিক পত্রিকা "সনাতন

সারথি" প্রশান্তি-নিলয়ম থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বাবার এই ঘোষণা মুদ্রিত হয়। ঐ শুভদিনে "সনাতন সারথি"—অহঙ্কারের চার চাটুকার—মিথ্যাচার, অবিচার, পাপাচার এবং অনাচারের বিরুদ্ধে তার জয়যাত্রা শুরু করেছে। এই সংগ্রামে জয়ী হ'লে সমগ্র জগতের কল্যাণ হবে। সাফল্যের আনন্দে যেদিন বিজয় দামামা বেজে উঠবে, মানবজাতি সেদিন লাভ ক'রবে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আর আনন্দ।

ইতিমধ্যেই আকাশে বাতাসে এই অভিযানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই মহান ব্রতের তুর্যধ্বনি হ'লো বাবার চারদফা পরিকল্পনা : "সৎ হও—ধার্মিক হও—শান্ত হও—প্রেমিক হও।" তাঁর এই পরিকল্পনা সমগ্র মানবসমাজের জন্যই, কারণ তাঁর ভাষায় "এ কথা কোথাও বলা হয়নি যে বিশেষ কোন জাতি বা শ্রেণী বা পদমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছাড়া আর কেউ ঈশ্বরের করুণালাভের অধিকারী নয়। এই জগতের ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম যাবতীয় বস্তুরই এই করুণালাভের অধিকার আছে। সব কিছুই ঈশ্বর এবং সব স্থানেই ঈশ্বর। একনিষ্ঠ হ'য়ে সত্য আর প্রেমের পথে চললে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। সত্যই শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং একমাত্র প্রেমের দ্বারাই শান্তি অর্জন করা যায়।"

সাধক ও অন্বেষকদের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব বাবা স্বহস্তে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে, যে সব গুরু বিপথগামী হয়েছেন, বহুলাংশে তাদের নাম যশের পেছনে ছোটার জন্য, বা জনসমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে রেষারেষি ক'রে জয়লাভের জন্য, বা সংবাদপত্রের প্রশংসা পাবার মোহের জন্য, অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতির মত অনিত্য গৌরব লাভ করবার উন্মাদনার জন্য—সেইসব আদর্শভ্রষ্ট গুরুদের সংশোধন করবার ব্রতও বাবা স্বয়ং গ্রহণ ক'রেছেন।

তিনি বারবার ব'লেছেন, "আন্তরিকতার কষ্টিপাথরে এইসব গুরুদের যাচাই করো। পরীক্ষা ক'রে দেখো কে কতটা ত্যাগ ক'রেছে—শুধু মুখের কথায় ত্যাগ নয়, প্রকৃত বাস্তবে ত্যাগ। তারপর এদের উপদেশ তোমার জীবনে গ্রহণ ক'রতে পারো। কে কতটা আড়ম্বরের সঙ্গে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ক'রছে, সেটা বড় কথা নয়। আসলে সে তার নিজের জীবন সেই ত্যাগের আদর্শে পরিচালিত ক'রছে কিনা—সেইটাই বড় কথা।"

সদ্‌গুরু

অনেক সময় ভক্তেরা তাদের নিজেদের শহরে বা বাড়ীতে বাবাকে সাদর অভ্যর্থনা সহকারে নিয়ে যান এবং তাঁকে পুজো ক'রে আনন্দ পান। এই সুযোগদানের জন্য তারা পূর্ব থেকেই বাবার সম্মতি নিয়ে রাখেন। স্বভাবতই, এই সময়ে, ভক্তেরা আশা করেন যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি যেন এই উপলক্ষে বাবার অমৃতভাষণ শোনার সুযোগ পায়। বাবা প্রায়ই এই ধরনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এইভাবে বাবা চিট্টুর, ত্রিবান্দম, বম্বে এবং আরো অনেক জায়গায়ই গিয়েছেন এবং ভক্তরাও তাঁকে পুজো করবার সুযোগ পেয়েছে। বহু শহরে তিনি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং হাজার হাজার শ্রোতা তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর নিঃসৃত উদ্দীপনাময়ী ভাষণ শুনে দুর্লভ এবং অবিস্মরণীয় আনন্দলাভ ক'রেছে।

বাবা সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন। বহুদূরে অবস্থিত কোন অখ্যাত গ্রামের ভক্তের ডাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে শহর বা গ্রামে কোন পার্থক্য নেই। তিনি রাজপ্রাসাদ এবং পর্ণকুটির—উভয় স্থানেই সমান স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

ভক্তদের বাড়ীতে পদার্পণ করবার সময় খুব অল্পসংখ্যক লোক তিনি সঙ্গে নেন। কারণ তিনি পছন্দ করেন না যে এর ফলে ভক্তের আতিথেয়তা, সময় এবং অর্থের অকারণ চাপ পড়ে। বাবা নিজের কাজ নিজে ক'রতে ভালবাসেন এবং এজন্য তাঁর কোন অনুচরবর্গের প্রয়োজন হয় না। যেসব ভাগ্যবান ব্যক্তি বাবার সঙ্গে ভ্রমণের দুর্লভ সুযোগ পান, ভ্রমণপথে তাদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি স্বয়ং বাবার সস্নেহ মনোযোগ লক্ষ্য ক'রে এরা এই ভেবে অস্বস্তিবোধ করেন যে কোথায় এরা বাবাকে সাহায্য ক'রবেন, তা না, নিজেরাই বোঝা হ'য়ে চলেছেন।

বাবা অসংখ্যবার তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে কোয়েম্বাটুর, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, সালেম এবং তিরুভেল্লী ভ্রমণ ক'রেছেন। তিনি হায়দ্রাবাদেও

অনেকবার গিয়েছেন এবং তেলেঙ্গনার বহু শহরে ও গ্রামে ঘুরেছেন। তিনি ভক্তদের দেখানোর জন্য ইলোরা অজন্তা গিয়েছেন। তাঁর নিজের প্রয়োজনে এইসব ভ্রমণ নয়, কারণ তিনি তো স্থূলদেহে অন্যত্র গমন না ক'রেও সেইসব স্থানের নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারেন। তিনি দিল্লী, হৃষিকেশ, কাশ্মীর, মথুরা, বৃন্দাবন এবং বম্বে পরিভ্রমণ ক'রেছেন। দক্ষিণ ভারতে পূর্বদিকের সমুদ্রের ধারের রাস্তা ধরে তিনি বহুবার মাদ্রাজ থেকে কৃষ্ণা এবং গোদাবরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে গিয়েছেন। এই স্থানগুলি হ'লো নেল্লোর, ওঙ্গোল, গুণ্টুর নাজভিদ, চেব্রোল, রাজামন্দ্রি, পেড্ডাপুরম, সামালকোট এবং মসুলিপট্টম। তিনি ভদ্রাচলম, আওফিরি পল্লীতেও গিয়েছিলেন। কর্ণাটক রাজ্যে বাবা বেলারী, হোসপেট, মারকারা, মহীশূর, মাণ্ডিয়া ভ্রমণ করেন এবং মাদ্রাজ, কোডাই কানাল, উটাকামণ্ড এবং বাঙ্গালোরের কাছে হোয়াইটফিল্ডের নন্দনবনে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন।

একজন ভক্ত একবার বাবাকে বলে "আমি শুনেছি আপনার কেরালা ভ্রমণ খুবই চমৎকার হয়েছিল। এতে যোগ দেবার সৌভাগ্য হ'ল না বলে মনে দুঃখ পেয়েছি।" বাবা তাকে ব'ললেন, "প্রার্থনা করো পরের বার সুযোগ এলে যাতে যোগ দিতে পারো। আপাতত যারা গিয়েছিল, তাদের কাছে গল্প শুনে আনন্দ লাভ করো।" সে বারে বাবার ভ্রমণকালে কন্যাকুমারিকাতে একটি আলৌকিক ঘটনা ঘটে। নাটকীয় বৈচিত্র্যে অভিনব ছিল এই ঘটনা। ভক্তটি এই ঘটনার কথাই উল্লেখ ক'রেছিল। ঘটনাটি এই রকম—সেদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রের ওপরকার আকাশে রংয়ের সমারোহ। গোলাপী আর বেগুনী রং, কোথাও গাঢ়, কোথাও ফিকে—মিলে মিশে আকাশকে অপরূপ ক'রে তুলেছে। এরই মাঝে মাঝে সোনালী পাড় বসানো সাদা মেঘের ঝাঁক দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই নৈসর্গিক পরিবেশে বাবা তাঁর ভক্তের দল নিয়ে সমুদ্রের ধারে এলেন এবং তিনটি সাগর যেখানে এসে মিলেছে সেই জায়গায় ঢেউএর মাঝখানে খেলা ক'রতে লাগলেন। তাঁর চরণকমল ছুঁয়ে ধন্য হবার জন্য ঢেউগুলি যেন কাড়াকাড়ি শুরু ক'রে দিলো। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আপন আপন অর্ঘ্য নিবেদন ক'রতে তারা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সহসা বাবা সমুদ্রের দিকে মুখ ক'রে ঘুরে দাঁড়ালেন। মনে হ'লো তিনি যেন সমুদ্রের অর্ঘ্য নিবেদনের আকুল প্রার্থনা

শুনতে পেয়েছেন, বাবা ভক্তদের ডেকে ব'ললেন, "দেখো, দেখো! আমাকে মালা দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রতে সমুদ্র এগিয়ে আসছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিরাট ঢেউ রাজকীয় ছন্দে বাবার দিকে এগিয়ে এলো এবং কয়েক হাত দূরে এসে সহসা নত হ'য়ে বাবার চরণকমল ভক্তি-জলে ধুইয়ে আবার ধীরে ধীরে সমুদ্রের বুকে ফিরে গেল। এই বিশাল তরঙ্গই যে একছড়া মুক্তোর মালা বাবার চরণকমলে চুপি চুপি অর্ঘ্য দিয়ে চলে গেল তা প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি। কারণ ব্যাপারটা চকিতের মধ্যে ঘটে গেছে। সম্বিত ফিরে আসার পর ভক্তরা বিস্ময়ে চোখ মেলে দেখলো, সমুদ্রতীরে বাবার চরণকমল জড়িয়ে পড়ে রয়েছে সোনার তারে গাঁথা ১০৮টি মুক্তোর অপরূপ একছড়া মালা! সেই গোধূলিতে, প্রশান্ত সমুদ্রতীরে, উন্মুক্ত আকাশের বর্ণালীর নীচে, চরণে সমুদ্র-নিবেদিত পূজার্ঘ্য নিয়ে মহাকাশ আর মহাসাগরের মতই দুর্জ্ঞেয়, বাবার সেই ধ্যানগম্ভীর মনোহর রূপ বার বার দেখেও ভক্তদের মনের সাধ যেন আর কিছুতেই মিটছিল না।

এই স্মরণীয় দিনে ভক্তদের অনেক প্রশ্নের উত্তর বাবা দিয়েছিলেন। তার কয়েকটি এখানে তুলে দেওয়া হ'লো।

ভক্ত—এই যে সব সৃষ্টি—এ কি শুধুই মায়া?

বাবা—না। সৃষ্টি বলে মনে করাটাই মায়া।

ভক্ত—রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য কি সত্য ঘটনা?

বাবা—সত্য তো বটেই। বরং সম্পূর্ণ ঘটনার অতি অল্প অংশই এতে বলা হয়েছে। যেমন, অন্যের কাছে আমার কথা বলবার সময় তোমরা সম্পূর্ণ পরিচয় কি বর্ণনা করতে পারো?

ভক্ত—ধর্ম পুনঃস্থাপনের জন্য ঈশ্বরের মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন কী? তার সংকল্প কি যথেষ্ট নয়?

বাবা—অবশ্য যথেষ্ট। শুধু সংকল্প দ্বারাই এই কাজ করা যায়। কিন্তু ঈশ্বর নররূপে না এলে তোমরা এইসব আনন্দ, শান্তি কিভাবে লাভ করতে? কোথাও ছোটখাট গোলমাল হ'লে তা থামাতে একটি পুলিশ কনেষ্টবলের শক্তিই যথেষ্ট। গোলমালটি একটু বড় আকার নিলে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে পাঠানো হয়। গোলমাল যখন দাঙ্গার

আকার ধারণ করে তখন পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিজে আসেন দাঙ্গা দমন ক'রতে। কিন্তু, বর্তমানে যেরকম ঘোরতর অবস্থা, সমগ্র মানব-জাতি একটা নৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'য়েছে—তখন ইন্সপেক্টর জেনারেলরূপে স্বয়ং ঈশ্বরকে নেমে আসতে হয়েছে, সাধু মহাত্মাদের সৈন্যদল সাথে নিয়ে।

ভক্ত—অবতার কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

বাবা—আধ্যাত্মিক সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্রে।

ভক্ত—আপনিই যে শিরডি সাইবাবা তা আমাদের উপলব্ধি করার উপায় কি?

বাবা—তোমাদের পক্ষে এটা উপলব্ধি করা একটু কঠিনই বটে। সেদিন আমি যখন এক বৃদ্ধের রূপ ধারণ ক'রে বাগেপল্লীর কাছে রাস্তার ওপর ভেঙ্কটরমণের শিশুকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম, তখন ভেঙ্কটরমণ আমাকে চিনতে পারেনি। সে মনে ক'রেছিল আমি একজন গ্রামবাসী আর আমার নাম জোভি আদিপল্লী সোমাপ্পা, কারণ ঐ নামটাই আমি তাকে বলেছিলাম।

ভক্ত—শিরডি সাইবাবা এবং আপনার অভিন্নতা আমাদের কি ক'রে উপলব্ধি হবে?

বাবা—যারা শিরডি সাইবাবার পুজো করে তারাও তাঁকে উপলব্ধি ক'রতে পারেনি এবং তোমরাও আমাকে উপলব্ধি ক'রতে পারোনি। যারা দুজনকেই ঠিক ঠিক চিনেছে একমাত্র তারাই এ ব্যাপারে রায় দিতে পারে। তাই না?

পরদিন, সুরন্দাই-এর পথে কোর্টাল্লামে বাবা সদলবলে পৌছলেন। ত্রিবাঙ্কুর হাউসের বাইরে সন্ধ্যাবেলা ভজন হ'লো। তারপর বাবা সবার কাছে প্রশ্ন আহ্বান ক'রলেন এবং তার উত্তরে নিম্নোদ্ধৃত প্রেরণাদায়ক অমৃতবাণী ভক্তদের উপহার দিলেন, "আমি প্রত্যেক নিষ্ঠাবান সাধকের পেছনে আছি। সে আমাকে দেখবার জন্য পেছন ফিরে তাকায়, কিন্তু আমাকে দেখতে পায় না। কেমন করে পাবে? সে যখন পেছন ফিরছে আমি তো তখনও তার পেছনে আছি। কখনো কখনো আমার ইচ্ছা হ'লে আমি চকিতের জন্য তাদের দর্শন দান করি।"

"ঈশ্বর অনাদি, (অর্থাৎ যার আদি নেই)। তবুও লোকে কলহ ক'রে ব'লছে "ঈশ্বর 'নাদি' 'নাদি'।" (তেলেগুতে নাদি অর্থ আমার) অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, আমার!" নরলোকে সৎ ও অসৎ দুই-ই বর্তমান। দেবলোকে শুধুই সৎ। কারণলোকে সৎ অসৎ দুই-ই সমান। ব্রহ্মলোকে সৎও নেই অসৎও নেই।"

"নাস্তিক বা পাপী ব'লে কিছু নেই। সকলেই ঈশ্বর উপলব্ধি ক'রবে—কেউ আগে আর কেউ পরে।"

"আমি তোমাদের শতদোষ মার্জনা ক'রবো। আগে ভেবে দেখো তোমরা আমার উপদেশ পালন ক'রেছো কিনা, তার পরে আমার কথার সত্যতা যাচাই ক'রো।"

"স্কুলে সাপ্তাহিক পরীক্ষা হয়, মাসিক পরীক্ষা হয়, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয় এবং ষাণ্মাষিক পরীক্ষাও হয়। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার পরই কেবল সব পরীক্ষার নম্বর যোগ ক'রে ফল ঘোষণা করা হয় যে, তুমি পাশ ক'রেছো না ফেল ক'রেছো। প্রত্যেক পরীক্ষায় ভাল ফল করার চেষ্টা করো এবং এইভাবে মুখ্য-পরীক্ষক ঈশ্বরের করুণা অর্জন করো।"

"তোমাদের ভাগ্য তোমরা নিজেরাই গড়তে পারো আবার নিজেরাই ভাঙতে পারো। যে মনোভাব নিয়ে তোমরা জীবনকে দেখবে সেই মনোভাবের ওপরই এই গড়া বা ভাঙা নির্ভর করে। এই ব্যাপারে, পাশ্চাত্যবাসীদের কাছ থেকে ভারতবাসীর শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে হবে। এদেশের মানুষ শিশুদের মনে ছোটবেলা থেকেই ভয় ঢুকিয়ে দেয়—'ওরে, পড়ে যাবি। হাত পা ভাঙবি'—ইত্যাদি সব কথা তাদের বলা হয়। শিশুদের গাছে চড়তে শেখানো হয় না, সাঁতার কাটতে শেখানো হয় না এবং এরকম আরো হাজারটা প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের শেখানো হয় না। তাদের ভূতের ভয় দেখানো হয়, চোর ডাকাতের ভয় দেখানো হয় এবং এইভাবে তারা একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার পরিবেশে বড় হ'তে থাকে। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই স্বাবলম্বী হ'তে শেখাতে হবে, সাহসী হ'তে শেখাতে হবে এবং প্রাণবন্ত হ'তে শেখাতে হবে।"

"আধ্যাত্মিক সাধনার তিনটি স্তর আছে—(১) সাধক প্রথমে সাধারণ মানুষের মত। (২) সাধক এখানে একনিষ্ঠ সাধনায় রত। (৩) সাধক এখানে

ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেছে। প্রথমে তিন প্রকার সত্তা বর্তমান থাকে— জড়, জীব এবং ঈশ্বর। এরপর শুধু জীব আর ঈশ্বর। সবশেষে এই তিন সত্তা একীভূত হ'য়ে একমাত্র ঈশ্বরই বর্তমান থাকেন। জড় এবং চৈতন্য থেকে যাবতীয় সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।"

"বেহালাবাদক বিষান চৌড়িয়া বেহালায় ৪০০ রাগ-রাগিণী বাজাতে পারে, কিন্তু এই ৪০০ রাগ-রাগিণী বাজাবার জন্য তার বেহালায় ৪০০ তার নেই। মাত্র ৪টি তারের সাহায্যেই সে ৪০০ বিভিন্ন প্রকার সুর সৃষ্টি করে। তাই নয় কি? ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন। এখানে এক ব্রহ্মই সবার ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছেন। একজন ব্রহ্ম প্রশ্নকর্তা, দশজন ব্রহ্ম শ্রোতা। একজন ব্রহ্ম উত্তরদান করেন, সমগ্র ব্রহ্ম সন্তুষ্ট হন।"

"আতসী কাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্যরশ্মিকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ক'রলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেইভাবে ঈশ্বরের কৃপা-রশ্মিকে একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ক'রলে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জলিত হয়।"

"ঈশ্বর দুঃখ সৃষ্টি ক'রেছেন এই কারণে যে দুঃখ না থাকলে মানুষ ঈশ্বর লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হবে না। রোগীর জন্য কোন ওষুধের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সেই ওষুধের ক্রিয়া ভাল করার জন্য ডাক্তার অতিরিক্ত কিছু ব্যবস্থা নিয়ে থাকে, যেমন খাওয়া দাওয়ার বিধিনিষেধ ইত্যাদি। ঈশ্বরের দুঃখবিধানের ব্যবস্থাও অনেকটা সেইরকম।"

"ঈশ্বরের জন্য খিদে বাড়াও, তবেই বিশ্বাস জন্মাবে। পেটে খিদে না থাকলে নেমন্তন্ন বাড়ীর ভোজও মুখে রোচে না।"

"ধ্যান ও জপের জন্য অবশ্য নির্দিষ্ট কিছু ধাপ আর স্তর আছে যেগুলি অবশ্য পালন করতে হবে। আধ্যাত্মিক সাধনায় এদিক ওদিক ছুটোছুটি করা ভাল নয়।"

"যদি তুমি আমাকে প্রশ্ন করো, নামজপ আর ধ্যানের মধ্যে কোনটা বেশী কার্যকরী, আমি ব'লবো, তোমার নিজের যেটি বেশী ভাল লাগে সেইটি ক'রবে।"

"জপে জিভ আর ঠোঁট নড়বে না। জপ হওয়া চাই মানসিক। তুমি যদি সত্যের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলো তবে ব্যর্থতাকে আর ব্যর্থতা ব'লে মনে হবে না এবং দুঃখকেও দুঃখ ব'লে অনুভূত হবে না।"

"বিভিন্ন স্থানে বাবার অবস্থানের সময় প্রশান্তি-নিলয়ের মতই তিনি ব্যক্তিগত ইণ্টারভিউ মঞ্জুর করেন। প্রার্থীকে তিনি সান্ত্বনা, সাহস আর বিশ্বাসের অভয়বর প্রদান করেন। তিনি সম্মিলিত কণ্ঠে ভজন গাইবার জন্ত সকলকে উৎসাহ দেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং ভজন শেখান।

সবার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার তুলে, আর্তদের করুণাবর্ষণ ক'রে এবং শান্তিকামীদের শান্তিবারি দিয়ে, বাবা একস্থান থেকে আর একস্থানে ভ্রমণ করেন এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁর অলৌকিকত্ব দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি নররূপ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আমি এসেছি

১৯৫৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলা নাজভিদের এলামাক প্রাসাদের বিশাল প্রাঙ্গণে, বাবা এক জনাকীর্ণ সভায় ভাষণ দেন। এই সভায় নাজভিদ এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে প্রচুর জনসমাগম হ'য়েছিল। তিনি ভাষণ শুরু করেন এই বলে যে মানুষ আজকে তার পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং ভুল রাস্তার গলিঘুঁজির মধ্যে লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঠিক পথে ফিরে আসার এবং প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে সংশোধন করার ক্ষমতা মানুষেরই আছে। মানুষের আত্মানুসন্ধানের এই ক্ষমতাকে ভগবৎ সাধনায় প্রয়োগ ক'রতেই হবে—তাকে জানতে হবে যে একমাত্র এই পথে এগোলেই সুখ আর শান্তি লাভ হয়। বাবা ব'ললেন যে, মানুষের সদ্‌বুদ্ধিজাত শক্তির দৈন্যদশা হয়েছে ব'লেই আজ চারিদিকে এত দুঃখ, এত অশান্তি। এই পর্যন্ত ভাষণ দেবার পরই বাবা হঠাৎ থেমে গেলেন। তিনি চেয়ারে ঢলে পড়লেন এবং স্থির, নিঃসাড় হ'য়ে গেলেন। বোঝা গেল তিনি দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছেন কোন ভক্তের ভয়ানক বিপদে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে—"আমি এসে গিয়েছি।" তখন রাত ৭-২৫ মিনিট। বাতাসে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা বিরাজ ক'রছে। শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা ক'রছে। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু বাবার সামনে টেবিলে রাখা টাইমপিসটার টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে বাবা দেহে "ফিরে

এলেন" এবং পুনরায় অর্ধসমাপ্ত ভাষণ শুরু ক'রে ব'ললেন, "এটা আমার কর্তব্য। আমি যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমার বিপন্ন ভক্তের কাতর ডাক শুনতে পেলে আমাকে তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করবার জন্ম ছুটে যেতেই হবে।" এর পর তিনি প্রায় এক ঘণ্টার ওপর ভাষণ দিলেন—গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, দেহ ঈশ্বরের দেবালয় এবং ইন্দ্রিয় সংযমের বিধির ওপরে।

১৯৫৮ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখেও অনুরূপ এক ঘটনা ঘটেছিল। পুট্টাপর্তীতে সেদিন ছিল ভগবান শ্রীসত্য সাইবাবার জন্মদিবস উপলক্ষে ঝুলা উৎসব। ভজন হলের পূর্ব-প্রান্তে রাখা ঝুলাটি ফুল দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো হ'য়েছিল। ভক্তদের বিশেষ উপরোধে বাবা ঝুলায় বসলেন। কিছু আগে ভজন শেষ হ'য়েছে। এছাড়া যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানও হয়েছে। কয়েকজন ভক্ত ধর্মবিষয়ে কিছু বক্তৃতা দিলেন। অকস্মাৎ বাবা কোন এক বিপন্ন ভক্তের "ডাক শুনে" "জ্ঞান হারিয়ে" বালিশের ওপর এলিয়ে পড়লেন। পরে তিনি প্রকাশ ক'রেছিলেন যে হায়দ্রাবাদে তার এক ভক্তের উদরি-রোগগ্রস্ত পিতা হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছিল। বাবা তাকে দর্শনদান ক'রে বিভূতি দিয়ে আবার ঝুলায় ফিরে এলেন। তিনি মাত্র আড়াই মিনিট "বাইরে" ছিলেন। যেরকম তিনি নাগুভিদে ব'লেছিলেন যে, তাঁকে ছুটে যেতেই হবে—তাঁর ভাষায় "কর্তব্যের হাতছানিতে।" ভগবানের অপার করুণার অথবা তাঁর অসীম শক্তির কথা ব'লে বোঝানো মানুষের সাধ্যের বাইরে।

এতদিন ধ'রে নানাভাবে তাঁর করুণার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে নাটকীয় হ'লো তাঁর "দেহত্যাগ করে যাওয়া।" এমনকি ১৯৪০ সালেও, যখন তিনি মাত্র ১৪ বছরের বালক, তখনও তিনি সকলের মনে বিস্ময়াতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে কেউ কিছু টের পাবার আগেই এইভাবে "দেহ ছেড়ে চ'লে যেতেন।" এই দেহত্যাগ ক'রে যাওয়ার প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনাকেই লোকে বৃশ্চিকদংশনে অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়া বলে ভুল করেছিল।

"দেহ ছেড়ে" তিনি কোথায় গিয়েছিলেন বা কোন্ ভাগ্যবানকে করুণাদান ক'রে এলেন—এসব ঘটনার কথা বাবা কদাচিৎ প্রকাশ করেন। কিন্তু যে কয়েকটি ঘটনার কথা তিনি স্বয়ং প্রকাশ ক'রেছেন বা ভক্তদের কাছ থেকে

যা জানা গিয়েছে সেগুলির সংখ্যাও অনেক এবং এতে নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারা যায় যে এইভাবে সূক্ষ্মদেহে তিনি সুদূর আসাম সীমান্ত, কাশ্মীর উপত্যকা, বম্বের সমুদ্রতীর, নাল্লামালাইয়ের অরণ্য এবং সুইজারল্যাণ্ডের উপত্যকা ইত্যাদির মত ভারতের এবং বিদেশের বহু স্থানে গিয়েছেন। এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার ভাব ও ভঙ্গী কখনও কখনও তাঁর দেহে প্রকাশিত হ'তে দেখা গেছে, যেমন—মনে হচ্ছে তিনি যেন মাটির ওপর দিয়ে ভারী কিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, নিজের দিকে কোন কিছু টেনে আনছেন, নীচে থেকে কিছু টেনে তুলছেন, ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন অথবা কোন কিছু টেনে বের ক'রছেন। পরে তিনি এগুলি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে জলে ডুবে যাওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, গাড়ীচাপা পড়া, পিষ্ট হওয়া বা আটকে যাওয়া কোন ব্যক্তিকে তিনি উদ্ধার ক'রছিলেন। একবার মুথুকরে এক বাড়ীর বারান্দায় একদল ভক্তের সঙ্গে কথা বলা অবস্থাতেই তিনি বোলারাম শহরে চ'লে যান। তাঁকে সেখানে যেতে হ'য়েছিল এই কারণে যে একটি জীপ উল্‌টে যাওয়ায় তার নীচে এক ভক্ত আটকে পড়ে। বাবা তার কাছে ছুটে যান তাঁর অভয়বাণী নিয়ে "আর ভয়ের কিছু নেই। আমি তো এসে গিয়েছি।" জীপের তলা থেকে ভক্তকে তিনি টেনে বের ক'রলেন এবং যতক্ষণ না একটি বাস এসে তাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আহত ভক্তের পাশে অপেক্ষা করতে লাগলেন। "দেহে প্রত্যাবর্তন ক'রে" বাবা এসব ভক্তদের ব'লেছিলেন।

হায়দ্রাবাদের অত্যাচার এবং লুটপাটের সময় এক ভক্তের জীবন বিপন্ন হ'লে বাবা সূক্ষ্মদেহে তাকে রক্ষা ক'রতে যান। সেদিন প্রশান্তি-নিলয়মের বারান্দায় দেখা গিয়েছিল বাবা নিকটস্থ ভক্তদের সত্যি সত্যি ভীষণ প্রহার ক'রছেন। বাবা পরে ব'লেছিলেন যে, সেই মুহূর্তে হায়দ্রাবাদে দস্যুদের তিনি এর চেয়ে শতগুণ শক্তি নিয়ে প্রহার করেন এবং তারা আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে পালিয়ে যায়।

আর একটি ঘটনায়, ভীমাইয়া নামে একজন গ্রামবাসী, ফসলের ভাগ নিয়ে তার ভাইএর সঙ্গে বিবাদ ক'রে তীর্থযাত্রীদের দানে বাকী জীবন কাটাবার বাসনা নিয়ে পুট্টাপর্তী আসে। বাবা তার আচরণ সমর্থন ক'রলেন না। তাকে ব'ললেন যে, অপরের বোঝা হ'য়ে জীবন না কাটিয়ে সে যদি একটু বেশী

সহৃশক্তি, একটু বেশী ভালবাসার পরিচয় দিয়ে তার নিজের গ্রামে ফিরে যায় এবং ভাইএর সঙ্গে একত্রে থাকে তবেই সেটা সবচেয়ে সুখের হবে। তিনি ভীমাইয়াকে তার গ্রামে ফিরে যেতে ব'ললেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, সে যেখানেই থাকুক না কেন তাঁর করুণা সর্বদা তার ওপর থাকবে। ভীমাইয়া আশা ক'রেছিল, সে বাবার কাছে পুট্টাপর্তীতেই স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে, তাই বাবার কথায় তার মনে ভীষণ অভিমান হ'লো। সে বুঝলো যে বাবা যেন তাকে তাড়িয়ে দিলেন। হতাশার তাড়নায় সে স্থির করলো যে চলন্ত ট্রেনের নীচে তার ব্যর্থ জীবন বিসর্জন দেবে। এক অন্ধকার রাতে সে লাইনের ওপর শুয়ে থাকলো। কিন্তু অন্তর্যামী এবং করুণাসাগর বাবা ভক্তের বিপদে সূক্ষ্মদেহে সেখানে চলে গেলেন এবং ভীমাইয়াকে চলন্ত ট্রেনের তলায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রলেন। এদিকে পুট্টাপর্তীতে দেখা গেল, বাবা যেন ভারী কিছু ঠেলে সরাচ্ছেন। "জ্ঞান হবার পর" বাবা ভীমাইয়ার এই আচরণে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ব'ললেন, সে নির্বোধের মত তাঁর কথার ভুল অর্থ করেছে। এই ঘটনা সম্পর্কে ভীমাইয়া পরে ব'লেছিল যে সেই সময় সে অনুভব ক'রলো বাবা যেন খুব শক্ত ক'রে তার হাত চেপে ধরে রেলের বাঁধের ওপর থেকে তাকে টেনে নামালেন। গ্রামে তার ভাইএর কাছে ফিরে যাবার আগে সে বাবার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। আজও, ভক্তরা যখন এই ঘটনা উল্লেখ ক'রে ভীমাইয়াকে বলেন যে সে কেন এমন বোকামীর কাজ ক'রতে গিয়েছিল যার জন্য বাবাকে কষ্ট ক'রে "দেহ ছেড়ে" তার কাছে ছুটে যেতে হয়েছিল, তখন ভীমাইয়া লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে অনুনয় করে যে তাকে যেন একথা তুলে আর মনে কষ্ট না দেওয়া হয়।

কোন ভক্তের নশ্বর দেহত্যাগের অন্তিমসময়ে বাবা সূক্ষ্মশরীরে গিয়ে তাকে দর্শন দেন। একবার এইভাবে এক ভক্তের অন্তিম মুহূর্তে দর্শন দিয়ে ফিরে আসার পরই বাবা সেই ভক্তের নাম প্রকাশ ক'রলেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো এই ঘটনা কি তাহলে মাড্রাজে ঘটেছিল। বাবা ব'ললেন, "না। মাড্রাজের হাসপাতাল থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সময় পথে, হার্টফেল ক'রে তার মৃত্যু হয়।" পরে, শোকার্ত স্বামীর চিঠিতে জানা যায় যে স্থানীয় হাসপাতালে অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা না থাকায় তার স্ত্রীকে ট্যাক্সি ক'রে কুড়ি

মাইল দূরে এক শহরে নিয়ে যাওয়ার সময় ট্যাক্সির মধ্যেই তার স্ত্রী সাইনাম জপ ক'রতে ক'রতে প্রাণত্যাগ করে।

একবার হর্সলি হিলে, রাত্রের আহারের জন্য খাবার ঘরে যাবার সময় বাবাকে দেখে মনে হ'লো তিনি বোধহয় এক্ষুণি "দেহ ছেড়ে" কোথাও যাবেন। কারণ তিনি অস্ফুট স্বরে ব'লছিলেন, "এখনও হাতে কিছুটা সময় আছে।" বাবা খাবার টেবিলে গিয়ে বসলেন এবং আহারের মধ্যেই এক মুমূর্ষু ভক্তকে দর্শন দিতে স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে গেলেন।

কিছুকাল পূর্বে, এক মৃত্যুপথযাত্রী ভক্তকে দর্শন দানের জন্য সূক্ষ্মদেহে যাত্রার সময় বাবা বারবার ব'লতে থাকেন, "জল জল"। তক্ষুণি এক গ্লাস জল এনে তাঁর মুখে ধরা হ'লে তিনি তা লক্ষ্যই ক'রলেন না। তিনি ঐ সময় জল চেয়েছিলেন এই কথা পরে তাঁকে বলা হ'লে বাবা ব'ললেন, "এক মুমূর্ষু ভক্তের মুখে দেবার জন্য আমি অন্য এক জায়গায় জল চাইলাম আর তোমরা কিনা সেই জল আমাকে এখানে দিলে।" ঈশ্বরের লীলা সত্যই বিচিত্র। সেইজন্যই বোধহয় বাবা প্রায়ই বলেন, "আমার লীলা বোঝবার জন্যে তোমাদের সময় ও শক্তি বৃথা নষ্ট ক'রো না। আগে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করো। আগে নিজের প্রকৃতির খোঁজ নাও। তবেই আমাকে জানার সূত্র পাবে।"

সূক্ষ্মদেহে কাউকে দর্শন দিতে বা কারুর কষ্ট দূর ক'রতে, বাবাকে সব সময় যে তাঁর পার্থিব শরীর ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যেতে হয় তা নয়। কখনো এমনও দেখা গেছে যে তিনি বসে কথা ব'লতে ব'লতে একটু স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন এবং ২।১ সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হ'লেন। কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তিনি হয়তো কোথাও গিয়ে কোন ভক্তকে দর্শনদান এবং কৃপাপ্রদর্শন ক'রে ফিরে এসেছেন!

একদিন, চতুর্দশ মনুর এক মনু সম্বন্ধে গল্প বলার মাঝখানেই বাবা ১০ সেকেণ্ডের জন্য স্থূলদেহ ত্যাগ করেন এবং ফিরে এসে আবার গল্প বলা শুরু করেন। অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতাদের মধ্যে মাত্র ২।১ জন ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রেছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাবার ঘরে এক ব্যক্তি প্রবেশ ক'রলে বাবা তাকে জিজ্ঞেস ক'রলেন "তুমি কি টেলিগ্রাম পেয়েছো?" হাবভাবে মনে হ'লো লোকটি টেলিগ্রাম পেয়েই এসেছে। বাবা আবার জিজ্ঞেস ক'রলেন

"কি লিখেছে? প্রসাদের খুব জ্বর, এই তো?" লোকটি তখনও কিন্তু টেলিগ্রামের খাম খোলেনি। সে টেলিগ্রাম সমেত খামটি বাবার হাতে দিল। বাবা খাম ছিঁড়ে টেলিগ্রাম বের ক'রলেন। দেখা গেল এতে লেখা আছে প্রসাদের জ্বর হয়েছে এবং গায়ের তাপ ১০৪° ডিগ্রী। বাবা ব'ললেন, "চিন্তা কোরো না। একটু আগেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ছেলেটির বিপদ কেটে গেছে।" পরে জানা গেল, যে ব্যক্তিটি ঘরে প্রবেশ ক'রেছিল প্রসাদ তার বাড়ীরই ছেলে এবং সেই বাড়ী পুট্টাপর্তী থেকে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত!

বাবা এক জায়গায় হয়তো কথা ব'লছেন, গান গাইছেন বা পদচারণা ক'রছেন, কিন্তু দেখা গেল একই সময়ে অন্য এক জায়গায় কোন ভক্তকে রক্ষা ক'রছেন, প্রহরা দিচ্ছেন অথবা নির্দেশদান ক'রছেন। একদিন প্রশান্তি-নিলয়মে বাবার ঘরে কয়েকজন ভক্ত দরিদ্রদের নবরাত্রিতে বিতরণের জন্য জোড়া ধুতি কেটে পাট করে রাখছিলেন। হঠাৎ বাবা একজন ভক্তকে জিজ্ঞেস ক'রলেন "পার্থসারথী। তুমি হয়তো দেখছো আমি এখানে তোমাদের সাথে বসে হাতে কাঁচি নিয়ে কাপড় কাটছি। তাই না? কিন্তু তুমি কি জান আমি এইমাত্র মাদ্রাজ গিয়ে ফিরে এলাম তোমার কুশকে দেখে? বাচ্চাটির ডিপথিরিয়া হয়েছিল। তোমার দাদা ওকে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে এসেছে। তুমি কিছু চিন্তা ক'রবে না। আমি ওকে দর্শন দিয়ে বিভূতি রেখে এসেছি। সে শীগগিরই ভাল হ'য়ে উঠবে।" বাবার এই কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। পার্থসারথী বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়লো। বাবার শক্তি এবং করুণার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে সে খুবই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল।

বাবার স্বভাবের একটি বিশেষ দিক হ'লো, তিনি নানা রকম মজার মজার কথা ব'লে কৌতুক ক'রতে ভালবাসেন। এই রকম সব অলৌকিক ঘটনাকে বাবা কৌতুক ক'রে বলেন, "আমার ভিজিটিং কার্ড" অর্থাৎ "আমি যে এসেছি তা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া।" বাবা বলছেন যে, তিনিই স্বয়ং ভগবান, সেই একই ভগবান যিনি ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য নিমেষের মধ্যে দেখা দেন। সেই একই ঈশ্বর যিনি মানুষের ব্যাকুল আহ্বানে অবতীর্ণ হন। যেসব মরমুখী দর্শক নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে পুট্টাপর্তী আসেন, তাদের হাতেও বাবা তাঁর অপার করুণার নিদর্শন হিসাবে এই "ভিজিটিং কার্ড" দান করেন।

সারথি

মহাভারতে আছে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অপার করুণাবশত শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হ'তে রাজী হয়েছিলেন। কর্তব্যের আহ্বানের মুহূর্তে অর্জুন মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি অশ্রুপাত ক'রতে ক'রতে ব'লেছিলেন, "আমার হাত পা অবশ হ'য়ে আসছে, জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার হাত থেকে ধনুক পড়ে যাচ্ছে। আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে।" শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে তাঁর কাপুরুষোচিত দুর্বলতার জন্য তিরস্কার ক'রেছিলেন। শোক ও ভ্রান্তিতে, অহঙ্কার ও অজ্ঞানতায়, আমিত্ব ও আমার বোধে অর্জুনের বিবেক আচ্ছন্ন হ'য়েছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মসমর্পণ আর অনাসক্তি যোগ দ্বারা কি উপায়ে সার্থকভাবে বাঁচা যায় সেই গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে অর্জুনের মায়া আবরণ অপসারণ ক'রলেন।

বাবা প্রশান্তি-নিলয়ম থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার নাম দিয়েছেন "সনাতন সারথি।" এই নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বাবাও অবতীর্ণ হ'য়েছেন মানুষকে শোক ও মোহ, এবং অহঙ্কার আর অজ্ঞানতা থেকে উদ্ধার ক'রে পৃথিবীতে ধর্মের পুনঃস্থাপন ক'রতে। মানুষ তার জীবনরথের লাগাম বাবার হাতে তুলে দেবার জন্য যদি ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকে, তবে তিনি তার জীবনরথ পরিচালনার জন্য "সারথি" হবার আশ্বাস দিচ্ছেন। আর এই কাজ, সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে ক'রে আসছেন ব'লে তিনি হ'লেন "সনাতন"।

বাবার তেলেগু ভাষণের মত তাঁর লেখাও সরল এবং স্পষ্ট। বাবার লেখা পড়বার সময় পাঠকের মনে তাঁর অন্তরঙ্গ এবং উদ্দীপনাময়ী ভাষণদানরত চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর রচনা অথবা ভাষণের মাঝে তিনি কোন বিষয়ের ওপর পাঠক বা শ্রোতার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট প্রশ্ন নিক্ষেপ ক'রে তাদের বিষয়টি নিয়ে মনন করার অভ্যাস জাগিয়ে তোলেন এবং পরে নিজেই বিষয়টি

প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। স্নেহমমতাপূর্ণ মিষ্টি সম্বোধনে, তিনি শ্রোতাকে নিজের কাছে টেনে নেন। এবং এইভাবে সাধনপথের তীর্থযাত্রায় তাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেন।

বাবা লিখেছেন, "কত পরিশ্রম ক'রে, কৃষক নিজের হাতে যে বীজ বপন করে, সেই বীজ যদি অঙ্কুরিত না হয়, সেই বীজ থেকে যদি চারাগাছ না বেরোয়, সেই বীজ থেকে ফসল না জন্মায়, তবে কৃষকের মন দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে। ঠিক সেই রকম তোমাদের হৃদয়ে আমি যে সত্যের বীজ প্রতিনিয়ত বপন ক'রে চ'লেছি, সেই বীজ থেকে যদি গাছ না জন্মায় আর তার থেকে ফসল না হয় তবে আমার মনেও দুঃখ হয়। তোমাদের হৃদয়ে আনন্দের সেই ফসলই আমার নিত্য আহার। এই আহারই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। তোমাদের কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু আমার প্রয়োজন নেই তোমাদের পক্ষে এর চেয়ে বড় কাজও আর কিছু হ'তে পারে না। তোমাদেরই কল্যাণের জন্য আমি যে সত্যের বাণী ব'লে চলেছি বা লিখে যাচ্ছি সেগুলি তাচ্ছিল্যভরে ঠেলে ফেলে না দিয়ে যদি তোমরা তোমাদের আচরণে তাকে প্রকাশ করো তবে তার থেকে যে আনন্দ তোমরা আহরণ ক'রবে সেই আনন্দই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, কারণ তোমাদের আনন্দই যে আমার আহার। তোমরা যদি আমার কথা অনুযায়ী প্রতিদিন চলো, তবে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তোমাদের আরো অনেক কিছু বলবো, কারণ এইজন্যেই তো আমি এসেছি।"

বাবার অমৃতবাণী শুনে এবং তাঁর অমৃতোপদেশ অনুসরণ ক'রে চললে প্রত্যেক মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ ক'রতে পারে। এই আত্মজ্ঞান লাভ ক'রবার জন্য চাই প্রয়োজনীয় বিশ্বাস। বাবা বলেন যে মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মাবার জন্যই তিনি তাঁর দেবত্বের নিদর্শনস্বরূপ অালৌকিকত্ব দেখান। তিনি বলেন যে প্রত্যেক মানুষের তাঁর এই অমৃতবাণী শোনবার অধিকার আছে। সেইজন্য যে কোন ব্যক্তি নির্ভয়ে এবং দ্বিধাহীন মনে তাঁর কাছে আসতে পারে। তাঁর কাছে পথের সন্ধান নিতে যারা আসে, তাদের মনের নানা সন্দেহ নিবারণ এবং ব্যক্তিগত সমস্যা দূর ক'রতে বাবা সদা আগ্রহশীল এবং এরজন্য যতবার "ইণ্টারভিউ" দরকার তিনি সানন্দে তা মঞ্জুর করেন এইগুলিই তাঁর অপার করুণা এবং দিব্য মহিমার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

"সনাতন সারথি"তে প্রকাশিত বাবার রচনার প্রতি ছত্রে তাঁর অনন্ত শক্তি, প্রগাঢ় জ্ঞান এবং অসীম কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সতর্ক ক'রে ব'লেছেন যে, বৃহতের পেছনে ছুটতে গিয়ে ক্ষুদ্রকে যেন তুচ্ছজ্ঞান না করা হয়। তাঁর কথায়—"ছোটখাট বিষয়ের ওপরেও সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ছোট ছোট অসংখ্য ব্যাপারকে তুচ্ছ বলে ভাবার ফলে সেগুলি এইভাবে প্রতি মুহূর্তে তোমার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত তোমার মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তোমার চরিত্র আর ব্যক্তিত্বকে নষ্ট ক'রে দেয়। তোমার বুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তখন এগুলির প্রভাবে পড়ে সেইভাবে গড়ে ওঠে। তাই কুপ্রবৃত্তির ফাঁদে পড়ার আগেই তাদের বিরুদ্ধে বীরের মত রুখে দাঁড়াও। আন্তরিক চেষ্টা থাকলে তুমি অবশ্যই জয়লাভ ক'রবে।"

"তোমার কোন দোষ থাকলে অন্য কেউ যদি তা দেখিয়ে দেয় তবে তার সাথে তর্ক ক'রে বোঝানোর চেষ্টা করো না যে সে ভুল ক'রেছে এবং এরজন্য তার বিরুদ্ধে মনে কোন রকম আক্রোশভাবও পোষণ ক'রবে না। নিজের অন্তরেই এর কারণ অনুসন্ধান ক'রবে, ঠাণ্ডা মাথায় নিজের আচরণ পরীক্ষা ক'রে দেখবে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা ক'রবে।

"অন্য কারুর কাছ থেকে মনে আঘাত পেলে কখনও ক্রুদ্ধ হ'বে না। মনে ক্রোধ জন্মালে বিচারশক্তি এবং বিবেচনাবোধ লুপ্ত হয়। তাই এগুলির এক নম্বর শত্রু হ'লো ক্রোধ। ক্রোধ হ'লে কোন নিরালা জায়গায় চলে গিয়ে কিছুক্ষণ ভগবানের নাম জপ ক'রবে, অথবা উচ্চকণ্ঠে ভজন গাইবে। আর দুটির কোনটিও যদি না ক'রতে পারো তবে চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

"তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাই সত্যের পথে চলবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। অন্যের অভিজ্ঞতার কথা শুনে চলতে যেও না। তোমার নিজের অভিজ্ঞতা যতটা খাঁটি হবে, আর কোন কিছু সেরকম হ'তে পারে না।

"সাহস, বিশ্বাস, আশা আর উদ্দীপনা পাথেয় ক'রে এগিয়ে চলো। এর ফলে তুমি পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবে।

"সর্বত্রই মানুষের দুঃখ-বেদনার শেষ নেই। মানুষের কষ্টের বোঝা আরো বাড়ানো কি ঠিক? সমুদ্র ইতিমধ্যেই বিক্ষুব্ধ হ'য়ে আছে, এর ওপরে আবার

তুফান তুলতে কি তোমার মন চাইবে? বরং সকলের মুখে কি ক'রে হাসি ফোটানো যায় তার চেষ্টা করো। তোমার নিজের দুঃখের গান গেয়ে বিলাপ ক'রে এই দুঃখময় পৃথিবীকে আরো ভারাক্রান্ত কেন ক'রবে? তোমার নিজের দুঃখ লাঘব করার জন্য ঈশ্বরর নাম জপ করো, ঈশ্বরের ধ্যানে মন দাও। এই উপায়ে নিজের দুঃখ জয় ক'রে অন্যের সামনে উন্নত আদর্শ স্থাপন করো।"

অবশ্য মনের যে সব প্রবণতা, আবেগ এবং অভ্যাস ক্ষতি ক'রতে পারে সেগুলি বর্জন ক'রে চরিত্রগঠন করা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম পাঠ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রায় এক বছরের বেশী সময় ধ'রে তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি ধ্যান ও তার প্রণালীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে আসছেন। তিনি এগুলিকে বলেন "নিয়মিত রুটিন।"

তিনি বলেন, "তোমার মন যতদিন না তোমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হ'চ্ছে ততদিন একভাবে ধ্যান ক'রে যাবে। মন যখন এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রতে চাইবে তখন খুব সতর্ক হবে। মনের পেছনে দৌড়িও না। মনকে তার মর্জি অনুযায়ী যেখানে খুশি যেতে দাও। এর জন্য মনকে শাস্তি দিতে চেষ্টা ক'রো না। একজায়গায় স্থির হ'য়ে থাকো, মনের পেছনে অযথা ছুটো না। দেখবে, তোমার কাছে প্রশ্রয় না পাওয়ায় মন ক্লান্ত হ'য়ে আপনা থেকে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। মন যেন একটি ছোট শিশু। মা যখন ছোট শিশুর পেছন পেছন ছোটেন, আদর ক'রে তাকে কাছে ডাকেন, মার কোলে ফিরে আসতে বলেন, তখন শিশুটির সাহস বেড়ে যায়। সে আরো একটু দূরে যাবার জন্য পা বাড়ায়। আর মা যখন কোন কথা না ব'লে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যান, তখন শিশুটি মার এই উপেক্ষায় ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সে আর এক পাও এগোয় না এবং একদৌড়ে মার কোলে ফিরে আসে। তাই মনের এই দুরন্তপনায় মাথা ঘামিয়ো না। যে নাম ও যে রূপ তোমার সবচেয়ে প্রিয় সেই নাম জপ করো, সেই রূপের ধ্যান করো। জপ-ধ্যানের যে প্রণালী তোমার সবচেয়ে সুবিধাজনক ব'লে মনে হয়, সেই প্রণালীতেই জপ-ধ্যান করবে। এতেই তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে।"

বাবার প্রতিটি লেখা এই রকম সান্ত্বনা আর উৎসাহবাণীতে ভরা। বাবা বলেন "আগেকার যুগে শক্তিশালী একটি বিশেষ গোষ্ঠী অথবা একটি বিশেষ

ব্যক্তিই নৈতিক অধঃপতনের জন্যে দায়ী ছিল। কারণ অবাধ ও একচেটিয়া শোষণ, নির্যাতন ও দাসত্বের সমগ্র শক্তি এদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তবুও এরা সংখ্যায় কম ছিল ব'লে এদের বিনাশ ক'রে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সে যুগে সম্ভব হ'য়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে দুষ্ট প্রকৃতির লোকে দুনিয়া ছেয়ে গেছে। কাকে বাদ দিয়ে কাকে বিনাশ করা হবে? সেইজন্য আমাকে মানুষের চরিত্র, চিন্তাধারা এবং আচরণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে এবং তাদের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা শিক্ষা দিতে হবে। একতা, সাম্য এবং শান্তির পথে পুনরায় মানুষকে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মনে এই উপলব্ধি জাগাতে হবে যে জগতের সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ ক'রছেন। ঈশ্বরই এই জগতের মূল। ঈশ্বরই জগৎ। ঈশ্বরই কাপড়ের টানা-প'ড়েন, ঈশ্বরই কাপড়ের সুতো, ঈশ্বরই কাপড়—ঈশ্বরই সব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের এই সত্য জানবার অধিকার আছে। এই যুগে, তোমরা বাস্তবিকই ভাগ্যবান যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগের সৌভাগ্য এবং আমার নেতৃত্ব অনুসরণ করবার সুযোগ তোমরা লাভ করেছো—যে নেতৃত্বভার নেবার জন্যই আমি অবতীর্ণ হ'য়েছি।"

যে সব গুরু নাম ও খ্যাতির মোহে আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয় তাদের বিরুদ্ধে বাবা কঠোরভাবে লেখনী চালনা ক'রেছেন। বাবার আবির্ভাবের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'লো এই গুরুদের পুনরায় সত্যের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ে ঘৃণ্য কলহ এবং সংকীর্ণ দলাদলির তিনি তীব্র নিন্দা করেন। বাবা বলেন যে ঈশ্বর কখনও ক্রুদ্ধ বা বিদ্বেষপরায়ণ হন না। তিনি লিখেছেন "ঈশ্বরের সেইসব বর্ণনাকে বিশ্বাস ক'রবে না, যেখানে তাঁকে লোভী, স্বার্থপর, ক্রোধী, ঈর্ষী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ঈশ্বর সমস্ত প্রকার ক্ষুদ্রতা এবং দলাদলির উর্ধে। পাথর ছুঁড়ে অমৃতের পাত্র ভেঙ্গে ফেললে অমৃত গড়িয়ে পড়তে পারে, কিন্তু এতে কি অমৃতের স্বাদ তেতো হ'য়ে যায়? কখনোই না, অমৃতের মিষ্টত্ব কখনো বদলায় না।

"সর্বব্যাপী, সর্বগুণান্বিত, শুদ্ধ আত্মার বর্ণনা নির্ভর করে বক্তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং শ্রোতার তা গ্রহণ করার ক্ষমতার ওপর। সগুণ পরমেশ্বরকে বর্ণনা করবার সময় বিভিন্ন নাম ও রূপ আরোপ করা হয়। সাধক যখন উপলব্ধি করেন যে

সেই পরমাত্মা মানুষের মনের সীমিত ধারনাশক্তি দ্বারা আরোপিত সমস্ত গুণের উর্ধ্বে, তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম আখ্যা দেওয়া হয়।" বাবা তাই বলেন যে, বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের বিবাদের মূলে র'য়েছে পার্থিব প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব। এই মনোভাব নিকৃষ্টমনের ব্যক্তিদের কদর্য আনন্দের খোরাক যোগায়।

সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি-প্রসঙ্গে বাবা সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে সাধু-সন্ন্যাসীদের সর্বপ্রকার কামনা বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ক'রতে হবে—এমনকি, আশ্রম বা সংঘ গঠন করবার বাসনাও। তবেই এঁরা সাধারণ মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা পাবার অধিকার অর্জন ক'রতে পারবেন। এঁরা যে সব আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, সেই আশ্রমের প্রতি এঁদের বন্ধন শেষ অবধি বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায়। কোথায় তাঁরা বন্ধনমুক্ত হবেন, তা না আরো ভাল ক'রে নিজেদের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে নেন এবং এইভাবে ভারবাহী পশুর স্তরে নিজেদের নামিয়ে আনেন। এই ধরনের গুরুদের ক্রিয়া-কলাপ দেখে সাধারণ মানুষ ধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলছে, কারণ এঁরা নিজেদের নামযশ অর্জনের লোভে সমাজের ওপর ক্রমান্বয়ে চাপ সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। এই গুরুদের হাতে অনেক শিষ্য তৈরী হয়। তাই উপযুক্ত শিষ্য তৈরী করবার ব্যাপারে এঁদের দায়িত্ব অনেক। বিশেষ যত্ন নিয়ে এমনভাবে এদের শিক্ষা দিয়ে তৈরী ক'রতে হবে যাতে এরা ধর্মের প্রকৃত রূপ সঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং ঈশ্বরধ্যানে সম্পূর্ণ মগ্ন হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বাবা ব'লেছেন যে, গুরুকে তাঁর যতটুকু প্রাপ্য ঠিক ততটুকু মর্যাদাই দেওয়া উচিত—এর অতিরিক্ত দিলে মস্ত ভুল করা হবে। গুরু তাঁর শিষ্যকে পথ দেখান, তার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং তার কল্যাণ কামনা করেন—এই জন্যই গুরুকে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। এর অতিরিক্ত কিছু করার কোন প্রয়োজন নেই। শিষ্যর মনে এই ধারণা হওয়া উচিত নয় যে তার গুরু সর্বময় এবং সর্বশক্তিমান। এগুলি হ'লো ঈশ্বরের গুণ এবং একমাত্র ঈশ্বরকেই এইরূপে চিন্তা করা উচিত।

বাবা মিতাচারের ওপর সর্বদা গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন—সন্ন্যাসের পথ সরার জন্ত নয়। তিনি বলেন, "দেহ হ'লো ঈশ্বরপ্রদত্ত যন্ত্র। এই দেহকে ভাবভারে বোঝার চেষ্টা ক'রবে। তোমার আজ্ঞা পালন ক'রতে দেহকে বাধ্য

করবে। দেহের কাছে কখনো নত হবে না। দেহের অন্যায় আব্দার কখনো মেনে নেবে না। দেহকে এমন শিক্ষা দিয়ে তৈরী ক'রবে যাতে তোমার কল্যাণের জন্য তাকে কাজে লাগাতে পারো। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার চিহ্ন নজরে পড়ার সাথে সাথে সতর্ক হবে।

সংযম ও শৃঙ্খলা অভ্যাস দ্বারা শরীরকে সুস্থ রাখবে। পরিমিত আহার ও নিদ্রা, সকলের প্রতি প্রেমের মনোভাব, সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা, উদ্বেগ, সাফল্য-অসাফল্য—এসব কিছুর সম্মুখীন হবার মত মনের দৃঢ়তা এবং স্থিরতা—মনের এই গুণগুলি দেহের ব্যাধি সারাতে যে কোন ওষুধের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। এমনকি দেহকে মন থেকে আলাদাভাবে বিচার করবার শক্তি যদি শরীরের কোন রোগের ওপর প্রয়োগ করা হয় তবে এই শক্তি সেই রোগ-নিরাময়ে সাহায্য করে।"

যেসব অতি উৎসাহী সাধকেরা দেহকে উপবাসী রাখতে পরামর্শ দেন বা যেসব নির্বোধ ভোজনবিলাসী রসনা পরিতৃপ্ত ক'রতে চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র জন্য লালায়িত হন, উভয়ের বিরুদ্ধেই বাবা তাঁর লেখনী ব্যবহার ক'রেছেন।

বাবা বলেন যে, গুরু যেমন শিষ্যকে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করেন, সেইরকম গার্হস্থ্য-জীবনের দুঃখ-বেদনা-অশান্তি-উদ্বেগ থেকেই গৃহস্থ ঈশ্বরাভিমুখী উচ্চতর পথে চলবার প্রেরণা অর্জন করে। তাই তিনি সংসারী জীবনের দুঃখকষ্টকে "গুরু" বলে অভিহিত ক'রেছেন। বাবা বলেন যে, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা না থাকলে অনেক সংসারীই তাঁর কাছে ছুটে আসবার প্রেরণা পেত না। কিন্তু একবার তাঁর কাছে এসে পড়লে, একবার তাঁকে দর্শন ক'রলে, একবার তাঁকে জানতে পারলে, এইসব সংসারী, অবতারের সান্নিধ্য ছেড়ে কিছুতেই সংসারে ফিরে যেতে চায় না—এতে তাদের সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হোক বা না হোক। এরা ধীরে ধীরে এই জ্ঞানলাভ করে যে, সংসারের যেসব দুঃখকষ্টকে এরা চিরকাল অত্যন্ত বড় ক'রে দেখে এসেছে, প্রকৃতপক্ষে তার ওপর অতটা গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হয়নি। এই জ্ঞানলাভ করবার পর এরা অধিকতর সাহস আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে এইসব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়। মানুষের সঙ্গে আখের তুলনা ক'রে বাবা লিখেছেন যে, আখ থেকে মিষ্টি রস বের ক'রতে হ'লে আখকে কাটতে হয়, কোপাতে হয় এবং পেষণ

ক'রতে হয়। আখের উচিত এইসব যন্ত্রণা সানন্দে মেনে নেওয়া, কারণ তা না হ'লে আখের ভেতরকার রস শুকিয়ে যাবে এবং এর মিষ্টি স্বাদও আর থাকবে না। সেইরকম, মানুষের পক্ষেও দুঃখকষ্টকে সানন্দে বরণ করা কর্তব্য কারণ এই দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়েই হৃদয়স্থিত আত্মারূপ অমৃতরসের মধুর স্বাদ বাইরে টের পাওয়া যায়। বাবা বলেন, "গয়না গড়াবার ইচ্ছে হ'লে তুমি তো সোনাটুকু ওজন করে স্বর্ণকারের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকো। স্বর্ণকার যখন সেই সোনাকে আগুনে গলায়, হাতুড়ী দিয়ে পেটায় এবং ধারালো যন্ত্র দিয়ে কাটে তখন কি তুমি, সোনা এই তীব্র যন্ত্রণা পাচ্ছে বলে শোকে অভিভূত হ'য়ে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটাও? তা যদি না হয় তবে, ঈশ্বর যখন তোমার ভেতরের খাদ বের করবার জন্যে তোমাকে দুঃখের আগুনে গলান এবং আঘাতের পর আঘাত দেন যাতে তুমি একটি সুন্দর রত্নালঙ্কারে পরিণত হও—তখন তুমি দুশ্চিন্তা করো কেন?"

বাবা হ'লেন এক মহান চিকিৎসক, অবসন্ন মনের উদ্ধারক এবং অদ্বিতীয় চৈতন্যপ্রদায়ক। তিনি সত্যের ওপর সবিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, মিথ্যার ভিত্তি হ'লো কাপুরুষতা। মানুষ যখন কাউকে ভয় পায় বা ঘৃণা করে, কেবল তখনই সে তার কাছ থেকে সত্য গোপন করে। কিন্তু সত্যের ভিত্তি হ'লো আত্মশক্তি। বাবার মতে কোন মানুষের নিজেকে দুর্বল বা শক্তিহীন ভাবা কখনো উচিত নয়। মানুষের প্রকৃত স্বভাবই তা নয়। কেউ যদি একথা বলে যে, "আমি পাপী। পাপের ফলে আমার জন্ম। আমি পাপাত্মা।" তাহ'লে বাবা ভীষণ আপত্তি করেন। এ ধরনের উক্তি তিনি কাউকে ক'রতে দেন না। কোন ভক্ত যদি অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দেন, বাবা তৎক্ষণাৎ তার মনে সাহস সঞ্চার ক'রে বলেন, "যখন আমি তোমার জন্যে এসেছি, তখন এ ধরনের চিন্তাকে কখনো মনে স্থান দেবে না।"

পুণ্যের সাথে শক্তি, পাপের সাথে দুর্বলতাকে, বাবা সমপর্যায়ে ফেলেন। দুর্বলতাই পাপ। বীর্যবত্তাই পুণ্য। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক— তিন প্রকার শক্তিই মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই তিন শক্তির মূল উৎস হ'লো আত্মবিশ্বাস—অন্তরস্থিত পরমাত্মার উপর অটুট আস্থা। বাবা বলেন, "এই সত্য সর্বদা মনে রেখে সেই উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করো। আমার ব্রত

তোমাদের মনে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা এবং শক্তি ও সহনশীলতা জাগ্রত করা যা সেই আত্মবিশ্বাস থেকে আসে। মানুষের অবনতির প্রধান কারণ হ'লো নৈরাশ্য, সেই জন্য প্রত্যেককে সদাপ্রফুল্ল থাকবার অভ্যাস আয়ত্ত ক'রতে হবে। সদাপ্রফুল্ল ব্যক্তির কাছে এই জীবন একটা সুদীর্ঘ উৎসবের মত। ঈর্ষা বা হিংসা মনে পুষে রাখলে তা দেহমনকে কুরে কুরে শেষ ক'রে দেয় এবং জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তোলে। ঈশ্বরের চরণে সুখ এবং দুঃখ দুইই অঞ্জলি দাও। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—সন্তোষ লাভ করবার এই হ'লো গোপন কথা।"

বাবা তাঁর ভক্তদের মন সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত করেন। দশেরা উৎসবের যে দিনটি সমাজ-সেবার জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে, সেইদিন তিনি শিক্ষা দেন কিভাবে পূজো করবার মনোভাব নিয়ে সেবাকাজ করতে হয়। লেখা এবং ভাষণের মাধ্যমে তিনি ব'লেছেন যে, অপরের সেবা ক'রলে আসলে নিজেরই উপকার হয় এবং অপরকে ব্যথা দিলে পরিশেষে নিজেরই ক্ষতি হয়। বাবার কথায় "মানবসেবার জন্য মানবদেহে অবতীর্ণ হ'য়ে স্বয়ং মাধব যখন দেখতে পান যে মানুষ সেবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে, তখন তিনি যে কি ভীষণ খুশি হন তা তোমরা ধারণা ক'রতে পারবে না। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না রেখে জগতের সেবায় লেগে যাও।"

কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভক্ত সেবাব্রত পালন ক'রবে, সে বিষয়ে বাবা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "মনুষ্যসমাজের সেবা করা অতি পুণ্যের কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সেবা ঈশ্বর-পূজোর মনোভাব নিয়ে না ক'রতে পারলে কোন ফল হবে না। সেবা করবার সময় মনে রাখতে হবে প্রত্যেক সেবিতের মধ্যে ঈশ্বর বাস ক'রছেন, তাঁকেই প্রকৃতপক্ষে সেবা করা হচ্ছে এবং তিনিই নানা রূপ ধারণ ক'রে সেই সেবা গ্রহণ ক'রছেন। মানুষের ভেতরের দেবত্বের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই এবং নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তার মধ্যে সেবা নিবেদন করা চাই। ঈশ্বর তোমাকে যে শক্তি, যে জ্ঞান এবং যে দক্ষতা দিয়েছেন, আন্তরিকতাপূর্ণ সেবা-কর্মের মাধ্যমে, ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তনে সেই গুণগুলির সদ্ব্যবহার করো। যেখান থেকেই তোমার কাছে ডাক আসুক না কেন, যে কর্তব্যই তোমাকে পালন ক'রতে বলা হোক না কেন, এই কর্তব্যকর্ম

থেকে পলায়ন করার জন্য কোন অজুহাত দেখিয়ো না। এই প্রকার মানব সেবাই হ'লো সত্যিকারের ঈশ্বরসেবা।"

যুক্তিশূন্য এবং অন্ধবিশ্বাস নিয়ে চলার বিরুদ্ধে বিশদভাবে শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাবা প্রায়ই তাঁর ভাষণের সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করেন। তিনি শ্রোতাদের আহ্বান ক'রে বলেন, "তোমরা আমাকে যে কোন প্রশ্ন নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করতে পারো এবং আমি তার উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত। তবে আমি চাই সেইরকম ব্যক্তিরাই শুধু প্রশ্ন ক'রবে যাদের প্রশ্নের পেছনে আন্তরিকতা আছে। যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ না ক'রলে সারবস্তুর সঙ্গে অসার বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হ'য়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে প্রকৃত ত্যাগের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তুমি যে পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ক'রছো, তোমার আত্মানুসন্ধানের সেই পদ্ধতি সম্বন্ধেও কখনো কখনো তোমাকে বিচার ক'রে দেখতে হবে। কারণ, এমন হ'তে পারে যে, তুমি হয়তো এই যুক্তি দেখিয়ে সর্বদা আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে চ'লেছো যে তোমার অনুসৃত পদ্ধতি ন্যায়সঙ্গত এবং সঠিক। কিন্তু কোন সংস্কারমুক্ত মনের নিরপেক্ষ বিচারের কাছে এসব হয়তো সোজাসুজি অগ্রাহ্য হ'য়ে যেতে পারে।"

শ্রীকৃষ্ণের মত বাবাও সবাইকে বলেন, "অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাৎ ভালভাবে বিবেচনা ক'রবে। নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথাও চিন্তা ক'রবে। তারপর নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। এসব ব্যাপারে কখনও অন্যের কথায় পরিচালিত হবে না, এমনকি আমার নিজের কথাতেও না!

"স্বর্গের প্রবেশদ্বারে তিনজন প্রহরী দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। এদের নাম হ'লো সন্তোষ, শান্তি এবং অনুধ্যান। তোমার পরিচয়পত্র পরীক্ষা ক'রে দেখে সন্তুষ্ট হ'লে তবেই এরা তোমাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেবে। এদের মধ্যে যে কোন একজন প্রহরীকে তুমি যদি সন্তুষ্ট ক'রতে পারো তবেই কাজ হবে —তখন অন্য দুজন প্রহরী তত কঠোর হবে না। অতএব, সন্তোষ, শান্তি এবং অনুধ্যানের যে কোন একটির চর্চা করো। মূলত তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।"

অনুসন্ধানী মন নিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রলে পাওয়া যায় শান্তি, লাভ হয় সন্তোষ এবং আসে আনন্দ। বাবা আমাদের কাছে দাবী জানিয়ে বলেন,

"তুমি কোন্ পথে সাধনা করবার জন্য অধীর হয়েছো, বা আমার কোন্ নির্দেশ তুমি অবিলম্বে কার্যকরী ক'রতে চাও, তা আমার কাছে এসে জেনে যাও। এমন কিছু জিনিসের সন্ধান করো যা লাভ ক'রলে তোমার কষ্ট স্বীকার করা সার্থক হয়।"

বাবার বাণীর মধ্যে সর্বদা একটা জরুরী তাগিদ ধ্বনিত হয়। তিনি বলেন, "সাধনা শুরু করবার লগ্ন এখনই। আগামীকাল যে সাধনা শুরু করার কথা ভাবছো, আজকেই তা শুরু করে দাও এবং আজকের সাধনা আর দেরী না ক'রে এই মুহূর্তেই আরম্ভ করো। বড় হ'য়ে কলা বা বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য শিশুকে কচি বয়স থেকেই 'অ আ ক খ' শিখতে হয়। ঠিক সেইরকম, অধ্যাত্মপথের শিশুকেও অবিলম্বে 'অ আ ক খ' শিখতে হবে এবং লেখাপড়ার অভ্যাস অব্যাহত রাখতে হবে। বৃদ্ধবয়সে বা অন্তিমকালে এই অক্ষরপরিচয় করা কিছুতেই হ'য়ে ওঠে না। মানুষের আয়ু প্রতিমুহূর্তে হ্রাস পাচ্ছে। কালের স্রোতে যে মুহূর্তটি তলিয়ে গেল তাকে আর তুমি কোনদিন দেখতে পাবে না এবং আসন্ন মুহূর্তটিকেও দেখবার সৌভাগ্য তোমার নাও হ'তে পারে। সুতরাং আর দেরী ক'রো না। নিত্য ও শাশ্বত আনন্দ পাবার জন্য এই মুহূর্ত থেকেই তোমার সর্বশক্তি দিয়ে সাধনা শুরু ক'রে দাও।"

যদিও কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি পৃথক এবং সুপ্রাচীন যোগসাধন-প্রণালীর ওপর বাবা অনেক ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রবন্ধ লিখেছেন, তবুও নিত্য ও শাশ্বত এই আনন্দলাভ করবার নানা উপায়ের মধ্যে তিনি নামস্মরণ ও নামজপকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। যোগের এই তিনটি পথের অন্তর্বিরোধ দূর ক'রে মিলনের একটিমাত্র সুরে এদের বাঁধার জন্যেই বাবা আবির্ভূত হ'য়েছেন। তাই তিনি বিশেষ উৎসাহ দিয়ে বলেন, "আমি কখনো এ কথা বলি না যে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের পথ সব ভিন্ন ভিন্ন অথবা এদের মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং একটি তৃতীয় শ্রেণীর পথ। এই তিনটি পথের মিশ্রণও আমি সমর্থন করি না। কর্মই ভক্তি এবং ভক্তিই জ্ঞান। এক টুকরো মিছরির মধ্যে আকার, ওজন এবং মিষ্টত্ব—তিন গুণই আছে। সেই রকম, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রতিটি কর্মের মধ্যে ভক্তির মাধুর্য, সেবার উদ্দীপনা এবং জ্ঞানের শক্তি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

"সর্বাপেক্ষা মহৎ কর্ম হ'লো ঈশ্বরের নাম স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এই কর্ম ক'রলে ভক্তির তীব্রতা বাড়ে এবং সেই তীব্র ভক্তি থেকে অবশেষে জ্ঞানের উদয় হয়। একমাত্র ঈশ্বরই ভক্তকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। যে মায়াবরণ তিনি সৃষ্টি ক'রেছেন একমাত্র তিনিই তা উঠিয়ে নিতে পারেন।

"একটি বস্তু এবং তার প্রকৃতি বা গুণ অভিন্ন। একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না। বস্তু থেকে পৃথক ক'রে শুধু গুণকে কি দর্শন করা সম্ভব? চিনি থেকে তার মিষ্টত্ব অথবা সূর্য থেকে তার আলো কি আলাদা ক'রে দেখা যায়? একইভাবে, ভগবান বা ব্রহ্মেরও দুটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। পৃথক-ভাবে বিচার ক'রলে এই গুণ দুটিকে বলা হয় পুরুষ ও প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁরা পৃথক নন। ব্রহ্মের মধ্যে প্রকৃতি অবস্থান ক'রছেন অব্যক্ত অবস্থায়। ব্রহ্ম থেকে প্রকৃতিকে পৃথক করা যায় না। প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুভব করা যায় শুধু অভিজ্ঞতার সাহায্যে—যেমন চিনির ভেতরের মিষ্টত্ব। ব্রহ্মের ইচ্ছা হওয়া মাত্র প্রকৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করেন এবং তারই ফলস্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ব্রহ্মের এই অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেই যাবতীয় সৃষ্টির উদ্ভব হ'য়েছে। সার্বিক বা নির্দিষ্ট—সব রূপেরই কারণ সেই এক অক্ষর ব্রহ্ম। অখণ্ডরূপ এবং দৃশ্যমান খণ্ডরূপ—উভয়েরই কারণ সেই এক পরমেশ্বর। অব্যক্ত, অদৃশ্য হ'লেও, ব্রহ্মের পূর্ণতা কিন্তু এর ফলে হ্রাস পায় না। পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ ক'রলেও পূর্ণই অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।"

বাবা দর্শনশাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল নানা সমস্যার বোধগম্য সমাধান ক'রে দেন। দীর্ঘ সময় ধ'রে বিস্তারিতভাবে কোন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শেষ করবার পর তার সারমর্ম, বাবা কখনো কখনো ক্ষুদ্র উপমা, রূপক, ছোট ছোট নীতিগল্প বা কবিতার সাহায্যে এমন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন যে শ্রোতার অন্ধকার মন নিমেষের মধ্যে সমাধানের আলোকে প্লাবিত হ'য়ে যায়।

এক কথায় ব'লতে গেলে, প্রত্যেক মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রত্যেককে এক নিষ্ঠাবান সাধকে পরিণত করার জন্ত বাবা মানবদেহ ধারণ ক'রে আমাদের মাঝে অবতরণ ক'রেছেন। তাঁর ভাষায়, "একমাত্র সেইসব মানুষই এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধ ক'রতে পারে এবং সারা বিশ্বে শান্তি আনতে পারে, যাদের

হৃদয় পবিত্র এবং যাদের মন বিদ্বেষ ও উত্তেজনায় কাম ও ক্রোধ এবং হিংসা ও লোভ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত।"

ব্রতারম্ভ

১৯৬০ সালের দশহরা উৎসবে উপস্থিত সহস্র সহস্র ভক্ত আজও নিশ্চয়ই নিজের স্বরূপ ও ব্রত সম্বন্ধে বাবার শিহরণকারী ভাষণসমূহ স্মরণ করেন। প্রথম দিনেই হাসপাতাল দিবস উৎসবে বাবা বলেছিলেন যে অশিক্ষিত সরল ব্যক্তিদের বেদান্তের দুর্বোধ্য তত্ত্ব জোর করে সেবন করানো সময় ও উদ্যমের অপব্যয় মাত্র। শিক্ষক ও গুরু তাদের ধীরে ধীরে বর্তমান অবস্থা থেকে অগ্রসর হবার প্রেরণা দেবেন। একটির পর একটি বদভ্যাস ত্যাগ করবার, একেবারে একটি পদক্ষেপ দেবার, জপ ও ধ্যানের সময় বর্ধিত করবার উৎসাহ দেবেন।

পর পর তিন দিন বাবা তাঁর নিজের ও আরব্ধ ব্রতের বিষয় বলেছিলেন; বিদ্বান দুপতি থিরুমালচারলু কর্তৃক 'শ্রী সত্য সাই গীতা' নামক তেলেগু কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা তাঁকে প্রয়োজনীয় পটভূমিকা রচনা করে দিয়েছিল। বাবা ঘোষণা করেছিলেন, তিনি শরণাগতির সেই সনাতন বাণী ঘোষণা করতে পুনরায় এসেছেন। "মেঘ যেমন সূর্যের মহিমা আবৃত করে দেয়, তেমনি সংশয় ও মোহ আমার মহিমাকে তোমাদের উপলব্ধি থেকে আড়াল করে রেখেছে"—তিনি বলেছিলেন। অর্জুনের ন্যায় প্রত্যেকে অজ্ঞানপ্রসূত মোহ পরিত্যাগ করে অহং ও আমিত্বের শৃঙ্খলমুক্ত হোক, তাই তিনি চান। তিনি বলেছিলেন, 'প্রেম হল বীজ, ভক্তি অংকুর, সার হল বিশ্বাস, সৎসঙ্গ বৃষ্টি, আত্মসমর্পণ ফুল, মিলন হল ফলস্বরূপ'।

তিনি বলেছিলেন, 'পূর্ববর্তী লোকেদের থেকে তোমরা অনেক বেশী ভাগ্যবান, কারণ পরিচালক ও রক্ষকরূপে তোমরা আমাদের পেয়েছ, তোমাদের প্রতি আমি লক্ষ্য রাখছি, ভুল পথে গেলে সতর্ক করছি। এই সুযোগের যোগ্যতম ব্যবহার করো, ব্যাঙের মত পাশের প্রস্ফুটিত পদ্মফুলকে

উপেক্ষা করে লাফালাফি করো না, কিন্তু মৌমাছির মত হয়ো, যারা সুদূর থেকে, নিকট থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে এর সুধা পান করে।' এ ধরণের দিব্যত্বের মহিমায় অনুরণিত ও তাঁর ছায়ার আশ্রয় নেবার জন্যে আহ্বানকারী বাণী বাবার প্রতিটি দিব্যভাষণেই অজস্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। 'বিশ্বাসই বিশ্বাসের পুরস্কার ; এর দ্বারাই সত্য প্রকাশিত হবে। কৃষ্ণকে কেবল মাত্র রাখাল ছেলে ভাবলে, শুধু কৃষ্ণই নয় তুমি নিজেও রাখাল বালকের স্তরে নেমে আসবে। তাঁকে তোমার মনের মন্দিরে অধিষ্ঠিত প্রভু এবং তোমার সারথি বলে ভাববে।' তিনি বলেন, 'ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে অস্বীকার, সন্দেহ বা দ্বিধা করো না—যখন তিনি তোমাদের প্রার্থনায় এত সহজেই তোমাদের নিকট সুলভ হয়ে ধরা দিয়েছেন'।

'অবতারের পূর্ণ স্বরূপ তোমরা ধারণা করতে পারবে না, কিংবা প্রস্তুতি-কালের আগে আমার পূর্ণ জ্যোতি সহ্য করতে পারবে না, তাই আমি বিভূতি সৃষ্টির মত আমার মহিমার অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র প্রকাশ করে থাকি।' এক দিন তিনি বলেছিলেন, 'না, প্রলোভন ছড়িয়ে লোককে আমার প্রতি আকর্ষণ করা আমার স্বভাব নয়। কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই আমি আনন্দ বর্ষণ করি, তার জন্যেই আমি 'অলৌকিক'-এর মধ্যে প্রকাশিত হই।' যে যবনিকা তাঁর ঈশ্বরত্বকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে তা তুলে দিয়ে তিনি আর একদিন বলেছিলেন, "কিছু অজ্ঞ লোক আমার সম্বন্ধে বলে যে আমার নাকি দুটো সত্তা রয়েছে, অধিকাংশ সময় দেবত্ব, বাকী সময় মনুষ্যত্ব। কিন্তু বিশ্বাস রেখো, যে আমার ভেতর একটিই 'ত্ব' রয়েছে, ঈশ্বরের পরিবর্তন বা তরলীভবন হয় না। আমি তোমাদের একথা বলছি কারণ, তোমাদের সঙ্গে আমার এক উচ্চতর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে যা দর্শনার্থী ও দর্শিতের ভেতরকার সাধারণ সম্পর্ক নয়।"

আর একদিন সতর্ক বাণীর সুরে বললেন, "আমি আবার তোমাদের ভণ্ড শিক্ষক বা প্রতারক গুরু সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। অনেক লোক আছে, যারা সমাধি অবস্থার অনুকরণ করে, দিব্য ভাবাবেশের ভান করে, অন্যদেরও ঐ ভাবাবস্থা দান করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা কৃত্রিম সমাধিবস্থার মধ্যে বক্তৃতা দেয়, নাচে গান করে, আর বলে এ হল কৃষ্ণ-ক্রীড়া বা রাস-ক্রীড়া।

এই সমস্ত পরিকল্পনার জন্যে কঠিন বেত্রাঘাতই তাদের প্রাপ্য।" 'এদের থেকে দূরে থেকো', তিনি বলেছিলেন।

মহীশূরে ১৯৬১ সালের গুরু পূর্ণিমার দিন বাবা সকলকে ঐ শ্রেণীর গুরুর প্রতি সতর্ক নজর রাখতে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদের কণামাত্র লোভ, অহমিকা, গর্ব ও শঠতার বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন। 'যে সমস্ত গুরু শিষ্যদের নিকট কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যে সব সন্ন্যাসীগণ আরাম বিলাস ও যশের প্রতিযোগিতা করে তাদের নির্মূল করবার সময় এসেছে।' তিনি বলেন, 'আমি শীঘ্রই এই কাজে আত্মনিয়োগ করব। আমার আগমনের এও অন্যতম উদ্দেশ্য।' তিনি ঘোষণা করেন, যে সমস্ত সন্ন্যাসী সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করেছে, সংসারতরীকে ভস্ম করে দিয়েছে, তাদের জন্মদিন পালন করা উচিত নয়, ধনীদের দান ও ফাণ্ড তৈরীর জন্যে উত্যক্ত করা ঠিক নয়; উচ্চ উপাধি দিয়ে, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রশংসা মাধ্যমে ভক্তদের অহমিকার প্রশ্রয় দেওয়া তাদের অনুচিত; সন্ন্যাসীদের জন্যে নির্দিষ্ট কঠোর নিয়মের শিথিলতা শুরু হলে অবশ্যম্ভাবী পতন রোধ করা যায় না। আমার ব্রতের প্রথম প্রয়োজন হল সন্ন্যাসীর ধর্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, কারণ সন্ন্যাসীই সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং তিনিই আধ্যাত্মিক আদর্শ দৃঢ় হস্তে ধারণ করে থাকেন। তিনি যদি আপোষ করেন এবং লক্ষ্য পথ থেকে নামতে শুরু করেন তাহলে ধর্ম সকলের উপহাসের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে।

নভেম্বরে তাঁর জন্মদিনের ভাষণে সেই সংকল্পই ধ্বনিত হয়েছিল। পুত্তাপর্তীর গ্রামবাসীদের বিরাট সমাবেশে তিনি বলেন, "কুড়ি বছরের বেশী সময় ধরে তোমরা শুধু দূর থেকে আলো দেখেছো, তার উষ্ণতায় উপকার লাভ করোনি, কারণ তোমরা কাছে আসবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করোনি। কিন্তু আমি জানতাম যে এই দিন আসবে এবং তোমরা সব সন্দেহ ও ভ্রান্তি ত্যাগ করে শান্তি ও আনন্দের পথ চিনতে পারবে। আমার কথা বিশ্বাস কর, এই পুত্তাপর্তী অবিলম্বে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে। সহস্র সহস্র যোগী, সাধু ও সাধক শান্তি ও মুক্তি কামনায় এখানে আসবেন। সনাতন ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা এই স্থান থেকে হবে।"

মহা শিবরাত্রির দিনে তাঁর বাণীর বিশ্বজনীন আবেদন সম্বন্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে

ব্যক্ত করেন এবং ঘোষণা করেন যে সমগ্র মানবসমাজের জন্যেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন একজনও নেই যে আমার নয়; সকলেই আমার; তারা আমার নাম বা কোন নামই না ডাকতে পারে, তবুও তারা আমার।"

এই গভীর অর্থব্যঞ্জক বাক্যের মর্ম ও গুরুত্ব কোয়েম্বাটুরে প্রমাণিত হল, প্রসিদ্ধ নাগ সাই মন্দিরে বাবা যখন তাঁর পূর্ব শরীর সির্দি সাই বাবার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যিই তা হল এক ঐতিহাসিক ঘটনা, ১৯৬১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঐ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাগ সাই মন্দির নামকরণের কারণ এখানে অগণিত ভক্তকে সির্দি সাই বাবা নাগ (গোক্ষুর সাপ) রূপে দর্শন দিয়েছিলেন। ফুলের স্তূপ থেকে বেড়িয়ে এসে বহুক্ষণ ভজন শুনে এমনকি. অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্যে ফটো তোলবার জন্যে ভঙ্গীমা করেছিল। এই অদ্ভুত ঘটনা ১৭ বছর আগে ঘটেছিল এবং সেই থেকে এই মন্দির কোয়েম্বাটুর সহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সহস্র সহস্র অধিবাসীর আত্মিক প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। এই অনুষ্ঠানেই বাবা প্রথম নিত্যপূজার জন্যে তাঁর পূর্ব-অবতারের মূর্তি স্থাপন করছিলেন সেই হেতু ভক্তগণ তার নিকট থেকে সেদিন বিশেষ কোন ঘোষণা শুনবার জন্যে উদগ্রীব ভাবে প্রত্যাশা করছিল।

তারা কিন্তু নিরাশ হয়নি। বাবা বলেছিলেন, "এটা সত্যিই মজার ব্যাপার, তাই নয় কি, যে আমি আমার নিজেরই মূর্তি স্থাপন করছি। একটি বিশেষ কারণেই আমি তা করছি। আজকের দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবার যোগ্য, কারণ এই অনুষ্ঠান এক নতুন যুগের সূচনা করল—'সত্য সাই যুগ', যখন সাই সকলের হৃদয়-স্থায়ী, অন্তরের পরিচালক শক্তি হয়ে উঠবেন। এই রকম অবতার কর্তৃক ঈশ্বরের মূর্তি স্থাপনার আর একটি মাত্র উদাহরণ রয়েছে, (রাম যখন রামেশ্বরে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাক্ষস বিনাশের প্রাথমিক কাজ হিসেবেই তা করা হয়েছিল। অবতারের অপর কর্তব্য—ধর্মসংস্থাপনা—জগতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার সূচনা হিসেবেই আমি এই কাজ করলাম।"

প্রকৃত নব যুগ প্রবর্তনের ঘোষণা! প্রেম ও ন্যায়, শান্তি ও সাম্যের নতুন যুগ সূচনার ঘোষণা করছে এই বাণী! সত্য সাই পতাকাতলে সমবেত হবার জন্যে মানব জাতির প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান!

আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই মহান ঘোষণার পরদিন উদুমালপেট-এ বাবার সম্বর্ধনা হয়েছিল বিপুল সমারোহের মাধ্যমে। সেখানেও বাবা জগতকে ডাক দিলেন ধর্মের আসন্ন মহাজাগরণে অংশগ্রহণ করতে।

বাবা বহুবার বলেছেন যে কোন তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতা ভক্তরা সঙ্গে যে ভক্তি নিয়ে আসে ও বিগ্রহের নিকট প্রার্থনার আন্তরিকতার উপর আনুপাতিক হারে নির্ভরশীল। কিন্তু বাবা স্বয়ং যখন কোন তীর্থস্থানে যান তখন তার প্রতিক্রিয়া হয় গভীরতর ; যেন পবিত্রতার আধার থেকে নিষ্ক্রিয় কোন ব্যাটারীতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল। বাবা বলেছেন যে তাই হয়ে থাকে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যেই তিনি কতিপয় বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়ান। সুতরাং মাদ্রাজে অল্পদিন অবস্থানের পর তিনি অযোধ্যা ও কাশী যাবার পরিকল্পনা করছেন শুনে সকলের মহা আনন্দ। ২৩শে মার্চ পেরাম্বার রেলওয়ে ষ্টেডিয়ামে এক বিরাট জনসভায় বাবা ভাষণ দিলেন। সারাক্ষণ জনতার স্তব্ধ আগ্রহ দেখে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডাঃ বি. রামকৃষ্ণ রাও ঘোষণা করলেন, "স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি সত্বেও দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে দেশে আনন্দ, সন্তোষ, শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের বিশেষ প্রকাশ না দেখে এতদিন আমি অত্যন্ত দুঃখবোধ করেছি, কিন্তু আজ আবার আমি আশান্বিত হয়েছি। এই বিশাল সমাবেশ, বাবাকে যে সম্বর্ধনা আপনারা জ্ঞাপন করেছেন, যে একাগ্রতা সহকারে আপনারা তাঁর বক্তব্য শুনলেন তা আমার নিকট ব্যক্ত করেছে যে এই জাতির নৈতিক উন্নতি সুনিশ্চিত।"

ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও বাবাকে লক্ষ্ণৌ যেতে আমন্ত্রণ জানালেন ; এবং তিনি সেখানে থাকাকালীন, লক্ষ্ণৌর নাগরিকদের রাজভবনের ভজন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্মতি দিয়েছিলেন, তার ফলে অনেকে বাবার আশীর্বাদ ও তাঁর কাছে উচ্চতর জীবনের প্রথম সোপানে পদার্পণের দীক্ষা লাভ করে। ভাগ্যবান কয়েকজনের নিকট তাঁর উপস্থিতি অলৌকিক ঘটনাসমূহের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল এবং সেগুলি তাদের তাঁর সমীপে নিয়ে এসেছিল। অন্ধ্র সমিতি, তামিল সঙ্ঘ, কেরালা সমিতি ও মহীশূর সমিতির উদ্যোগে টাউন হলে আয়োজিত এক সভায় বাবা ভাষণ দেন। এই সমস্ত সমিতি হয়ত ভেবেছিল

যে বাবা যেহেতু দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছেন সুতরাং তাদের তাঁকে সম্মান জানানো উচিত। বাবা ঐ সমস্ত সমিতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ছোট পরিধির প্রতি বিশ্বস্ত বিভিন্ন সংস্থার পরিবর্তে একটি সৎসঙ্গ স্থাপন করতে যেখানে নিজেদের উন্নতিবিধানে ইচ্ছুক সৎ ব্যক্তিগণ বিধি-নিয়মানুসারে জপ, ধ্যান ও সেবাকার্যে নিযুক্ত হতে পারে। এই প্রস্তাবের পেছনে যেহেতু বাবার সংকল্প বিদ্যমান ছিল, তাই অচিরেই 'সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠা হল এবং বাবা স্বয়ং লক্ষ্ণৌ সহরে সমতান, ঐক্য ও আধ্যাত্মিক সৌভ্রাতৃত্বের এক নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন করলেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে ছোট এক ভক্তদল নিয়ে বাবা অযোধ্যা গেলেন। রামায়ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অতীতের দিব্য ঘটনা দ্বারা পবিত্রিত স্থানগুলো তাদের দেখালেন। তিনি বললেন যে এখনও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের হৃদয়ে অতি গভীরভাবে ভক্তি প্রোথিত আছে, কারণ তাদের অন্তর থেকে অবিরাম উৎসারিত রামনাম শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি রামের মন্দিরে গিয়ে বলেছিলেন যে মহাজাগতিক মূর্তিতে যা কিছু রয়েছে তার সবটুকুই অক্ষয় ও অনাবিল ভাবে সীমিত রূপেও লাভ করা যায়; শুধুমাত্র শাস্ত্র-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান, প্রার্থনার আন্তরিকতা, পরিবেশের বিশুদ্ধতা এবং আগত ভক্ত পুরোহিত ও অর্চকের পবিত্রতার মাধ্যমে নিয়ত তাতে শক্তি সঞ্চারিত করতে হয়। "ঈশ্বরকে অযোধ্যা অথবা দ্বারকাবাসী রূপে অর্চনা করা হয়, যেন অপর কোথাও নেই; এটি ভুল ধারণা। তিনি সর্বত্র আছেন। তাঁকে সীমাবদ্ধ করার অর্থ হল তাঁর মহিমাকে, পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করা। ভক্তদের অধিকতর ঐকান্তিকতা অথবা করুণাবশতঃ স্বয়ং ঈশ্বরের মাধ্যমে পবিত্র স্থানের প্রভাব বর্ধিত হয়ে থাকে।"

সরযূনদীর তীরে বাবা ভক্তদের আশীর্বাদ করেন এবং তাদের নিয়ে হনুমানের মন্দিরে গেলেন। পুরাণ কাহিনী অনুসারে রাম স্বয়ং এই মন্দির দান করেছিলেন যাতে হনুমান চিরকালের জন্যে সদা রাম নামে অনুরণিত এক রাজ্য স্থাপন করতে পারেন। রামমন্দিরে নিবেদিত পবিত্র প্রসাদ বাবা ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করলেন যার ফলে বাবারই ভাষায়, 'সাই রাম' কর্তৃক প্রসাদ পবিত্রতর হয়ে উঠেছিল।

সেই রাত্রেই বাবা মোটরযোগে অযোধ্যা থেকে সারনাথে পৌছুলেন এবং ২রা এপ্রিল সদলে কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দির দর্শন করলেন। যে মন্দির ইতিহাসে, উপাখ্যানে, সংগীতে, কাব্যে, মহাকাব্যে ও পুরাণে চারণকবি ও সাধু সন্তের দ্বারা অমর হয়ে আছে—বিশ্বেশ্বরের, বিশ্বের প্রভুর, মহা মন্দির। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী যুগ যুগ ধরে পবিত্র গঙ্গাবারি দ্বারা ভক্তিপ্লুত চিত্তে এই মন্দিরের লিঙ্গমূর্তিকে স্নান করিয়েছে; বারাণসীর প্রতিটি ধূলিকণাকে অতি পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। এখানে দেহান্ত হলে জন্মমৃত্যুর দুঃখের অবসান ঘটে বলে ধরা হয়।

বাবার সঙ্গে এই মন্দিরের মধ্যে একত্রে অবস্থান করা সত্যিই এক দুর্লভ ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিপূর্ণ; কারণ তিনিই স্বয়ং শিব, তাঁর মহিমার চকিত আভাস যারা পেয়েছে তারা তাই জানে। আমরা সকলে প্রত্যাশায় ছিলাম বাবা এই মন্দিরের শুচিতা বর্ধনের জন্যে, অহমিকা ও সন্দেহজনিত অবক্ষয় পরিপূর্ণ করবার জন্যে কোন কিছু কোন অলৌকিক কিছু করবেন।

আমরা যখন লিঙ্গমূর্তিকে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করাচ্ছিলাম ও বিধিমত মন্ত্রোচ্চারণ করছিলাম বাবা তা লক্ষ্য করছিলেন। তারপর আকস্মিক সিদ্ধান্তে যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এগিয়ে এলেন এবং বিভূতি 'সৃষ্টি' করে গোলাকৃতি লিঙ্গমূর্তির তিন চতুর্থাংশ জুড়ে তিনটি প্রশস্ত রেখা এঁকে দিলেন—অদ্ভুত দীপ্তিতে মূর্তি ঝলমল করে উঠল। আর একটি অলৌকিক ঘটনা অপেক্ষা করছিল, কারণ তিনি স্বর্গীয় সুগন্ধ ও রূপযুক্ত চন্দনের কাই 'সৃষ্টি' করে, হাতে নাড়াতে নাড়াতে একটি আকৃতিতে এনে লিঙ্গের দিকে এগিয়ে এসে বিভূতির তিনটি রেখার মধ্যস্থলে লেপন করলেন। পূজারী ও দর্শকগণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু আমরা জানি বাবা এক গভীর তত্ত্বযুক্ত অনুষ্ঠান করছেন যা তাদের শ্রদ্ধার নাগালের চেয়েও নিগূঢ়। তারপর সেই দিব্যহস্তের পুনঃসঞ্চালনে এ অমূল্য বস্তু সৃষ্টি করলেন যার প্রভায় মন্দির-গর্ভ অপূর্ব দীপ্তিময় হয়ে উঠল। তা ছিল রত্নখচিত 'ওঁ' প্রতীক, পরিধির চারপাশে ঘিরে পদ্মরাগ মণি বা চুনী, হীরক দিয়ে তিনটি বিভূতি রেখা ও বিভূতির কেন্দ্রে মরকত মণি, যেন চন্দন কৌটার প্রতীক, শিল্পীসুলভ নৈপুণ্যে ওম্-এর চারপাশে বিল্বপত্রের ন্যায় পান্নার তৈরী সবুজ বর্ডার, সর্বোপরি স্বর্ণনির্মিত ফুলের উপর দীপ্তিময় হীরকের তৈরী

ওম্। ভক্তদের অন্তস্তল থেকে স্তুতিগান উৎসারিত হল এবং সমবেত কণ্ঠের ওম্ শিবায় ধ্বনি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে মন্দির পূর্ণ হয়ে উঠল। লিঙ্গের উপর পূর্বে প্রলেপিত চন্দনে ওম্-টি স্থাপন করে বাবা আরতি আরম্ভ করতে বললেন। সেদিন সকালে ভারতের মন্দির সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ইতিহাস বিখ্যাত মন্দিরের ঐ অনুষ্ঠানের যারা দর্শক ছিলেন—তার ঐ মহান দৃশ্য সারা-জীবনে বিস্মৃত হবে না।

এর পর বাবা তাঁর দলের সকলকে শ্রীরুদ্রমন্ত্র আবৃত্তির সঙ্গে গঙ্গাজলে বিশ্বনাথকে অভিষেক করবার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি তাদের অন্নপূর্ণা মন্দির ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিশ্বনাথের মন্দিরে নিয়ে গেলেন। শেষোক্ত স্থানের মন্দিরের মধ্যেকার চিত্র ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে বাবা ব্যাখ্যা করে বললেন। বেদ ও পুরাণের যে ঘটনাবলী সেখানে চিত্রিত আছে তার অলিখিত ব্যাখ্যা একমাত্র তিনিই জানেন।

৩রা এপ্রিল বাবা এলাহাবাদে পবিত্র সঙ্গমকে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গম) নিজের উপস্থিতির দ্বারা ধন্য করলেন এবং স্বহস্তে পবিত্র বারি সকল তীর্থযাত্রীর উপর বর্ষণ করলেন। তারপর এমনকি হুয়েন সাঙ্ বর্ণিত কেল্লার ভেতরকার যমুনা নদীর দিকের দেওয়ালের ধারে অবস্থিত সরস্বতী কূপ. হনুমান মন্দির এবং অক্ষয় বট দর্শন করেন। ত্যাগরাজ উৎসবে সভাপতিত্ব করবার জন্যে একদিন তিরুপতিতে অবস্থান করে বাবা ৮ই এপ্রিল পুত্তাপর্তীতে ফিরে এলেন।

তিরুপতিতে তিনি প্রতিমা ও প্রতিমাপূজার সম্বন্ধে বললেন, কারণ উত্তর ভারত পরিক্রমায় ঐ বিষয়ে কিছু বক্তব্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। "সাধক দেখবে প্রতিমার অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে, বাইরের পাথরকে নয়। মূর্তির অন্তর্নিহিত চৈতন্য, যে চৈতন্যের প্রতীকই হল মূর্তি, তাই আবার সাধকের অন্তর্নিহিত চৈতন্য এবং তা সমস্ত সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত গতিশীল এবং সৃষ্টিকে অতিক্রম করে থাকে। এ সত্য উপলব্ধি করলেই মূর্তি ও মন্দির উপাসনা সার্থক ও কল্যাণকর হয়।" "অনেকে মূর্তির উপাসককে উপহাস করে থাকে এবং মূর্তিপূজাকে অন্ধ কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু প্রকৃত অভিজ্ঞতার নিকট যুক্তিতর্ক মূক হয়ে যায়। ন্যায়শাস্ত্র যত যুক্তি তৈরী করতে পারে, যত পদ্ধতি ও যুক্তি কৌশল

খাড়া করতে পারে, সব কিছুই প্রমাণের ফলকে নস্যাৎ করতে অক্ষম। প্রতিমা শুধু বহিরঙ্গ বা যন্ত্র বা বস্তু নয়। তা আত্মোপলব্ধি লাভের আন্তর-যন্ত্রাংশ। প্রতিমা চিন্ময় এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পূজা করলে, তা পরমানন্দ প্রদান করতে পারে।"

মাত্র এক সপ্তাহ পুত্তাপর্তীতে অবস্থানের পর বাবা নীলগিরি যাত্রা করলেন। সেখানকার লোক তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা ও সেবা করবার সৌভাগ্য লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল। সেই শ্রদ্ধার্পণ সভায় দূরবর্তী উপত্যকার ক্ষুদ্রতম কুটির থেকে সর্বাপেক্ষা বিত্তবান ভূস্বামী পর্যন্ত সমগ্র নীলগিরির অধিবাসীগণ যোগ দিয়েছিল। বাবা আশেপাশের গ্রামগুলিও পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানকার রায়তদের আন্তরিকতা ও সরলতা এতই মর্মস্পর্শী ছিল যে বহুদিনের ভক্তগণ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাবা নিজেই একথা ব্যক্ত করেছিলেন। উটাকামণ্ডের সাধারণ সভায় তিনি বললেন, "এখানের লোকেরা ভক্তিতে পরিপূর্ণ এবং সেই ভক্তি তাদের বিনয় ও শ্রদ্ধায় ভূষিত করেছে।" প্রতি গ্রামে তিনি অধিবাসীদের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তারা শরীর পুষ্টির জন্যে যে চেষ্টা করে থাকে, আত্মিক পুষ্টির জন্যেও অনুপুরক প্রচেষ্টা চালাতে।

বাবা যার নামকরণ করেছেন পবিত্র গিরি ; সেই নীলগিরি পর্বতমালা আনত হলো বাবার চরণে, আত্মসমর্পণের আকুতিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল অচনাকলের এক প্রবীণ কর্তৃক স্বরচিত গানের মাধ্যমে, "হে আমার ভাইয়েরা, এস! এই জলঝরা, জঞ্জালভরা, ভঙ্গুর আশ্রয় আমার প্রকৃত আবাস নয় ; আমাদের গৃহ শাশ্বত, বিশ্বব্যাপী ; তা চিত্রাবতী তীরে অবস্থিত, নাম তার প্রশান্তি নিলয়ম—শান্তির আগার।" কিংবা ইথালারের গ্রামবাসীগণ কর্তৃক আগ্রহের সঙ্গে পরিবেশিত লোকসঙ্গীতটি শ্রবণ কর, "প্রভু এসেছেন, সূর্যের মত জ্যোতির্বলয় নিয়ে, আমাদের কৃপা করতে। তিনি এই গিরিমালার মধ্যেই অবস্থান করছেন—শিরে রূপালী চাঁদের মুকুট। পাহাড়ের রাস্তায় তিনি উপরে নীচে, চতুর্দিকে বিচরণ করছেন প্রতিটি আর্ত হৃদয়কে করুণার দ্বারা স্পর্শ করতে ও প্রতিটি সহর ও ক্ষুদ্র পল্লীকে মাভৈঃ বাণী দ্বারা আশ্বাস দিতে।"

নীলগিরিতে অবস্থানকালেই বাবা হিমালয় যাত্রার আয়োজন করছিলেন এবং নির্বাচিত ভক্তদের সেই সৌভাগ্যময় অভিযাত্রীর দলে যোগ দেবার জন্যে

নির্দেশ দেন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ হয়ে পুট্টাপর্তীতে ফিরে আসেন।

তিন বছর আগে চিত্রাবতী নদীর তীরে বালুকার উপর অনুষ্ঠিত এক ভজনের সময় বাবা প্রথম বদ্রীনারায়ণ যাত্রার প্রস্তাব করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ভক্তদের তাঁর তপস্যাক্ষেত্রে (!) নিয়ে যাবেন এবং আমরা বিস্ময়াভূত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ঐ প্রথম আমরা বাবার এই পার্থিব জীবনের সঙ্গে তপস্যা কথাটির যোজনা শুনেছিলাম। আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম! কারণ বাবা এখানে বা অপর কোথাও দৈহিক বা সূক্ষ্মভাবে তপস্যার অনুষ্ঠান করেননি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম! কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন উত্তর পাইনি।

মে মাসের শেষে বদ্রীনারায়ণে যাওয়াটা পাকা হয়ে গেল, পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেল, সহযাত্রী নির্বাচন সারা। দলের সকলকে মাদ্রাজে ৭ই জুন সম্ভাষণ জানালেন এবং ট্রেন যোগে তাদের দিল্লী পাঠিয়ে দিলেন এবং পরদিন তাদের সঙ্গে রাজধানীতে দেখা করবেন বললেন কারণ তিনি বিমানে পরদিন যাত্রা করবেন।

ট্রেন ৬ ঘণ্টা দেরীতে দিল্লী পৌঁছুল; এবং ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত ভক্তগণ অবশেষে দিল্লী নামলে বাবা তাঁর স্মিত হাসি ও মাতৃসুলভ যত্ন দিয়ে তাদের শান্ত স্বাচ্ছন্দ্য, সান্ত্বনা ও শক্তি প্রদান করলেন। পরদিন হরিদ্বারে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডাঃ বি, রামকৃষ্ণ রাও বদ্রীনাথে যাবার জন্যে বাবার সঙ্গে যোগ দিলেন। ১১ই জুন বাবা এবং মহামান্য রাজ্যপাল ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গামাতার আরতি দর্শন করেন; সেই পবিত্র স্থানে সমাগত বহু তীর্থযাত্রী বাবার পুণ্য দর্শন লাভ করলো। বাবা আহরিত বিভূতি দিয়ে পূজারীদের আশীর্বাদ করলেন এবং সকলের মাথায় পবিত্র গঙ্গাবারি বর্ষণ করলেন।

সেই রাত্রে বাবা তার সহযাত্রী ভক্তদের একত্র আহ্বান করে স্মরণ করিয়ে দিলেন কি দুর্লভ সুযোগ তারা লাভ করেছে। "তোমাদের ভাগ্য ভাল যে ব্যক্ত স্বরূপের সঙ্গে তোমরা অব্যক্ত সত্তার কাছে যাচ্ছ। সাধারণতঃ মানুষ প্রতিমার মধ্যে বিরাজমান অব্যক্ত সত্তার প্রতি প্রার্থনা জানায় তাদের চোখের সামনে নিজেকে মূর্ত করে তুলবার জন্যে যাতে তাদের সাধনার ফললাভ

ঘটে"—তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন। তার এই আত্মপ্রকাশে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। তারপর তিনি আমাদের যে সমস্ত স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বললেন, যেন সেই পবিত্র অঞ্চলের প্রতিটি নিভৃততম কোণ পর্যন্ত উত্তমরূপে তাঁর জানা আছে। যখন তিনি বললেন যে বদ্রীনাথে নারায়ণের তপোমুদ্রা অঙ্কিত—যেন তিনি তপশ্চর্যায় রত এবং সে কারণেই এই স্থানকে বদরীকাশ্রম বলা হয়, তখন আমি আলো দেখতে সুরু করলাম, তিন বছর আগে চিত্রাবতী নদীর তীরে 'সত্য সাই বাবা এবং তপস্যা' সম্পর্কে আমার মনে যে সংশয় জেগেছিল তা আনন্দের উচ্ছ্বাসে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বদ্রীনাথ মন্দিরের আশেপাশের আনুষঙ্গিক দেবালয়গুলি সম্বন্ধে এবং বদ্রীনাথের পবিত্রতা সম্বন্ধে অজানা তথ্যও বাবা আমাদের বললেন। উদাহরণ স্বরূপ—এ সংবাদ কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই যে শংকরাচার্য কৈলাস থেকে ৫টি শিবলিঙ্গ এনে বদ্রী, পুরী, শৃঙ্গেরী, দ্বারকা ও চিদাম্বরমে একটি করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাবা প্রত্যেকের হৃদয়ে তীর্থযাত্রীর উপযুক্ত প্রার্থনা, সৌভ্রাত্র্য ও প্রেমাত্মক সেবার ভাব রোপণ করেছিলেন।

হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত ১৮২ মাইল পথের প্রতিটি ধূলিকণা তপস্যা, প্রার্থনা, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতায় শুচিশুদ্ধ। পুরাণ, উপাখ্যান ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে মুনি ও ঋষিদের নিয়ে গল্প বর্ণিত প্রতিটি স্থান, তাদের ত্যাগ, সাধনা, বৈরাগ্য ও কঠোর তপশ্চর্যার বিবরণ। তীর্থযাত্রীরা দর্শন করে, কোথায় শিব, পার্বতী ও অন্যান্য দেবতাগণ তপস্যা করেছেন, কোথায় পরশুরাম প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেছেন, কোথায় নরসিংহ তাঁর সংহারমূর্তি শান্ত করেছিলেন, কোথায় অর্জুন অস্ত্র, কর্ণ তাঁর শৌর্য, এবং নারদ তাঁর বীণা লাভ করেছিলেন, যে স্থানে কণ্ব শকুন্তলাকে পালন করেছিলেন ও নারদ অষ্টাক্ষরী মন্ত্র লাভ করেছিলেন। নীচে গিরিকন্দরে প্রবাহিত গঙ্গা বা অলকানন্দার সগর্জন স্রোতবেগের ওপর দিয়ে পর্বতের শিখর পর্যন্ত তৈরী সংকীর্ণ ক্লেশকর পথ। সঙ্গীরা বাবার সঙ্গে চলেছেন পূর্ণ নির্ভরতায়, পথের প্রতিটি বাঁকে সমুদ্ভূত বিপদ পাহাড়ের ধ্বস্ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে ; তাদের অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারেনি। বাবা ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর দল হৃষীকেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত বৃষ্টি থামিয়ে রাখা হবে ; সে আদেশ মেঘ পালন করেছিল। তিনি

সংকল্প করেছিলেন এবং তাঁর সহযাত্রীগণ একটি কাঁটার আঘাত ব্যতিরেকে ফিরে এসেছিল!

মোটর, জীপ ও বাসের সারি আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সংগম দেবপ্রয়াগে পৌছালো মধ্যাহ্নে। বাবার এই ভ্রমণপথের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভক্ত এবং অন্যান্যদের মনে বিশিষ্ট স্থানগুলি সম্পর্কে শাস্ত্র যা ব্যাখ্যা করেছে সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি সর্বদা শাস্ত্র এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর বিশ্বাসের মত শাস্ত্র বিশ্বাসও সমান প্রয়োজন। সুতরাং গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরে রওয়ানা হবার আগে তিনি সকলকে নির্দেশ দিলেন পবিত্র জলে অবগাহন করতে। সেখানে সকলে রাত্রি যাপন করে।

শ্রীনগরের হাজার হাজার অধিবাসীগণ বাবার আগমনবার্তা আগে থেকেই জানতে পেরে তাঁকে সম্বর্ধনার জন্যে মিলিত হয়; রাত্রে তারা কষ্টসহিষ্ণু পর্বত সন্তানদের সরল সাহসিকতা বর্ণিত পাহাড়ী ও তিব্বতী নাচের আয়োজন করলো। বাবা তাদের প্রত্যেককে দর্শনদানের দুর্লভ সুযোগ দান করে আশীর্বাদ করলেন।

১৩ই জুন যোশীমঠ অভিমুখে যাত্রা করা হল। এখানেই মোটরপথ শেষ হল। এখান থেকে সকলকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত ১৮ মাইল হাঁটতে হবে। সেদিন বাবা কণ্বাশ্রমে যাত্রা বিরতি করলেন এবং সকলকে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সংগমে স্নান করতে আদেশ দিলেন। যোশীমঠেই শংকরাচার্য উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। বদ্রী থেকে ৭ মাইল দূরে মালা গিরিপথ থেকে আগত বিপদের ফলে ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষয়প্রাপ্তি রোধের জন্য শংকরাচার্য বদ্রীনাথে যে মঠ স্থাপন করেছিলেন তার শীতকালীন কার্যালয় হল যোশীমঠ। কে বলতে পারে বাবার এই বদ্রীনাথ যাত্রা সনাতন ধর্মের অশুভ বিপদের সংগে সংশ্লিষ্ট কিনা—সেই একই পথ ও একই দিক থেকে যে ভীতি প্রদর্শন করছে?

১৪ই জুন প্রত্যুষে ঘোড়া ও অশ্বতরের পিঠে মালপত্র চাপানো হল, বয়স্কদের জন্যে ডাণ্ডী ঠিক করা হল, সকলে মহাউৎসাহে যাত্রা শুরু করল বাবাকে অনুসরণ করে, যিনি এই পবিত্র পথে তাদের দিশারী হয়ে চলছেন। ১৮ মাইল···সংকীর্ণ,

উপল প্রস্তরে আকীর্ণ পথ, লক্ষ লক্ষ পুণ্য চরণের পরশ ভরা মোহময় পথ, শ্বাসরোধকারী চড়াই, মাথা ঘূর্ণিতকারী উৎরাই, মাঝে মাঝেই পথের ধারে নোটিসে পথিকের উপর আকস্মিক শিলাপাতের বিপদ সম্পর্কে সাবধানবাণী! দিক্‌চক্রবালে চিরতুষার মুকুটধারী গিরিচূড়ার পরমোল্লাস, কর্ণকুহরে চিরধ্বনিত শীতল প্রবাহের কলস্বর! প্রশস্ত হিমবাহ প্রমত্ত বেগে নেমে আসছে অলকানন্দার উপত্যকায়, তীর্থপথ তুষারে ঢাকা, চতুর্দিক থেকে আগত তীর্থযাত্রীর স্রোত পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের ভাষায় সম্বোধন করছে। যাত্রীগণ দৃঢ়পায়ে ভর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত লোকও বিশ্বাসের যষ্টিমাত্র নির্ভর করে চলছে। ঘর্মাক্ত পাহাড়ী বাহকের কাঁধে ডাণ্ডীতে কেউ করুণ, উদাস ভঙ্গীতে আসীন, কেউবা বাহকের পিঠে বাঁধা ডাণ্ডীতে অসহায়ভাবে দুলতে দুলতে চলছে, কেউ বসে আছে টাট্টুর পিঠে, বিপজ্জনক কিনারা দিয়ে টাট্টু মন্থর তালে চলছে যেন বিপদ ঘটাবার জন্তে বদ্ধপরিকর।

বাবা প্রথম দিন লাম্বাগার পর্যন্ত ১১ মাইল পদব্রজে এসে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন। বাকী পথ খুব খাড়াই হওয়া সত্ত্বেও ১০ই দুপুরের আগেই পার হয়ে পৌঁছে গেলেন। ভক্তদের প্রবল অনুরোধে বাবা ঘোড়ায় চললেও তাদের নিরাশ করে আবার নেমে এসে পায়ে হেঁটে চললেন। কঠিন আরোহণে সকলকে উৎসাহ দিয়ে বাবা চললেন, কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ছে কিনা লক্ষ্য রাখছেন; কাউকে ডাণ্ডী, কাউকে ঘোড়ায় চড়তে নির্দেশ দিলেন, কারো অতি উৎসাহ সংযত করলেন, কাউকে একটু জল খেতে বললেন, কাউকে বা তাঁর অব্যর্থ ভেষজ বিভূতি 'আহরণ' করে দিলেন! এসব কিন্তু শুধু তাঁর নিজের দলের জন্তেই নয়। না, একেবারেই নয়। বহু যাত্রী পথের ধারে ক্লান্ত হয়ে বসেছিল। বাবা তাদের কাছে গিয়ে তাঁর মিষ্ট দৃষ্টি, বাক্য এবং উপহার দিয়ে সঞ্জীবিত করলেন।

একটি ছবি আমার মনে চির উজ্জ্বল থাকবে। লাম্বাগার থেকে মাইল খানেক দূরে একটি পাথরের উপর বসে ভক্ত পরিবৃত হয়ে বাবা পৌরাণিক কাহিনী শোনাচ্ছেন—সামনের চড়াই ভাঙতে নবশক্তি সঞ্চারের জন্তে। অনেক তীর্থযাত্রীই পার হয়ে গেলেন পথশ্রমের শ্রান্তি ও পরিশ্রমে কাতর হয়ে সামনের ভগবানকে চিনতে না পেরে। কিন্তু একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এলেন, দেখলেন

ও বিজিত হলেন। তিনি পাশ কাটিয়ে এসে শ্রীচরণে পতিত হলেন। তিনি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করেছেন যে ঐ চরণ পরম পবিত্র। তার অন্তরে ছিল দুর্দম সাহস, বাবা বদ্রীনাথ যাচ্ছেন শুনে সঙ্গে যেতে চাইলেন। মন্দিরে যাবার ও আসবার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ক্লান্ত ও দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তিনি বাবার দলের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলেন। বাবা কি উত্তর দিলেন বলুন তো? —"এখানেই তোমার দর্শন হয়ে গেল, তোমায় দর্শন দেবার জন্যেই আমি এখানে অপেক্ষা করছিলাম; আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে আর বেশী কি পাবার আশা করছো? ফিরে যাও, সুখে থাক; এটি তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।" এবং তিনি তাকে পবিত্র বিভূতি প্রসাদ উপহার দিলেন। সত্যিই, তাঁর কৃপা, তাঁর সংকল্প না থাকলে কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে না।

১৫ই ও ১৬ই জুন মোটামুটি শান্ত ও বিশ্রামে কাটল। ঐ সময় বাবা ভক্তদের বদ্রীনাথে ইচ্ছেমত পূজো দিতে বললেন, তিনি নিজে বহুসংখ্যক সামরিক ও অসামরিক অফিসার, মন্দির কমিটির সদস্য, যারা তাঁর আগমনবার্তা পেয়ে দর্শনের জন্যে এসেছিলেন, তাদের "ইণ্টারভিউ" দিতে ব্যস্ত ছিলেন। ১৭ই বাবা মন্দিরের আরতির সময় উপস্থিত ছিলেন। তারপর বদ্রীনাথ হাসপাতালে গিয়ে এক্সরে বিভাগের উদ্বোধন করলেন। ঈশ্বরের অবতার—যাঁর এক্সরে চক্ষু আমাদের অন্তরের অন্ধকারতম প্রদেশেও প্রবেশ করে, যাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন রাখা যায় না, তিনি একটি বোতাম টিপে প্রথম একটি ছবি তুললেন (ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার তার নিজের জড়দেহের অভ্যন্তরের ছবি প্রথম তুলতে অনুরোধ করাতে তারই ছবি উঠল)।

১৭ই তারিখটি প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি পরম দিন, বাবা ঐ দিনটি আধ্যাত্মিক মহিমা পুনরুজ্জীবন করবার জন্যে নির্বাচিত করেছিলেন। প্রভাতে মন্দিরে দেব অভিষেকের সময় বাবা বিগ্রহের সামনে উপবিষ্ট থেকে একটি অপরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি সৃষ্টি করলেন, এক অনন্যসাধারণ দিব্যপ্রভিভায় মণ্ডিত বিগ্রহ, ঐ রূপের মাধ্যমে নারায়ণ সত্তাকে তাঁর সম্মুখে আনলেন। তারপর পলকের ভেতর সহস্রদল যুক্ত এক সুবর্ণ কমলের আবির্ভাব ঘটালেন, কল্পনার অতীত মনোহর। আমরা আশ্চর্য হলাম, কেন এই পদ্মের আগমন; কিন্তু আমাদের বিস্ময় পরিস্ফুট হবার আগেই বাবা আবার হস্ত সঞ্চালন করলেন।

এবার তাঁর করতলে দেখা গেল এক শিবলিঙ্গ ; শংকরাচার্য বদ্রীনাথের মন্দিরে যেরূপ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অবিকল সেই রকম। সেই লিঙ্গমূর্তি সহস্রদল পদ্মের কেন্দ্রস্থলে রেখে বিগ্রহ সমেত পদ্মকে একটি রূপোর পাত্রে স্থাপন করে বাবা বাংলোতে চলে এলেন যেখানে আমরা উঠেছিলাম।

তারপর বাবা ভজন গানের আদেশ দিলেন এবং যখন নারায়ণের স্তুতি গাওয়া হচ্ছিল, তিনি মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"এখন আমরা আবার লিঙ্গের অভিষেক করব"। তিনি প্রত্যেকের কাছে নিজে নিয়ে গিয়ে লিঙ্গটি দেখালেন—ঐটির অনিত্য উপাদান ও মধ্যেকার আঁকা চোখটিকে বিশেষভাবে দেখিয়ে দিলেন। বললেন যে ঐটি কৈলাস থেকে আগত নেত্রলিঙ্গ। একটি পবিত্র বারিপূর্ণ (একেবারে গঙ্গার উৎপত্তিস্থল থেকে নেওয়া বলে বাবা বললেন) রৌপ্য ঘট সৃষ্টি করে বাবা নিজে বিগ্রহকে স্নান করিয়ে অভিষেক করলেন। সারাক্ষণ ভক্তগণ শ্রীরুদ্র, নারায়ণসূক্তম ও পুরুষসূক্তম এবং অন্যান্য স্তোত্র আবৃত্তি করেছিলেন।

তারপর পূজার জন্যে বাবা ১০৮টি স্বর্ণ বিল্বপত্র সৃষ্টি করলেন ; তাঁর দিব্য হস্ত থেকে ঐগুলি নিজেকার রূপোর আধারের উপর ঝরে পড়লো! আবার তাঁর হাতের আন্দোলন! এবার এল একরাশ ছোট সুগন্ধী ফুল, তখনও শিশিরের ফোঁটা রয়েছে তাদের গায়ে, যেন অতি সাবধানে গ্রীষ্মপ্রদেশের শত শত গাছ থেকে অতি যত্নসহকারে চয়ন করা! সকল ভক্তদের যথাযোগ্য মন্ত্র আবৃত্তির সঙ্গে সকলের পক্ষে পূজা সমাপন করলেন ডাঃ বি. রামকৃষ্ণ রাও। ১২০০ বছর আগে শংকরাচার্য যেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই গুপ্ত প্রকোষ্ঠে নেত্রলিঙ্গ প্রেরিত হলো। পূর্বোক্ত পূজোর পর উদ্দেশ্য সাধিত হওয়াতে তা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল বলে বাবা বলেছিলেন। ঐটির ভেতর প্রচুর শক্তি সঞ্চার করে ঈশ্বর স্বয়ং পুনরায় মন্দিরটিকে পবিত্র করে তুললেন! তাঁর ধর্মসংস্থাপনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী শাস্ত্রে বিশ্বাস আনয়ন একটি প্রধান অঙ্গ এবং তাই প্রত্যেককে ঐদিন দ্বিপ্রহরে পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের নির্দেশ দিলেন।

বাবা সব সময় পিতামাতাকে সকৃতজ্ঞ স্মরণ করবার জন্যে বলেন, প্রত্যেকের অস্তিত্বের মূল কারণ, মোক্ষলাভের পথে উন্নয়নের সংগ্রামের সুযোগ দানের জন্যে,

সাধনা ও সেবার এই আনন্দলাভের জন্যে। —"যদিও পরলোকগত আত্মা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ইহলোকে অবস্থান করেন না অথবা তোমাদের অর্ঘ্য গ্রহণের প্রত্যাশায় ব্যগ্র হয়ে থাকেন না, কিন্তু তোমাদের কর্তব্য তাঁদের স্মরণ করা। যখনই নিজেরা সুখী ও উন্নত হও তাদের স্মরণ করে সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা জানাবে"—বাবা প্রায়ই একথা বলে থাকেন। সুতরাং ভক্তগণ সেই পবিত্র স্থানে গেলেন যেখানে বদ্রীনারায়ণকে ভোগ নিবেদন করলে স্বতঃই পিতৃপুরুষগণ প্রাপ্ত হন। বাবা নিজে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং অনুষ্ঠানকালে প্রত্যেককে আশীর্বাদ করলেন।

দলের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন যারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতৃতর্পণের কাজ করবার পক্ষে অক্ষম ছিলেন। বাবা পরম করুণাভরে তাদের একত্র করে অলকানন্দা নদীতে নিয়ে গিয়ে নিজে বিধান রচনা করে তর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করালেন। বাবা তাদের প্রত্যেকের জন্যে ঐ খরস্রোত নদী থেকে এক গ্লাস করে জল তুললেন। কিন্তু তাঁর শ্রীহস্তের দিব্য রসায়নে, নদী থেকে যখন তোলা হচ্ছিল তার ভেতরই, গ্লাসের মধ্যে এক দিকে ওঁকার খোদিত এক বৃহৎ বিভূতি খণ্ডের আবির্ভাব হল। বাবা গ্লাসের গায়ে টোকা দিলেন, কি আশ্চর্য্য! জলের উপরে অনেক তিল ভাসতে লাগল, তিল শস্য হল প্রয়াত আত্মার সঙ্গে যুক্ত যে কোন কাজে অবশ্য প্রয়োজনীয়। তিনি ঐ অক্ষম ব্যক্তিদের একে একে ডেকে আনলেন, তাদের করতলে জল দিয়ে সকৃতজ্ঞ, সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে বললেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় বদ্রীনাথ মন্দির কমিটি বাবার জন্যে বিশেষ এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন মন্দির ভবনে। মহামান্য ডাঃ বি. রামকৃষ্ণ রাও সভাপতিত্ব করেন এবং বাবার ভাষণ হিন্দীতে অনুবাদ করেন। তিন হাজার শ্রোতার ভেতর প্রধানতঃ ছিল তীর্থযাত্রী; তাছাড়া বদ্রীনাথের নাগরিক ও ব্যবসায়ীবৃন্দ। বাবা তাদের শংকরাচার্য কর্তৃক আনীত পাঁচটি লিঙ্গ এবং বদ্রীধামের পবিত্রতার কথা বললেন। তিনি বললেন, "ঈশ্বর হলেন প্রেমস্বরূপ। কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা সম্ভব। যেমন একটি চিনির পুতুলের সমস্ত অঙ্গই সমান মিষ্টি, তেমনি বেদের উক্তি অনুযায়ী যারা সহস্রশীর্ষ পুরুষের মুখ, বাহু ও চরণ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন তাদের সকলেই সমভাবে তাঁর অস্তিত্ব ও প্রেম তাঁর।

পরিব্যাপ্ত, যে প্রেম হল তাঁর স্বভাব। বাবা তীর্থযাত্রীদের পথক্লেশ, কৃচ্ছ্রতা, পরিশ্রান্তি, দুরবস্থা ও অর্থ ব্যয়ের বর্ণনা দিয়ে বদ্রীনাথের নাগরিকদের বললেন— এই যে অবিরাম স্রোতের মত তীর্থযাত্রী আসছেন—বদ্রীনাথের প্রতি বিশ্বাসই যাদের এত কষ্ট সহ্য করবার প্রেরণা দিচ্ছে—এর থেকে কিছু শিক্ষালাভ করতে। তিনি চান যাত্রীদের নিঃস্ব না করে, ভেজাল দ্রব্য না গছিয়ে তারা যেন আরও ভ্রাতৃসুলভ ও সহৃদয় ব্যবহার করেন।

রাত্রে বাবা মন্দির চত্বরের সমস্ত ভিক্ষাজীবীর জন্যে প্রচুর ভোজের আয়োজন করলেন। সেই দৃশ্যে আমাদের দশেরার সময় প্রশান্তিনিলয়মের কথা মনে পড়ে গেল। কারণ বাবা নিজে সেই পথের ধারে বসে থাকা প্রত্যেক লোককে মিষ্টান্ন পরিবেশন করলেন। আহারের পর প্রত্যেককে একটি করে কম্বল দান করলেন (অথবা তার মূল্য দান করলেন, কারণ বদ্রীনাথের দোকানগুলোর কম্বল শীঘ্র নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল)।

এইভাবে তিন দিনের স্বল্প সময়ের ভেতর বাবা সবার চোখের ধ্রুবতারা স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন এবং যখন ১৮ই প্রভাতে বিদায় গ্রহণ করলেন তখন সবাই তাঁকে আগের সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিল যে তিনি আবার মাঝে মাঝে আসবেন বলেছেন। তারা বাবা এবং তাঁর দলের সঙ্গে সঙ্গে হনুমান চটির রাস্তা ধরে বহুদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। ১৯ তারিখে যোশী মঠ পৌঁছে বাবা ২১শে মোটরে হরিদ্বারে ফিরে এলেন পথে হৃষিকেশে অন্ধ্র আশ্রম পরিদর্শন করে।

একথা অবশ্যই উল্লেখ্য যে ১০০ জন ভক্তের দলের অধিকাংশই বয়স্ক ও শক্ত-সমর্থ ছিলেন না। কিন্তু তারা বাসের ঝাঁকানীর মধ্যে হিমালয়ের দুর্গম উচ্চাবহ পথে অজানা পথে, অনভ্যস্ত আহার সত্বেও সুস্থ ও সতেজ হয়ে ফিরে এসেছিলেন সকলেই। এ সবই সম্ভব হয়েছে শুধু বাবার সর্বত্র ও নিত্য বিরাজমান, সর্বশক্তিময় করুণার প্রভাবে।

হরিদ্বার থেকে বাবা নৈনিতাল গেলেন, সেখানে বহুলোক তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল। তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি সাহস, সান্ত্বনা ও আধ্যাত্মিক নির্দেশ দিলেন। স্বামী বিত্তানন্দজী প্রতিষ্ঠিত গীতা পাঠচক্র পরিদর্শন করলেন। সেখানে তাঁকে হিন্দীতে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। নৈনিতালের সাধুদের

নিকট ভাষণ দেবার সময় একাগ্রতার মূল্য সম্বন্ধে তিনি গীতার ১৮শ অধ্যায় থেকে শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন,—যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করেছেন—"কচ্চিৎ এতাচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেন চেতসা?" 'পার্থ তুমি একাগ্রচিত্তে আমার কথা শুনলে তো?' সেই একই শ্লোক থেকে তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন—গীতা অতীতে ও বর্তমানে মোহ, অজ্ঞানতা অপসারণের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়েছিল; অজ্ঞানতা থেকে মোহের উৎপত্তি, যে মোহ মানুষকে বিভ্রান্ত করে অসত্যকে সত্য বলে বোধ করায়। মিথ্যাকে সত্য প্রতীয়মান করে অনিত্যকে নিত্য বলে গ্রহণ করায় দুঃখের মূলকে আনন্দের উৎস মনে করায়।

৪ঠা জুলাই প্রশান্তি নিলয়মে ফিরে এসে বাবা স্বয়ং কৃপাপরবশ হয়ে ভক্তদের কাছে বদ্রীনাথের পূজা অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ভ্রমণ পথের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাদের জন্যে দ্বিতীয়বার গঙ্গার পবিত্র বারি আহরণ করলেন। বললেন—তিনি চান যারা পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা করেছিল তাদের দৈনন্দিন আচরণে যেন অবশ্যই প্রকাশ পায় যে তাদের অন্তরে পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়েছে এবং তাদের বাক্যে ও কর্মে রূপান্তর ঘটেছে। "শঙ্করাচার্য বদ্রীনাথে নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তোমরা প্রত্যেকে এখন তোমাদের অন্তরে অবশ্যই নারায়ণকে প্রতিষ্ঠিত করবে।"

বদ্রীতে থাকাকালীন বাবা প্রশান্তি নিলয়মের ভক্তদের নিকট এক পত্র লিখেছিলেন:—"সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণে রাখবে, তাঁর নাম জপ করে, নাম লিখে, উচ্চারণ করে বা নামের ধ্যান করে; মালা জপ করে বা বিগ্রহের অর্চনা করে। ঐ নিরন্তর ঈশ্বর নামে মগ্ন থাকাই হল 'সকল পবিত্র স্থান', 'সকল পবিত্র নদী', 'সকল বিখ্যাত দেবমন্দির'। মন এই ভাবে পূর্ণ হলেই বদ্রীনাথের পূর্ণ মহিমা তাতে প্রতিফলিত হবে। মন যদি বিধিমত বশীভূত না হয় তবে বদ্রীনাথে তীর্থযাত্রা শুধু সময় ও শক্তির অপব্যয় মাত্র। সুতরাং তোমরা ঐখানে আছ আর এরা এখানে আছে সেজন্যে ক্ষুব্ধ হয়ো না। নারায়ণ তোমাদের পাশে পাশে আছেন, সঙ্গে আছেন। তাহলে অদেখা নারায়ণকে দর্শনের জন্যে কেন নিজেকে বিভ্রান্ত করছো? দৃঢ় অচঞ্চল থেকো, পূর্ণোত্তম হও, চির আনন্দে থেকো।" প্রকৃতপক্ষে, যাদের দেখবার মত চোখ আছে এবং চেনবার মত জ্ঞান আছে তাদের নিকট পুত্তাপর্তীই বদ্রীনাথ।

সুতরাং, আসুন আমরা তাঁকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি, অথবা এ কথা যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের অন্তরে বিরাজিত হয়ে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের প্রতিটি চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত করছেন। আমরা যেন পূর্ণ সচেতন থাকি আমাদের সৌভাগ্য সম্বন্ধে, প্রশান্ত সন্তোষে পরিপূর্ণ থাকি।

তুমি আর আমি

প্রিয় পাঠকভাই! অবশেষে আমরা দুজন এই গ্রন্থের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। ভগবান যে পুণ্যভূমিতে বিরাজ ক'রছেন, যে মহাতীর্থের উদ্দেশ্যে একদিন না একদিন সকলকেই প্রয়োজনের তাগিদে যাত্রা ক'রতে হবে, সেই তীর্থযাত্রায় যাত্রী হ'য়ে ভগবানের দিব্য সান্নিধ্যে উপনীত হবার জন্য তোমার হৃদয় ইতিমধ্যে খুবই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। এখনো যাঁকে চোখে দেখনি, শুধু বাঁশী শুনেছো, আর সেই বাঁশীর ডাক শুনেই তোমার মনপ্রাণ যা ছিল সব যাঁর চরণতলে দিয়ে ফেলেছো, তৃষাতুর হ'য়ে সেই সত্যমঙ্গল প্রেমময়ের হাত থেকে স্নিগ্ধ সুধা পান করবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই অধীর হ'য়ে প'ড়েছো।

বাবা আমাদের আশ্বাসদান ক'রে ব'লেছেন যে, তিনি ২০২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান শরীরে অবস্থান ক'রবেন। তিনি ব'লেছেন যে, যে কাজের জন্য তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন সে কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি। এই কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের স্তরে আছে। তিনি ব'লেছেন যে, তাঁর অভিযানের সংবাদ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এবং এ থেকে মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ হবে। সেইজন্য, ভগবান শ্রীসত্য সাইবাবার অলৌকিক জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে অধিকতর প্রেরণাদায়ক এবং মহত্তর হ'তে বাধ্য।

মানবজাতির উদ্ধারের স্বর্ণযুগ শুরু হ'য়ে গেছে। এই স্বর্ণযুগের অরুণোদয়ের রক্তিমালোকে পূর্বদিগন্তের মেঘমালা ইতিমধ্যেই কাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিত হ'য়েছে। সেদিনের আর দেরী নেই যেদিন এই আলোকচ্ছটায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হ'য়ে

যাবে। মানবজাতি এতদিন গভীর ঘুমে অচেতন ছিল। আজ তার মোহনিদ্রা টুটেছে। সুষুপ্তির গহন আঁধার থেকে চেতনার উজ্জ্বল আলোকে সে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। বাবা ব'লেছেন, "এই পৃথিবীর অগণিত ঋষি, তপস্বী, জ্ঞানী, সাধক, গুরু এবং অসংখ্য সাধু ব্যক্তি তীব্র আকুলতা নিয়ে আমাকে আহ্বান ক'রেছিল বলেই আমি এসেছি।"

পবিত্রস্বভাব ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা আনন্দ করুন। ভণ্ড, কাপুরুষ, নিষ্ঠুর এবং নীতিহীন ব্যক্তিদেরও আনন্দ ক'রতে বাধা নেই। কারণ, করুণাময় ভগবান শ্রীসত্য সাইবাবার অপার কৃপার স্পর্শ থেকে তারাও বঞ্চিত হবে না। তিনি এদেরও কৃপা ক'রবেন এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনবেন। কারণ তিনি ব'লেছেন, "পাপী, পতিত এবং পথহারাদের সামনে আমার দরজা যদি আমি বন্ধ ক'রে দিই, তবে এ বেচারীরা আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ?"

প্রিয় পাঠকভাই! তোমার ও আমার এখন আর আত্মসন্তুষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকা চ'লবে না। এই মহান তীর্থপথে যাত্রী না হ'য়ে শুধু শুধু পথের মানচিত্র দেখে আর পথ-নির্দেশিকা পাঠ ক'রে কোন লাভ নেই। যে পঙ্গু তাঁর কৃপায় চলবার শক্তি ফিরে পেয়েছে, যে অন্ধ তাঁর করুণায় আবার আলোর দেখা পেয়েছে, এবং কঠিন রোগে আক্রান্ত যেসব ব্যক্তি তাঁর অনুগ্রহে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ ক'রেছে—এদের রোগ-নিরাময়ের অলৌকিক বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করাও অর্থহীন। মোটা মোটা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ক'রে নিজের মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত করারও কোন প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে আমাদের সক্রিয় হ'তে হবে। আর বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে এই লগ্নেই যাত্রা শুরু ক'রে দিতে হবে।

সর্বরোগহর, সর্বদুঃখহর, সর্বতাপহর মহাধন্বন্তরিরূপে তিনি আমাদের মঙ্গলার্থে মানবদেহ ধারণ ক'রে এসেছেন। একাধারে তিনি জননীর মত কোমল, পিতার মত কঠোর, এবং ঈশ্বরের মত সর্বান্তর্যামী। তিনিই উৎস, তিনিই মন্দাকিনী, তিনিই মহাসাগর। এই সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা এবং সর্বপ্রাণসঞ্জীবনী সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের শ্রীচরণকমলে আমাদের সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন কৃপা ক'রে তাঁর প্রতি স্থির অচঞ্চল সংকল্প নিয়ে, দৃঢ়ভাবে চলবার উপযুক্ত শক্তি আমাদের দান করেন।

তিনি আমাদের কাছে কি আশা করেন ? তিনি চান যে আমরা যেন এই

মুহূর্ত থেকেই সৎভাবে জীবন অতিবাহিত করবার সাধনা আরম্ভ ক'রে দিই দুহাতে কোন্ অর্ঘ্যের ডালি নিয়ে আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো ? সেই চিরাচরিত অর্ঘ্য—পাত্র, পুষ্প, ফল আর জল কি ? না, কখনোই না। আমরা তাঁর চরণে নিবেদন ক'রবো—সত্য, ধর্ম, শান্তি আর প্রেমের অঞ্জলি। (এতেও যদি অপারগ হই তবে সত্য, ধর্ম, শান্তি, প্রেম—এই চারটি অথবা এর মধ্যে অন্ততপক্ষে যে কোন একটি সদ্‌গুণ অর্জনের জন্য আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টার অঞ্জলি হাতে নিয়ে আমরা যেন তাঁর চরণধূলার তলে মাথা নত করি।)

বাবা বলেন, "দেহকে অর্ঘ্যদান করো পাত্র মনে ক'রে, মনকে অর্ঘ্যদান করো বিনয়সৌরভে ভরা পুষ্প মনে ক'রে, হৃদয়কে অর্ঘ্যদান ক'রো তপশ্চর্যায় সুপরিপক্ব এবং দয়া, অনুকম্পা ও আত্মসংযমের অমৃতরসে পূর্ণ ফল মনে ক'রে আর আনন্দাশ্রুধারাকে অর্ঘ্য দাও জল মনে ক'রে। এতেই যথেষ্ট হবে।"